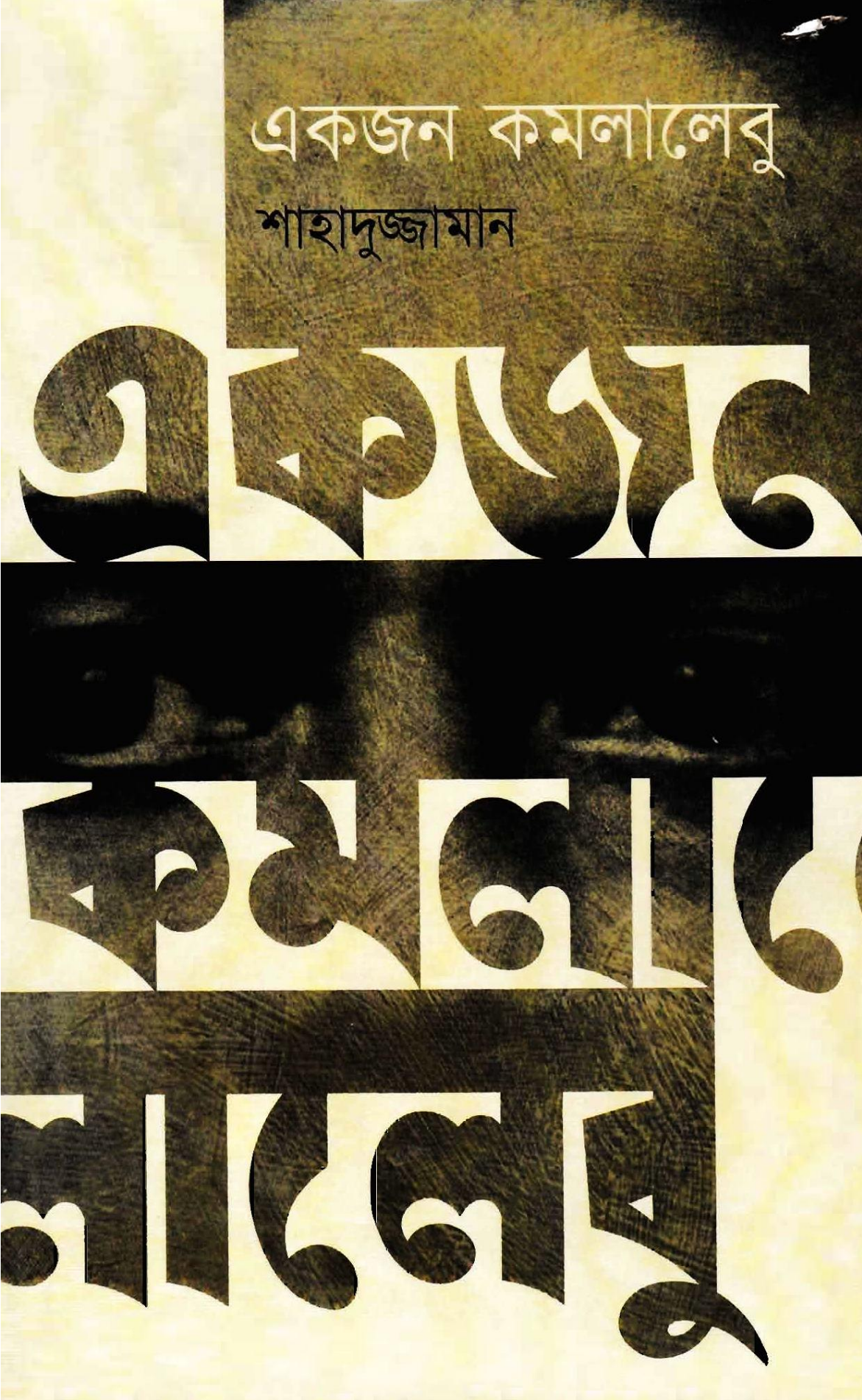
একজন কমলালেবু

শাহাদুজ্জামান



বরিশালের নদী, জোনাকি ছেড়ে তাঁকে পা
রাখতে হয়েছে আদিম সাপের মতো ছড়িয়ে
থাকা কলকাতার ট্রামলাইনের ওপর।
পৃথিবীর দিকে তিনি তাকিয়েছেন বিপন্ন
বিস্ময়ে। বলেছেন সন্ধ্যায় সব নদী ঘরে
ফিরলে থাকে অন্ধকার এবং মুখোমুখি
বসবার নাটোরের এক নারী। জানিয়ে
দিয়েছেন জ্যোৎস্নায় ঘাই হরিণীর ডাকে ছুটে
আসা, শিকারির গুলিতে নিহত হরিণের
মতো আমরা সবাই। সস্তা বোর্ডিংয়ে
উপার্জনহীনভাবে দিনের পর দিন কুঁচো
চিংড়ি খেয়ে থেকেছেন। তবু পশ্চিমের মেঘে
দেখেছেন সোনার সিংহ। পিঁপড়ার মতো
গুটি গুটি অক্ষরে হাজার হাজার পৃষ্ঠা
ভরেছেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ডায়েরি
লিখে। সেগুলোর সামান্য শুধু জনসমক্ষে
এনেছেন জাদুকরের রুমালের মতো, বাকিটা
গোপনে তালাবন্দী করে রেখেছেন কালো
ট্রাঙ্কে। বাংলা সাহিত্যের প্রহেলিকাময় এই
মানুষ জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে এক নিবিড়
বোঝাপড়ায় লিপ্ত হয়েছেন এ সময়ের
শক্তিমান কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামান তাঁর
একজন কমলালেবু উপন্যাসে।

পৃথিবীর দিকে তিনি তাকিয়েছেন বিপন্ন বিস্ময়ে। জানিয়ে দিয়েছেন জ্যোৎস্নায় ঘাইহরিণীর ডাকে ছুটে আসা, শিকারির গুলিতে নিহত হরিণের মতো আমরা সবাই। হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন, প্রকাশ করেছেন সামান্য অংশ, বাকিটা তালাবন্দী করে রেখেছেন ট্রাঙ্কে। এই হলো জীবনানন্দ দাশ, এ উপন্যাসে তাঁর সঙ্গে নিবিড় বোঝাপড়ায় লিপ্ত হয়েছেন কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জামান।



আলোকচিত্র : ক্যাট্রিওনা ফরেস্ট (Catriona Forrest)

শাহাদুজ্জামান

শাহাদুজ্জামানের জন্ম ১৯৬০ সালে ঢাকায়। পড়াশোনা মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে। নেদারল্যান্ডসের আমস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানে। পেশাগতভাবে তিনি চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে, পরে অধ্যাপনা করেছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনায় যুক্ত আছেন। গল্প, উপন্যাস ছাড়াও প্রবন্ধ, অনুবাদ, ভ্রমণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে রয়েছে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মাওলা ব্রাদার্স আয়োজিত কথাসাহিত্যের পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *কয়েকটি বিহ্বল গল্প* (১৯৯৬)। কথাসাহিত্যে অবদানের জন্য ২০১৬ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

Email : zshahaduz@gmail.com

প্রচ্ছদ : **সব্যসাচী হাজরা**

একজন কমলালেবু

শাহাদুজ্জামান



The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রথমা প্রকাশন



একজন কমলালেবু
গ্রন্থস্বত্ব : ২০১৭ শাহাদুজ্জামান
দ্বিতীয় সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪, জুন ২০১৭
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪২৩, ফেব্রুয়ারি ২০১৭
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সব্যসাচী হাজরা
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Ekjon Komolalebu
A novel in Bangla by Shahaduz Zaman
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 88-02-8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 450 only

ISBN 978 984 91403 7 2

উ ৎ স র্গ

সাহার বানু
আমার মা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বিকালের রোদে রক্তাপ্লুত ট্রাম

পুরোনো শতাব্দীর ধুলোমাখা একটা সরীসৃপের মতো কলকাতার বালিগঞ্জ ডাউন ট্রাম ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিকে। চারদিকে তখন শেষ বিকেলের রোদ। 'জলখাবার' দোকানের ক্যাশ কাউন্টারে বসে চুনীলাল দেখলেন একজন লোক হেঁটে যাচ্ছেন ওই ট্রামের দিকেই। ট্রাম এগিয়ে আসছে, সেই লোকও এগিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম লাইনের দিকে। ট্রামের ড্রাইভার জোরে জোরে ঘণ্টা বাজালেন, চিৎকার করে ডাকলেন, তবু সে লোক উঠে গেলেন ট্রাম লাইনের ওপর এবং আটকে গেলেন ট্রামের ক্যাচারে। সশব্দে ব্রেক কষল ট্রাম। চুনীলাল দৌড়ে গিয়ে ট্রামের ক্যাচারের ভেতর থেকে টেনে বের করে আনলেন মানুষটাকে। লোকজনের ভিড় জমে গেল, তারা জানতে চাইল, 'কী নাম আপনার, কোথায় থাকেন?' তারা কেউ জানে না যে এই লোক একদিন লিখেছেন :

> কলকাতার ফুটপাত থেকে ফুটপাতে—ফুটপাত থেকে ফুটপাতে—
> কয়েকটি আদিম সর্পিনী সহোদরার মতো এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
> পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ অনুভব করে হাঁটছি আমি।
> গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে—কেমন যেন ঠান্ডা বাতাস;
> কোন দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার—
> তারা কোথায়?
> তারা কি হারিয়ে গেছে?...

রক্তাক্ত সেই লোক বললেন, 'আমার নাম জীবনানন্দ দাশ, ওই ল্যান্সডাউন রোডে থাকি, ১৮৩ নম্বর বাড়ি।' এইটুকু বলে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না, এলিয়ে পড়লেন রাস্তায়। লোকজন তাঁকে ধরাধরি করে একটা ট্যাক্সিতে উঠিয়ে নিয়ে গেল কাছের শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। ডাক্তাররা

দেখতে পেলেন তাঁর ডান পা'টা দুমড়ে গেছে, বুকের পাঁজরের হাড়ও গেছে ভেঙে। তাঁরা ব্যান্ডেজ দিয়ে মুড়ে দিলেন তাঁর দুমড়ে যাওয়া পা, বুকের পাঁজর। তাঁকে স্যালাইন দেওয়া হলো, নাকে অক্সিজেন দেওয়া হলো, দেওয়া হলো নানা রকম ইনজেকশন। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের একটা রং ওঠা লোহার খাটে অচেতন শুয়ে রইলেন জীবনানন্দ দাশ, বাংলা সাহিত্যের প্রহেলিকাময় এই মানুষ। জীবনের নানা পাকচক্র জীবনানন্দকে সবুজ ঘাস নদী জোনাকির দেশ বরিশাল থেকে টেনে এনে ফেলেছে কলকাতার বিষাক্ত এই ট্রাম লাইনের ওপর।

সেদিন ১৪ অক্টোবর ১৯৫৪ সাল। আরও আট দিন জীবনানন্দ ওই ওয়ার্ডে তন্দ্রাচ্ছন্ন, অচেতন শুয়ে থাকবেন। তাঁর চিকিৎসা চলবে। হাসপাতালে আসবেন তাঁর গুটিকয় চেনাজানা মানুষ, আত্মীয়জন। মাঝে মাঝে চেতনা ফিরে আসবে তাঁর, দু-একটা কথা বলবেন তিনি। হাসপাতালের করিডরে কবিতায় পাওয়া এক মেডিকেল ছাত্র ভূমেন্দ্র গুহকে ছোটাছুটি করতে দেখা যাবে। বহুকাল পর জীবনানন্দের জীবন নিংড়েই কাটবে ভূমেন্দ্রের জীবন। তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা রাত জেগে জীবনানন্দকে পাহারা দেবেন। ডাক্তারদের সঙ্গে উদ্বিগ্ন পরামর্শ করবেন তাঁর ভাই অশোকানন্দ দাশ। জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দাশ এসে বিষণ্ন দাঁড়াবেন তাঁর বিছানার পাশে। সন্ধ্যা নামলে তিনি বাড়ি ফিরে যাবেন। জীবনানন্দের বোন সুচরিতা দাশ অবশ্য একটা বেতের ঝুড়িতে ফল আর ফ্লাস্কে চা নিয়ে হাসপাতালের করিডরের বেঞ্চে জেগে থাকবেন রাতের পর রাত। নার্স শান্তি মুখার্জি তোয়ালে দিয়ে জীবনানন্দের কপালের ঘাম মুছে দেবেন, বিছানার পাশের টেবিলে একটা ফুলদানিতে রাখবেন ফুল।

ইমার্জেন্সি রুমটাতে তখন নানা রকম রোগীর ঠাসাঠাসি ভিড়। কেউ চেঁচাচ্ছে, কেউবা শ্বাসকষ্টে বা ব্যথায় গোঙাচ্ছে। কারও মাথা ফেটেছে বলে রক্তের ছোপ লাগা ব্যান্ডেজ মাথায় নিয়ে অসাড় পড়ে আছে। কার এক প্রস্রাবের বোতল উল্টে গিয়ে গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। এক জেলের আসামি রোগীকে পাহারা দিচ্ছে পাশে বসে থাকা পুলিশ। এক কোনায় একজন রোগী মারা গেছে, তার মৃতদেহ পড়ে আছে তখনো।

কয়েকটা দিন আশা-নিরাশার দোলাচলে থাকবার পর ওই ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের নানা রকম রোগীর গোঙানোর প্রেক্ষাপটে, ওই রং ওঠা লোহার খাটে মৃত্যুবরণ করবেন জীবনানন্দ। ট্রামের মতো এমন একটা স্লো মুভিং লকোমোটিভকে এড়িয়ে যাবার টনক মানুষের থাকার কথা। ট্রামের ক্যাচার তৈরি হয়েছিল লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পশু তাড়াবার জন্য। কিন্তু জীবনানন্দ দাশই সম্ভবত ট্রামের ক্যাচারে আটকে যাওয়া প্রথম এবং শেষ মানুষ। ফলে আদিম সাপের মতো ছড়িয়ে থাকা ট্রামের চাকার নিচে তাঁর এই মৃত্যু নিয়ে জট থেকে যায়। প্রশ্ন জাগে :

BanglaBook.org

এটা কি একটা দুর্ঘটনা?

নাকি তিনি ট্রামের চাকার নিচে আত্মহত্যা করেছেন?

অথবা এটা কি আসলে একটা হত্যাকাণ্ড, যার পেছনে রয়েছে আরও অনেকের অদৃশ্য হাত?

ট্রাঙ্কের ভেতর তুতেনখামেনের গুপ্তধন

এক

বরিশালের বগুড়া রোড আর গোরস্থান রোডের কোনার বাড়িটাতে সন্ধ্যা নামে। বাড়ির একদিকে কৃষ্ণচূড়াগাছ, অন্যদিকে কেয়ার ঝোপ, পেছনে নারকেল আর সুপারিগাছ-ঘেরা মাছের চোখের মতো ঝকঝকে একটা পুকুর। খানিকটা দূরে কয়েকটা কাঁঠাল, জামরুল আর লিচুগাছ। মাঝখানের উঠানকে ঘিরে তিনটা ঘর। তার একটাতে বিছানায় শুয়ে মিলু অপেক্ষা করে মায়ের জন্য। শুয়ে শুয়ে রান্নাঘরে হাঁড়ি-পাতিলের শব্দ শুনতে পায় সে। টের পায় মা তাঁর শেষ কাজটুকু সারছেন। সন্ধ্যার পরপরই বাড়ির চারদিক নীরব হয়ে ওঠে। দূরে নারকেলবাগানের ভেতর থেকে শোনা যায় বাজকুড়ল পাখির ডাক। মিলুর চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসে, তবু মা না আসা পর্যন্ত প্রাণপণে জেগে থাকার চেষ্টা করে সে। সংসারের শেষ মানুষটার খাওয়া শেষ হলে তারপর ঘরে ফেরেন মা, মিলুর চুলে হাত বুলিয়ে বলেন, 'তুই এখনো জেগে বাবা? ঘুমিয়ে পড় তাড়াতাড়ি।' বাইরের পৃথিবী তখন অন্ধকার, নিথর। মা ঘরে ফিরলেও মিলুর ভয় যায় না। ভাবে এই বুঝি কোনো পড়শি এসে বলবে, কারও বাড়ির ছেলের মারাত্মক কোনো অসুখ হয়েছে, হয়তো কোনো মহিলার বাচ্চা হবে কিংবা কোনো গরিব ঘরে কেউ মারা গেছে আর সেসব খবর শুনে সেই গভীর রাতেই মা বেরিয়ে যাবেন। হয়তো আর ফিরবেন না সারা রাত। কিন্তু যেদিন সে রকম কোনো ডাক না আসে, সেদিন মিলুর মনে গভীর প্রশান্তি। দেখে মা কুপিটার আলো একটু উসকে দিয়ে দিনের পত্রিকা নিয়ে বসেছেন। কুপির আলোতে উজ্জ্বল হয়ে থাকা মায়ের মুখ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে মিলু। তারপর আবার খুব ভোরে আধো ঘুম, আধো জাগরণের ভেতর বিছানায় শুয়ে সে শুনতে পায় মা গাইছেন প্রার্থনার গান :

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে
তোমার বিশ্বসভাতে
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।

BanglaBook.org

মায়ের এই গান শুনতে শুনতে একটা অপার্থিব আমেজে শুরু হয় মিলুর দিন। মা সেই মঙ্গলপ্রভাতের গানের মায়া শরীরে জড়িয়েই আবার ঝাঁপ দেন সংসারে। পুরো দিন রান্নাবান্না, কোটাবাছা, খুন্তি, কড়াই, গৃহস্থালি তদারকিতে অদৃশ্য থাকেন তিনি। মিলু আর তাঁকে কাছে পায় না। সারা দিন নিরালম্ব লাগে তার। মাকে কাছে না পাওয়ার গোপন বেদনা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মিলু, শৈশবের জীবনানন্দ দাশ।

মায়ের সঙ্গে গভীর নাজুক এক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক জীবনানন্দের। মরতে বসেছিলেন তিনি শৈশবেই। জন্মের বছরই আক্রান্ত হয়েছিলেন মারাত্মক জুভেনাইল জন্ডিসে। ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষে বলেছিলেন শিশু বেঁচে যেতে পারে, যদি তাকে উত্তরে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া যায়। সে সময় সেই তো এক রেওয়াজ, বাঁচবার শেষ চেষ্টায় হাওয়া বদল। উত্তর মানে তো দিল্লি, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ। বরিশাল থেকে দিল্লি যাওয়া দীর্ঘ পথ, প্রচুর টাকাপয়সার ব্যাপার। জীবনানন্দ দাশের বাবা সত্যানন্দ দাশ ব্রজমোহন স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। সামান্য বেতন, আর্থিক অনটন সংসারে। তাঁদের জন্য দিল্লি, আগ্রা যাওয়া রীতিমতো বিলাসিতা। কিন্তু জীবনানন্দের মা বললেন, 'মিলুকে নিয়ে আমি দিল্লি যাবই।' এই প্রতিজ্ঞায় আঁতকে উঠলেন পরিজনেরা। তাঁরা বললেন, 'এই টানাটানির সংসারে এত টাকা খরচ করে দিল্লি যাওয়া হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।' শিশুমৃত্যু তখন আটপৌরে ব্যাপার। পরিবারে একটা শিশু মারা যাবে, পরের বছর জন্ম হবে আরেকজনের, সেটাই রেওয়াজ তখন। কিন্তু রেওয়াজ মানবার মানুষ তো জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দাশ নন। তিনি কবি, অমৃতের সাধক। তাঁর কবিতা প্রবন্ধে পরিণত

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে;
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ' হইতে হ'বে—এই তার পণ।

জীবনানন্দ তাঁর প্রথম সন্তান। তাঁর নিজের এই ছেলে একদিন কথায় বড় না হয়ে কাজে বড় হবে—এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে, সবাইকে উপেক্ষা করে, বাবা চন্দ্রনাথ দাশকে সঙ্গে নিয়ে কুসুমকুমারী উঠে পড়েছিলেন দিল্লিগামী ট্রেনে। জন্ডিসে আক্রান্ত মিলুকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লি ঘুরে উত্তরের হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে সুস্থ করে তুলেছিলেন তিনি। সেটা ১৮৯৯ সাল। এই ক্রান্তির বছরেই জন্ম জীবনানন্দের, যখন একটা পুরোনো শতাব্দী ঘাট ছাড়ছে আর এগিয়ে আসছে নতুন এক শতাব্দী, বিংশ শতাব্দী। কোনো লুপ্ত নক্ষত্রের মতো হারিয়ে যেতেন হয়তো জীবনানন্দ কিন্তু কুসুমকুমারী তাঁকে হাজির রাখলেন বিংশ শতাব্দীর তীব্র তীক্ষ্ণ সব বিস্ময়ের মুখোমুখি করবার জন্য।

BanglaBook.org

দুই

বরিশাল থেকে কলকাতায় গিয়ে যখন বেথুন স্কুলে পড়ছেন কুসুমকুমারী, তখন থেকেই কবিতা লেখার শুরু তাঁর। ছাপিয়েছেন নানা পত্রিকায়, বইও প্রকাশ করেছেন। সত্যানন্দ দাশের সঙ্গে বিয়ের পর এসে পড়লেন এক প্রকাণ্ড বিমিশ্র সংসারে। যৌথ পরিবারের দায়িত্ব নিতে হলো তাঁকে। কিন্তু কবিতার ঘোর ঘুচল না তাঁর। সংসারের ঘোলাজলের ভেতর থেকেও লিখে গেলেন সুস্মিত শিশিরের মতো কবিতা। এমন হয়েছে—তিনি রান্না করছেন আর তখন *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকার সম্পাদক তাঁদের পরিবারেরই লোক মনোমোহন বাবু বললেন, 'কবিতা লাগবে, প্রেসে পাঠাতে হবে, লোক দাঁড়িয়ে আছে।' কুসুমকুমারী এক হাতে খাতা-কলম, অন্য হাতে খুন্তি নাড়তে নাড়তে লিখে দিলেন

অনিল চলিয়া গেল অনিলের প্রায়;
ক্ষুদ্র হাসি ক্ষুদ্র খেলা ক্ষুদ্র প্রাণ মনোভোলা
ঝরে গেল মুকুলেই না ফুটিতে হায়।

যখন কাজের চাপ কম সন্ধ্যায় কুপি জ্বালিয়ে কুসুমকুমারী বাড়ির উঠানে বসিয়েছেন কবিতাপাঠের আসর। একের পর এক আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কবিতা। আলো-অন্ধকারে মায়ের কোল ঘেঁষে বসে জীবনানন্দও। কুসুমকুমারী ছেলেকে নিজের মতো করে পড়াবেন বলে স্কুলে পাঠালেন না শুরুতে। জীবনানন্দের হাতেখড়ি হলো মায়ের কাছে। এরপর বাড়িতেই কুসুমকুমারী তাঁকে পড়ালেন বাল্যশিক্ষা অঙ্ক। একবারে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করালেন ব্রজমোহন স্কুলে। বাবা সত্যানন্দ সেই স্কুলেরই শিক্ষক। কিন্তু ছেলেকে বললেন, 'শুধু স্কুলে পরীক্ষা পাস করলে হবে না বাবা, চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। ভাবতে শিখতে হবে।' স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠলে জীবনানন্দের জন্য ছোট আলাদা একটা পড়ার ঘর বানিয়ে দিলেন কুসুমকুমারী। সেই ঘরে একটা বইয়ের আলমারি, তাতে নানা রকম বই, দেয়ালে টানিয়ে দিলেন মনীষীদের ছবি। বললেন, 'তোর বন্ধুদের ডাক, ওদের নিয়ে সাহিত্যসভা করব।' জীবনানন্দের সেই পড়ার ঘরে বসল সেসব সাহিত্যসভা, কোনো দিন কথা হলো বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে, কোনো দিন কালিদাস। স্কুলের সিলেবাসবন্দী পড়াশোনায় হতাশ ছিলেন কুসুমকুমারী। তাঁর ওই বিখ্যাত 'আদর্শ ছেলে' কবিতার সূত্র ধরে তিনি এরপর লিখেছেন :

একদিন লিখেছিনু আদর্শ যে হবে
'কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'
আজ লিখিতেছি বড় দুঃখ লয়ে প্রাণে
তোমরা মানুষ হবে কাহার কল্যাণে?

BanglaBook.org

মানুষ গড়িয়া উঠে কোন উপাদানে;
বাঙালি বোঝেনি তাহা এখনও জীবনে—
পুঁথি হাতে পাঠ শেখো দু'চারটে পাশ
আজিকার দিনে তাহে মিলে না আশ্বাস।

বহুকাল পর মাকে স্মরণ করে জীবনানন্দ লিখেছেন, 'গত শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকের তুলনামূলকভাবে একটা নির্দোষ পৃথিবীতে যখন জীবনের এত আড়ম্বর ছিল না, অহেতুক বাড়াবাড়ি ছিল না, যখন মানুষের খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না কিন্তু সবার জন্য যতদূর সম্ভব একটা মঙ্গলকামনা ছিল তখনকার তেমন একটা পৃথিবীর মানুষ আমার মা, যার কাছে গেলে একটা শান্ত উন্নত পরিমণ্ডলে যেন ঢোকা গেল এমন মনে হতো।'

তিন

ভোরে বিছানায় শুয়ে জীবনানন্দ একদিকে যেমন শুনতেন মায়ের প্রার্থনা গান, অন্য ঘর থেকে ভেসে আসত বাবা সত্যানন্দের উপনিষদের আবৃত্তি :

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা কশ্চনৈনম।
হৃদা হৃদিস্থং ষ এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

'এই পরমেশ্বরের রূপ চোখে দেখা যাবে না। তাকে জানতে হবে অনুভব আর মনন দিয়ে।' নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন সত্যানন্দ, ছিলেন নিষ্ঠাবান শিক্ষক। সত্যানন্দের বাবা, জীবনানন্দের ঠাকুরদা সর্বানন্দ দাশ ছিলেন বরিশালের ব্রাহ্ম সমাজের পুরোধা মানুষ। নদীভাঙা মানুষ তিনি। বিক্রমপুরের গাউপাড়া গ্রামে তাঁদের প্রতিপত্তি সব পদ্মার ভাঙনে ডুবে গেলে সর্বানন্দ নানা ঘোরাপথে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন বরিশালে। ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু থেকে হয়েছিলেন ব্রাহ্ম, হয়েছিলেন বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি। বরিশালের বগুড়া রোডের বাড়ি তাঁরই নামে নামাঙ্কিত 'সর্বানন্দ ভবন'। সত্যানন্দ, তাঁর বাবা সর্বানন্দের পথ ধরেই হয়ে উঠেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের গুরুস্থানীয় মানুষ। জীবনাচরণে ছিলেন ধার্মিক। ব্রাহ্ম ধর্ম উপনিষদ, ইসলাম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ মতের নানা মিশেলে তৈরি এক শাখা ধর্ম, হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে। জ্ঞানচর্চা ব্রাহ্মদের ধর্মীয় অনুষঙ্গেরই অংশ। আর্থিক টানাটানি যতই থাকুক, সত্যানন্দের জ্ঞানচর্চায় কমতি ছিল না কোনো। একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন বাড়িতে। সেই লাইব্রেরিতে ডারউইন, হাক্সলি, স্টুয়ার্ট মিলের বই। প্রতি মাসে বেতন পেয়ে জীবনানন্দ আর তাঁর ছোট ভাই অশোকানন্দ, বোন সুচরিতাকে নিয়ে চলে যেতেন বইয়ের দোকানে, বই কিনে দিতেন তাঁদের। একবার একটু পয়সা হাতে এলে কিনে দিয়েছিলেন এনসাইক্লোপেডিয়া।

BanglaBook.org

বাবার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে জীবনানন্দ লিখেছেন, 'লৌকিক সফলতার চূড়ায় পৌঁছাবার একরকম আশ্চর্য ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি একান্তই নিজের ইচ্ছায় শিক্ষাব্রতই গ্রহণ করলেন—অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে বরিশালের ব্রজমোহন ইনস্টিটিউটে। তার সম্মুখে নানা রকম অর্থকরী পথ উদ্দীপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে এবং আন্তরিক প্রেরণায় স্থির করলেন যে শিক্ষকই হতে হবে।'

আরও লিখেছেন, 'সকালবেলার রৌদ্রের সাগরের ভিতর যখন একাকী বসে থাকতেন তখন মনে হতো মহাকবির মতন তিনি নিজেকে প্রশ্ন করছেন, তুমি কি করতে এসেছ অসীম দেশ ও অসীম কালের এক প্রান্তে? এর উত্তরে মন বলে আর কিছু নয়, জীবনে এই কথাটি প্রকাশ করতে এসেছি যে "দেখা হয়েছে"। এই উত্তরটি সমস্ত কর্মের মধ্যে নিহিত, সমস্ত চর্চার মধ্যে আচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে শুভ মুহূর্তে উদ্ভাসিত চৈতন্যের দীপ্তিতে এই উত্তরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সকল দেখার অন্তরে সত্যকে দেখতে পেলাম। কোনো কিছু সংবাদ নিতে নয়, তত্ত্ব নির্ণয় করতে নয়, শুধু এই অনুভব নিয়ে স্থির হয়ে থাকতে যে "দর্শন করা হলো"।'

চার

বৈভব নেই কিন্তু একটা প্রাণ আছে 'সর্বানন্দ ভবনে'র ভেতরের পরিবেশে। কত রকম লোকের আনাগোনা সেখানে। সব ধর্মের, সব শ্রেণির মানুষের। বরিশালের বেশির ভাগ মানুষ তো মুসলমান আর ঐতিহাসিক কারণে তাদের অধিকাংশই তখন নিম্নবর্গের। ছেলেবেলায় তেমন সব মানুষের সাথে দিনরাত্রি ওঠাবসা মিলুর, কিশোর জীবনানন্দের।

BanglaBook.org

মিলুর অসমবয়সী বন্ধু আলী মামুদ। ঋজু শরীর, লম্বা দাড়ি বার্নার্ড শয়ের মতো চেহারা। স্ত্রী-সংসার নেই তাঁর, কোনো নির্দিষ্ট পেশা নেই। কখনো তিনি গাছি। গাছ থেকে নারকেল পেড়ে দেওয়া, সুপারি পেড়ে দেওয়া তাঁর কাজ। দড়ির ফাঁদ পায়ে বেঁধে মামুদ উঠে যান উঁচু উঁচু গাছে। সুপারিবাগানের এক গাছের মাথা থেকে অন্য গাছের মাথায় লাফ দেন অবলীলায়। শীতকালে আলী মামুদ বিক্রি করেন কমলালেবু, গরমকালে আম। বর্ষায় তাঁর কাজ লোকের ঘর মেরামত করে দেওয়া। সর্বানন্দ ভবনের উঠানে বসে আলী মামুদ যখন কাঁচা সুপারি থেকে পাকা সুপারি বাছেন, তখন পাশে গিয়ে বসে মিলু। মামুদ তাকে গল্প শোনান গ্রামের লোকেরা কী করে এক বাঘডাশ ধরেছে। কোনো কোনো দিন মামুদের সঙ্গে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় জীবনানন্দ। দুটা নারকেল বেঁধে একটা টিউবের মতো ভাসিয়ে আলী মামুদ বাড়ির পুকুরে সাঁতার শিখিয়েছেন মিলুকে।

মিলুর বন্ধু রাজমিস্ত্রি মনিরুদ্দিনও। মনিরুদ্দিন একাধারে মসজিদ আর মন্দির দুটাই বানান। মনিরুদ্দিনের সাথে ঘর বানানো দেখতে যায় মিলু, দেখে

কী করে একটা শূন্যস্থান একটু একটু করে ভরে ওঠে নতুন স্থাপত্যে। শোনে জোগালিদের আদিম ছন্দে, দুর্বোধ্য লিরিকে গাওয়া ছাদ পেটানোর গান। যখন রাজমিস্ত্রির কাজ থাকে না, মনিরুদ্দিন বন্দুক হাতে চলে যান কাশীপুরের জঙ্গলে শিকার করতে। ফিরে এলে মিলু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনে সেসব শিকারের গল্প।

সর্বানন্দ ভবনে আসতেন ফকির, বাগানে কাজ করতেন তিনি। নানা রকম গাছগাছালি মিলুকে চিনিয়েছেন তিনি। চিনিয়েছেন কোনটা দূর্বা, কোনটা মধুকুপী ঘাস। একদিন সত্যানন্দ ফকিরকে ডেকে বললেন, 'বর্ষায় বাড়ির পেছনের ঘাসগুলো বড় হয়ে গেছে ফকির, সাপটাপ লুকিয়ে থাকতে পারে। তুমি ওগুলো কেটে ফেলো।' মিলু ওই ঘাস কাটার দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেলে। ফকির তখন তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'কিচ্ছু ভাববে না খোকাবাবু, এই তো আর কয়েক দিন, দেখবে আবার কেমন সুন্দর নরম কচি কচি ঘাস গজিয়ে যাবে।' মিলু বড় হয়ে প্রেমিকার হৃদয়কে বলবে ঘাস। লিখবে, 'সুরঞ্জনা, তোমার হৃদয় আজ ঘাস।' বড় হয়ে একবার নিজে ঘাসও হতে চাইবে সে :

...আমারও ইচ্ছ করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদু অন্ধকার থেকে নেমে।

BanglaBook.org

সন্ধ্যায় মিলুর সঙ্গী মোতির মা, কুসুমকুমারীর গৃহস্থালি কাজের সহযোগী। তিনি মিলুকে শোনান ডাইনি আর শঙ্খমালার গল্প। মিলুর এক পূর্বপুরুষকে যে পরিরা উড়িয়ে নিয়ে যেত তাদের দেশে, তারপর তাকে পাওয়া যেত শিশিরভেজা ধানখেতের পাশে এবং তার বিছানায় ছড়িয়ে থাকত কাঁচা লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি সেসব গল্প জীবনানন্দ শুনেছেন মোতির মায়ের কাছ থেকেই।

পাঁচ

কাব্য, প্রজ্ঞা, রূপকথা, ঘাস, ফুল, পাখি মিলিয়ে মূর্ত-বিমূর্ত পৃথিবীর এক মায়াবী শৈশব, কৈশোর জীবনানন্দের। যেন পৃথিবী বড় এক আনন্দের জায়গা, যেন পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে আছে সত্য আর সুন্দর। জীবনানন্দের ছেলেবেলায় জন্ম নেওয়া ওই মায়ার ভেতরেই কি বোনা আছে তাঁর জীবনের বিপদের বীজ? পৃথিবী যখন একটু একটু করে দরজা খুলেছে তার সামনে তখন বাস্তবতার কাঁটা মাছ কি চারদিক থেকে বিদ্ধ করেছে তার মায়ার বেলুনকে?

সেই যে উত্তরের হাওয়ায় তার জীবন ফিরিয়ে এনেছিলেন মা, তারপর থেকে এক হাঁস ছানার মতো মায়ের পিছু পিছু থেকেছেন জীবনানন্দ সর্বক্ষণ। শৈশবে শোনা মায়ের এই যে কবিতার লাইন 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে', একে যেন জীবনানন্দ দাশ একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন। কথায় বড় হওয়া তো দূরের কথা, সহজ লোকের মতো কথাই তিনি বলতে পারতেন না, বলতেন না। সারা জীবন ছিলেন ভেতর গোটানো, মুখচোরা মানুষ।

আর কাজ? মাকে দেখেছেন সবচেয়ে একাগ্রতার সাথে, সবচেয়ে ধ্যানমগ্নতায় যে কাজটা করতে, সেটা হচ্ছে লেখা। অলক্ষ্যে বুঝি তাই কাজ বলতে তিনি বুঝেছিলেন লেখাকেই। জীবনের অন্তিম সময়টায় ওই ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ির একটা কামরায় একাই থাকতেন জীবনানন্দ। তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরা থাকত অন্য ঘরে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ওই ঘর থেকে উদ্ধার হলো কেরোসিন কাঠের একটা টেবিল আর একটা চেয়ার, টেবিলের ওপর কয়েকটা এক্সারসাইজ খাতা, লাল, নীল কয়েকটি পেনসিল, সুলেখা কালির দোয়াত, একটা ঝরনা কলম। ঘরের কোনায় একটা পিঁড়ির ওপর থাক থাক করে রাখা খবরের কাগজ, নানা রকম সাহিত্য পত্রিকা, একটা তক্তপোশ, তার ওপর একটা পাতলা তোশক, চাদর, বালিশ। ওয়ারবিহীন একটা লেপ, হাতপাখা। ঘরের কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখা গোটানো একটা মাদুর। আর তক্তপোশের নিচে গোটা কয়েক কালো টিনের ট্রাঙ্ক। বিশ্বসংসারে এই ছিল জীবনানন্দের বিষয়-সম্পত্তি। এসব ফেলেই দেওয়া হতো কিন্তু হঠাৎ তুতেনখামেনের পিরামিডের গুপ্তধনের মতো ওই সব ট্রাঙ্ক থেকে উদ্ধার হলো জীবনানন্দের লেখা অপ্রকাশিত গল্প, উপন্যাসের রাশি রাশি পাণ্ডুলিপি।

বোন সুচরিতা আর সেই কবিতাপ্রেমিক মেডিকেল ছাত্র ভূমেন্দ্র তারপর দায়িত্ব নিলেন ওই ট্রাঙ্কগুলোর। ট্রাঙ্কগুলো বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে কখনো স্টোররুমে, কখনো লফটে পড়ে থাকল। একবার ট্রামে করে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নেবার সময় হারিয়ে গেল সেসব পাণ্ডুলিপি। তারপর বহু কষ্টে তা উদ্ধার হলো ট্রাম ডিপো থেকে। নানা ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে অবশেষে সেসব পাণ্ডুলিপির জায়গা হলো কলকাতার আর্কাইভে। লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় জীবনানন্দের এই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, '৬০ বছর কেবল পাতাগুলো হলুদ হয়েছে এবং ন্যাপথলিন ছাড়া কোনো কার্যকর কীটনাশক না থাকা সত্ত্বেও পোকারা তা কাটতে সাহস পায়নি।'

বহুকাল পর সেসব পাণ্ডুলিপির মর্মোদ্ধারের মূল দায়িত্ব বর্তাল ভূমেন্দ্র গুহের ওপর। তাঁর সঙ্গে কখনো যোগ দিলেন জীবনানন্দের বোন সুচরিতা, কখনো ভাই

BanglaBook.org

অশোকানন্দ, পরবর্তীকালে দেবেশ রায়, শঙ্খ ঘোষ, আফসার আহমেদ প্রমুখও। কিন্তু ভূমেন্দ্র গুহ, পরবর্তী জীবনে স্বনামধন্য চিকিৎসক, তাঁর জীবনের শেষ সময়টায় মূলত জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির ওপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়েই বসে থাকলেন। আমাদের সামনে তুলে আনলেন গোপন নতুন এক জীবনানন্দকে। যদিও এখনো উদ্ধারপর্ব চলছে, তবু জীবনানন্দের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লেখা যোগ করলে দেখা যাচ্ছে তিনি লিখেছেন প্রায় আড়াই হাজার কবিতা, গোটা বিশেক উপন্যাস, শতাধিক গল্প, পঞ্চাশটির ওপর প্রবন্ধ আর প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার ডায়েরি, যাকে তিনি বলেছেন 'লিটেরারি নোটস'। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর আদিম লিপির মতো সাংকেতিক ভাষায় মূলত ইংরাজিতে লেখা সেসব নোটস। লিটেরারি নোটস বললেও ওই সব ডায়েরির বিষয় পরবর্তীকালে সাহিত্য ছাড়িয়ে আরও বিবিধ বিচিত্র ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ভরে উঠেছে। ডায়েরি কখনো হয়েছে তাঁর বন্ধু, কখনো তাঁর ঢাল, কখনো বা তাঁর আত্মস্বীকারোক্তির জায়গা।

এই হচ্ছে জীবনানন্দের কাজ। লেখা তাঁর কাছে ছিল মানুষ হবার সমান্তরাল। নিজের যাবতীয় শ্রম, মেধা ঢেলে প্রকাশ্যে, গোপনে ধারাবাহিকভাবে ওই একটা কাজই করে গেছেন জীবনানন্দ। এগুলো বাতাসে গেরো দেবার কাজ। বাজিকরের মতো সে কাজের খানিকটা মাত্র দেখিয়েছেন লোকদের কিন্তু বড় অংশ লুকিয়ে রেখেছেন। লোকে না দেখুক, না জানুক, না বুঝুক, তবু লেখার কাজটা করে গেছেন অবিরাম। জগৎ-সংসারে বাকি যে কাজই করবার চেষ্টা করেছেন, তাতে নাকাল হয়েছেন বারবার।

BanglaBook.org

বাছা কি উড়িতে পারিবি?

এক

মায়ের উৎসাহে কৈশোরে স্কুলের খাতায় ছেলেমানুষি ছড়া লিখলেও কবিতার আসল সিন্দবাদ জীবনানন্দের ঘাড়ে চেপেছে আরও পরে, ধীরে ধীরে। কুসুমকুমারীই হাঁস মায়ের মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিয়ে জীবনানন্দকে চিনিয়ে দিয়েছেন কবিতার হাঙরভরা সমুদ্রের পথ।

জীবনানন্দের প্রথম কবিতা যখন ছাপা হলো, তখন তাঁর বয়স বিশ বছর। বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে, ব্রজমোহন কলেজ থেকে আইএ পাস করে, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএ পাস করেছেন তিনি সে বছর। তিনি তখন শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। সেই কবিতা

তিনি লিখেছেন, ছাপিয়েছেন মায়েরই আদেশে। *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকার প্রতিবছরের নববর্ষের সংখ্যার বিশেষ কবিতাটা লিখতেন কুসুমকুমারী দাশ। সে বছর কুসুমকুমারী জীবনানন্দকে বললেন, 'মিলু, এ বছর *ব্রহ্মবাদীর* নববর্ষের কবিতাটা তুই লিখবি।'

কবির সন্তান কবি হবে এমন কোনো গণিত নেই। রবীন্দ্রনাথের সন্তানেরা কেউ কবি নন। তিনি তাঁর সন্তানদের উৎসাহিতও করেননি। ছেলেকে পড়তে পাঠিয়েছেন কৃষিবিদ্যা। কিন্তু কুসুমকুমারী চেয়েছেন খুব বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই ছেলে তার অক্ষরের পর অক্ষর সাজানোর এই নিগূঢ় খেলায় নেমে পড়ুক। বস্তুত মায়ের নির্দেশেই জীবনানন্দ লিখলেন তাঁর প্রথম আনুষ্ঠানিক কবিতা 'বর্ষআবাহন'

ওই যে পূর্ব তোরণ-আগে
দীপ্ত নীলে, শুভ্র রাগে
প্রভাত রবি উঠল জেগে
দিব্য পরশ পেয়ে,
নাই গগনে মেঘের মায়া
যেন স্বচ্ছ স্বর্গকায়া!
ভুবন ভরা মুক্ত মায়া
মুগ্ধ হৃদয় চেয়ে।

১৯১৯ সালের *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যার প্রথম পাতায় ছাপা হলো সে কবিতা, কবিতার শেষে লেখা হলো শ্রীজীবনানন্দ দাশ বিএ। সাদামাটা, নিরীহ এক কবিতা। তবু জীবনানন্দের প্রথম ছাপা কবিতা হিসেবে এর গায়ে লেগে আছে ভিন্ন এক আভা।

কিন্তু মায়ের আদেশে ওই একটা কবিতা লিখে রহস্যজনকভাবে নীরব হয়ে গেলেন জীবনানন্দ। এক এক করে পাঁচ বছর পেরিয়ে গেল *ব্রহ্মবাদীর* ওই কবিতার পর আর একটা কবিতাও লিখলেন না তিনি। একদিন বাংলা কবিতার বাঁক বদলে ফেলবেন জীবনানন্দ কিন্তু বছরের পর বছর যায় কবিতা লিখবার কোনো তাড়া নেই তাঁর। তাগাদা দিলেন কুসুমকুমারী। বিএ পাস করে তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি পড়ছেন। বরিশাল থেকে কলকাতায় চিঠি পাঠিয়ে লিখলেন, 'কী ব্যাপার মিলু, কবিতা লেখা একদম ছেড়ে দিলি? বিষয় খুঁজে পাচ্ছিস না? এক কাজ কর, আমাদের ব্রাহ্মসমাজের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে কবিতা লেখ।' কুসুমকুমারী কিছু মনীষীর নামের তালিকা পাঠালেন জীবনানন্দকে। আগেরবার মায়ের নির্দেশে কবিতা লিখে দিলেও এবার আর সাড়া দিলেন না জীবনানন্দ। নীরব রইলেন।

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে এমএ পাস করলেন জীবনানন্দ। পরীক্ষার সময় অসুস্থ হয়ে পড়াতে ফল ভালো হলো না তাঁর। সেকেন্ড ক্লাস পেলেন। এ ফল তাঁকে ভোগাবে ভবিষ্যতে। ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাসের মারপ্যাঁচে চাকরির বাজারে পিছিয়ে পড়বেন। তবে ওই মুহূর্তে বিশেষ সমস্যা হলো না। কলকাতায় ব্রাহ্ম এডুকেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজে জুনিয়র টিউটর পদে চাকরি একটা জুটে গেল তাঁর। বেশ মনোযোগ দিয়ে শিক্ষকতা শুরু করলেন জীবনানন্দ। থাকতে লাগলেন সিটি কলেজের কাছে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে। মফস্বল বরিশালের ছেলে, কলকাতা মহানগরের ভিড়ে নেহাতই আগন্তুক একজন। কলকাতায় তাঁর তেমন কোনো বন্ধু জোটেনি। নিয়মিত কলেজে যান, টিউটরিয়াল নেন, বোর্ডিংয়ে ফিরে পত্রিকা পড়েন, বই পড়েন, বেতন পেয়ে বাড়িতে মানি অর্ডারে টাকা পাঠান, এই তাঁর জীবন তখন। সে জীবনে কবিতা নেই। বছর পাঁচেক আগে *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকায় প্রকাশিত অকিঞ্চিৎকর সেই কবিতা ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো সম্বল নেই তাঁর।

দুই

কবিতাবিহীন এই সময়টায় জীবনানন্দ কী ভাবছেন, সে খোঁজ পাওয়া যায় তাঁর ডায়েরিগুলোতে। দেখা যাচ্ছে জীবনানন্দ কিছু লিখছেন না তখন ঠিক, কিন্তু খুব আটঘাট বেঁধে লিখবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নিংড়ে পড়ছেন বিশ্বসাহিত্য, খোঁজখবর রাখছেন বিশ্বরাজনীতির, চোখ রাখছেন বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের দিকেও। সেসব ব্যাপারে নোট রাখছেন। সেই নোটবইয়ের নাম যে দিয়েছেন 'লিটেরারি নোটস', তাতেই বোঝা যায়, সাহিত্য যে করবেন সেটা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছেন। কিন্তু একটু বুঝেশুনে নামতে চান লেখালেখিতে। মা কবিতা লেখার তাগাদা দিচ্ছেন কিন্তু ভাবছেন মায়ের আদেশ বা অনুরোধে, নেহাত সাহিত্য করার উত্তেজনায়, পত্রিকায় নাম প্রকাশের আত্মপ্রেমে কবিতা তিনি লিখবেন না। নিজেকে তৈরি করে নেবেন আগে। কবিতা নিয়ে তাঁর নিজের ভাবনা দানা বাঁধছে তখন। ডায়েরি থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে তাঁর মনের ভেতর তখন নানা রকম অসন্তোষ। তাঁর আশপাশের জীবন, মানুষের রুচিবোধ, সাহিত্যবোধ নিয়ে তাঁর মনে ক্ষোভ।

১৯২৫ সালের ডায়েরির এক পাতায় জীবনানন্দ একটা অভিজ্ঞতার কথা লিখছেন। তখন জুলাই মাস, সিটি কলেজের গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতা থেকে বরিশাল ফিরছেন তিনি। স্টিমার তার বড় বড় চাকায় পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে আর তিনি খোলা ডেকে বসে আছেন। জীবনানন্দের সঙ্গে আছেন অমূল্য নামে বরিশালের এক পরিচিত মানুষ। অমূল্য গান করেন এবং নিজেকে সাহিত্যবোদ্ধা মনে করেন। অমূল্য স্টিমারের ডেকে বসে জীবনানন্দকে অতুলপ্রসাদের 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে' গানটা শোনালেন এবং তারপর জীবনানন্দকে বোঝালেন

BanglaBook.org

অতুলপ্রসাদ কেন অত্যন্ত উঁচু দরের এক মহান কবি। জীবনানন্দ চুপচাপ তাঁর কথা শুনলেন। কিন্তু মনে মনে অমূল্যের ওপর খুব বিরক্ত হলেন। অতুলপ্রসাদ হিন্দুস্থানি গানের সঙ্গে বাংলা গানের মিশ্রণ ঘটিয়ে এ অঞ্চলের গানের একটা বৈচিত্র্য এনেছেন এবং তাঁর গানের একটা আবেদন আছে সেটা তিনি মানছেন কিন্তু তাই বলে তাঁকে মহান কবি ভাবার কোনো কারণ দেখেন না জীবনানন্দ। জীবনানন্দ ডায়েরিতে লিখছেন, ইংরাজিতেই লিখেছেন তিনি মূলত, 'On the whole, Atulprashd's songs appeal. But to say that he is a great poet or even a good poet proceeds from the inherent ignorance of the unpeotical.'

এরপর জীবনানন্দ তাঁর ডায়েরিতে মহৎ কবিতার গুণ, তাৎপর্য, তার অতলস্পর্শী শক্তি নিয়ে নানা কথা লিখেছেন। সেই সূত্র ধরে তিনি বলছেন সমাজের চারদিকেই মাঝারি মানের কোনো ব্যাপারকে মহৎ ভাবার প্রবণতা বেড়ে গেছে। এ নিয়ে মন-মেজাজ খারাপ করে তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন, 'We have no taste for enjoyment. ...Not have we any instinct for aesthetics. We are content with fourth hand men and materials. We have no complains if the chair is bug ridden and creaking if we can just manage to sit on it somehow. ...We grind our daily rounds of topics on nothing but matter, material prospertity is the vision of our brains, matter and materialism ... our nation is no better than a dead pool we have lost the Iconoclast's spirit...'

এই যে একটা প্রবণতা যে চেয়ারে কোনোরকম বসতে পারলেই হলো, তাতে ছারপোকা থাকুক আর তা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করুক, তাতে কিছু যায়-আসে না, এই প্রবণতার ব্যাপারেই জীবনানন্দের রাগ। যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন, মাঝারি মানের কোনো কিছু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার রুচি তাঁর ঘুচে গেছে অনেক আগেই। তাঁর ক্ষোভ 'ম্যাডিওক্রাসি' নিয়ে। কবিতা লিখলে লিখবেন সর্বোচ্চ মানকে মাথায় রেখে, না হয় লিখবেন না, এমনই ভাবছেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি এ-ও লক্ষ করছেন যে চারদিকে লোকের আলাপ ওই একটাই ধন, সম্পত্তি, বস্তু। দেশ তখন ব্রিটিশদের অধীনে। দেশকে তখন একটা মরা পুকুরের মতো মনে হচ্ছে তাঁর। একটা অতলান্ত অতৃপ্তির নিম্নচাপ তখন জীবনান্দের মনের ভেতর। চারদিকে মেঘ জমছে, আকাশ কালো হয়ে আসছে। সৃষ্টির জলোচ্ছ্বাসের জন্য এই নিম্নচাপ তো জরুরি।

তিন

ডায়েরিতে যে বছর এসব কথা লিখেছেন, সেই ১৯২৫-এ দীর্ঘ ছয় বছরের বিরতির পর হঠাৎ জীবনানন্দ একটা নতুন কবিতা নিয়ে হাজির হলেন। তাঁর দ্বিতীয় কবিতা। এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কবিতা। এ বছর ব্রিটিশবিরোধী

BanglaBook.org

আন্দোলনের আলোচিত নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ, যিনি 'দেশবন্ধু' হিসেবে পরিচিত, মারা যান। তাঁকে স্মরণ করে জীবনানন্দ লিখলেন কবিতা 'দেশবন্ধু প্রয়াণে'। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা তখন চিত্তরঞ্জন দাশ। মুন্সিগঞ্জে বাড়ি তাঁর, বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করা কলকাতা হাইকোর্টের এই নামজাদা উকিল, স্বদেশি নেতা অরবিন্দ ঘোষকে বিখ্যাত আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে খালাস করিয়ে এনে সবার নজর কেড়েছেন। চিত্তরঞ্জন এরপর ওকালতি ছেড়ে দিয়ে শুরু করেছেন রাজনীতি, স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছেন, নিজের জমানো সম্পদ দিয়ে তৈরি করেছেন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল। জোরেশোরে বলেছেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা। বলেছেন হিন্দু-মুসলমানের যৌথ বাংলা রাষ্ট্র তৈরি করার কথা। আন্দোলনের ডাক দিয়ে তিনি তখন চষে বেড়াচ্ছেন বাংলার নানা অঞ্চল। বিক্রমপুর-মুন্সিগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে চিত্তরঞ্জন গিয়েছিলেন দার্জিলিং এবং সেখানেই আকস্মিকভাবে মারা যান তিনি। তাঁর অকালমৃত্যু আলোড়িত করে বাংলার মানুষকে। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' কাজী নজরুল ইসলাম লিখলেন কবিতা 'রাজভিখারী'। এই মৃত্যু জীবনানন্দকেও খুব তাড়িত করে। ডায়েরিতে দেশের যে মরা পুকুরের দশার কথা লিখেছেন, সেই স্থবির দেশকে চিত্তরঞ্জনই সুষুপ্তির ঘোর থেকে জাগিয়ে তুলবেন, এমনই মনে হয়েছিল তাঁর। জীবনানন্দ চিত্তরঞ্জনের ভেতরই দেখেছিলেন তাঁর সেই কাঙ্ক্ষিত 'আইকোনোক্লাস্টিক স্পিরিট'। কবিতাটা মায়ের পছন্দের পত্রিকা *ব্রহ্মবাদী*র বদলে তিনি পাঠালেন রাজনৈতিকভাবে আলোচিত পত্রিকা *বঙ্গবাণী*তে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস *পথের দাবী* ছাপিয়েছিল এই পত্রিকা, যা পরে বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশরা। কবিতাটা ছাপা হলো চিত্তরঞ্জনকে নিবেদিত *বঙ্গবাণী*র বিশেষ সংখ্যায় :

বাংলার অঙ্গনেতে বাজায়েছে নটেশের রঙ্গমল্লী গাঁথা
অশান্ত সন্তান ওগো,—বিপ্লবিনী পদ্মা ছিলো তব নদী-মাতা
কালবৈশাখীর দোলা অনিবার দুলাইত রক্তপুঞ্জ তব
উত্তাল ঊর্মির তালে,—বক্ষে তব লক্ষ কোটি পন্নগ-উৎসব
উদ্যত ফণার নৃত্যে আস্ফালিত ধূর্জটির কণ্ঠ-নাগ জিনি,...
ভেঙেছিলে বাঙালির সর্বনাশী সুষুপ্তির ঘোর,
ভেঙেছিলে ধুলিশ্লিষ্ট শঙ্কিতের শৃংখলের ডোর,...

প্রচুর তৎসম শব্দে ভারী এক কবিতা। প্রচলিত ধারাতেই লেখা। তবে লক্ষ রাখবার ব্যাপার যে পরবর্তী জীবনে জীবনানন্দের কপালে নির্জন কবির তকমা জুটলেও কবিতা পৃথিবীতে পাঁচ বছরের নীরবতার পর তাঁর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছিল ঘোর রাজনীতির প্রশ্নেই। ছাপা হবার পর *বঙ্গবাণী* পত্রিকার একটা কপি

BanglaBook.org

জীবনানন্দ কলকাতা থেকে ডাকে পাঠিয়ে দিলেন বরিশালে তাঁর কবিতার গুরু মায়ের উদ্দেশে।

চার

জীবনানন্দের এই কবিতা পছন্দ করলেন না কুসুমকুমারী। পত্রিকা পেয়ে ফিরতি চিঠিতে কুসুমকুমারী লিখলেন, 'চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে লিখেছ ভালোই করেছ। কিন্তু রামমোহনের উপর লিখতে বলেছি তোমাকে, মহর্ষির উপরও।'

কুসুমকুমারী জীবনানন্দের কাছ থেকে আশা করছিলেন তাঁর পছন্দের মনীষীদের ভক্তি জানিয়ে লেখা শান্ত, স্তিমিত কবিতা। কুসুমকুমারী তাঁর ছেলের কবিতার পথরেখাকে নির্দিষ্ট করে দিতে চাচ্ছিলেন। ছুটিতে কলকাতা থেকে সেবার বরিশাল গেলে এই নিয়ে কুসুমকুমারীর সঙ্গে একটা বিতর্ক বেধে যায় জীবনানন্দের। চিত্তরঞ্জনের চেয়ে রামমোহন বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেন অনেক মহৎ মানুষ এবং কেন তাঁদের সম্মান জানিয়ে কবিতা লেখা উচিত, সে কথা নতুন করে জীবনানন্দকে বলেন কুসুমকুমারী। সেই কিশোর বয়সে রাতে বিছানায় শুয়ে বাজকুড়ল পাখির ডাক শুনতে শুনতে যেভাবে মাকে কাছে চাইতেন জীবনানন্দ, তখনো তা-ই চান। কিন্তু মাকে তিনি বুঝিয়ে উঠতে পারেন না যে তাঁর পৃথিবী আর মায়ের পৃথিবীর ভেতর ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে যোজন ফারাক। তাঁর পক্ষে মায়ের ভোরের শিশিরের মতো নির্মল কবিতা লিখবার আর উপায় নেই। মায়ের সঙ্গে তর্ক করলেন জীবনানন্দ, বললেন, 'কে মহৎ আর কে মহৎ না সে বিচারের ভার আমার উপরই ছেড়ে দাও। না মা আমি ঐসব মনীষীদের নিয়ে কবিতা লিখব না।'

বহু বছর পর মায়ের সঙ্গে তর্কের সেই দিনটা স্মরণ করে জীবনানন্দ লিখেছেন, 'তখন আমার মন বড় বড় আদর্শ পুরুষকে তাদের উঁচু পীঠস্থান থেকে নামিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চাইত। তাদের সত্যিকারের মূল্যনিরূপণের নামে বিনাশী বুদ্ধিবলে তাদের আঘাত করে।'

এমন সরব তর্কপ্রবণ মিলুকে দেখে কুসুমকুমারী অবাক হলেন। তাঁকে শুধু বললেন, 'ওরকম করে হয় না—আগে তাদের মহত্ত্বে বিশ্বাস কর—মনের নেতিধর্ম নষ্ট করে ফেল, শুধু মহামানুষ কেন, যে কোন মানুষ কতখানি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র অনুভব করতে শেখ।'

শৈশবে বরিশালে মায়ের কাজের সঙ্গী মোতির মা জীবনানন্দকে রূপকথার সেই পাখির গল্প শুনিয়েছিলেন—

পাখী মা দেখলো, ছানারা একটু বড় হইছে। তারা ডানা ঝাপটায়।

মা কইলে—বাছারা তরা কি এখন উড়তে পারবি?

ছানারা কয়—হ পারুম।

মা কইলে—তাইলে যা, উইড়া যা। তয় সাবধানে থাকিস।

BanglaBook.org

জীবনানন্দের তখন মায়ের পাখার নিচ থেকে বেরিয়ে উড়াল দেবার সময়। উড়াল তিনি দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু মায়ের ওই কথাগুলো মনে রেখেছেন। পরিণত বয়সে এসে লিখেছেন, 'অনেক অনুতর্ক বিতর্কের পর টের পেয়েছি মার কথাগুলো সত্যই ছিল, ওভাবে হয় না।'

কিন্তু এই ধারণাও তাঁর ইতিমধ্যে হয়েছে যে মা যে পথে চলতে চাইছেন মন পবনের মাঝি হয়ে, সে পথে হয়তো এগোনো যায় কিন্তু বাস্তব পৃথিবীর পথে বিদ্বেষ, হিংসা আর সংঘর্ষের কাঁটা বিছানো। কেবল মহৎ মানুষের বন্দনায় তাতে বিশেষ কাজ হয় না। কৈশোরে জীবনানন্দ যে মায়াবী পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তা বদলে গেছে তত দিনে। জীবনের জঙ্গমতার সঙ্গে পরিচয় ঘটছে তাঁর।

নোঙর তুললেই নতুন দ্বীপের দেখা মেলে না

এক

মায়ের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের পর জীবনানন্দের মনের ভেতর একটু তোলপাড় ঘটল। একটা অপরাধবোধও যেন জাগল তাঁর। এ সময় একটা নতুন সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ঠিক করলেন কবিতার বদলে গদ্য লিখবেন এবার। সে বছরই ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাভাজন দুজন মানুষের মৃত্যুতে পরপর দুটা স্মৃতিচারণামূলক গদ্য লিখলেন জীবনানন্দ। লেখা দুটা ছাপালেন মায়েরই প্রিয় *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকায়, যেন মায়ের সঙ্গে খানিকটা সমঝোতা করবার চেষ্টা করছেন তিনি।

একটা লেখা তিনি লিখলেন ব্রাহ্মসমাজে বড়কর্তা নামে পরিচিত কালিমোহন দাশের মৃত্যুতে, অন্যটা ব্রাহ্মসমাজের আরেক শ্রদ্ধাভাজন মানুষ বাণীপীঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক রসরঞ্জন সেনের মৃত্যুতে। দুজনই তাঁর পারিবারিক মানুষ, ফলে তাঁদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। লিখেছেন দুজন পরিচিত মানুষ নিয়ে কিন্তু লেখা দুটা পড়লে বোঝা যায়, এ সময় তিনি জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে বড় বড় প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনকে মিলিয়ে সেসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করছেন। কালিমোহন দাশকে নিয়ে লিখতে গিয়ে জীবনানন্দ লিখলেন, 'দীর্ঘ পথের যাত্রা শুরু করিয়া মুসাফিরকে মাঝে মাঝে পান্থশালায় আশ্রয় লইতে হয়। যাত্রাপথটিও যেমন তার সমস্ত নয়, পান্থশালার ভিতরও তেমনি তাহার সকল অস্তিত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। পথিক গতিশীল। কোথায় কোন দিকচক্রবালের পারে তাহার যাত্রার শেষ তাহা সে দেখিতে পায় না, মনে মনে খানিকটা সমঝাইয়া লইতে পারে শুধু। কত কত পথের বাঁক, নদীর কিনারা,

BanglaBook.org

হরিৎ ক্ষেত, উষর মরু তাহাকে পার হইতে হয়। কত কত সরাইখানায় তাহাকে বিশ্রাম খুঁজিতে হয়। শেষে হয়তো সে তার সুদূর নিরিখের সন্ধান পায়। পৃথিবীর প্রতি পথিকেরই এমনি করিয়া অনিবার যাত্রার সূচনা হইতেছে, অসংখ্য পথ, পরিধি অতিক্রম করিতে হইতেছে, পথিক আত্মার বেলাও তাই সে স্থিতিশীল নহে।... যে নদী মরু বালুতে বিরস হইয়া গিয়াছে সে যে ফল্গুরূপে ধরণীর নিমজ্জমান স্তরকে সরস করিয়া রাখিয়াছে, যে পাপড়িগুলি ঝরিয়া পড়িয়াছে সেগুলির যে শেষ নিকাশ হইয়া যায় নাই, নব মঞ্জুরণের জন্য যে তারা তৈরী হইয়া রহিয়াছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। যে অতিথি আজ আমাদের ভিতর হইতে চলিয়া গেলেন তিনি চিররাত্রির ভিতর আপনাকে নিভাইয়া, জড়াইয়া রাখেন নাই। একটা অটুট অপর্যাপ্ত প্রাণের স্পন্দনে তিনি আলোকলোকে অপরূপভাবে আপনাকে আবার ফুটাইয়া তুলিতেছেন। মরনের ভিতর কোনো বিহ্বলতা বা ভয়াল ভ্রুকুটির ব্যথা থাকিতে পারে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে মৃত্যু তাই সলিল সঞ্চরমাণ আত্মার একটি নবতর লীলা—নবীন সঞ্চয়। সৃষ্টির ভিতর কোনো সুপ্তি বা মাত্রা নাই—আছে শুধু অন্তহীন বিকাশ।...

জীবন যে একটা অভিযাত্রা, মানুষ যে বস্তুত একজন পথিক, মৃত্যু যে সেই প্রবহমান যাত্রারই একটা অংশ—এসব ভাবছেন জীবনানন্দ তখন। বলছেন প্রাণের মৃত্যু নেই, সে বরং নানা নতুন রূপে এই বিশ্বসংসারে আবির্ভূত হয়। জীবনানন্দ যে পরবর্তীকালে কবিতায় মানুষের বদলে পঙ্খচিল, শালিখ, বুনো হাঁস হয়ে জন্ম নিতে চাইবেন, তার বীজ যেন রোপণ হয়ে যাচ্ছে তখনই। প্রথম গদ্যটা সাধু ভাষায় লিখলেও পরের গদ্যটা লিখলেন চলতি ভাষায়। রসরঞ্জন সেনকে নিয়ে লেখা সেই রচনায় লিখলেন, 'সাধারণ মানুষের থেকে উচ্চগ্রামে যারা বাস করেন, তাদের নিকটে মানুষের জীবনের ও ব্রহ্মাণ্ডের অবারিত সীমা ও সময় স্রোত একটা সমস্যার মত দেখা দেয়। মানুষের সভ্যতার প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধান করবার নানারকম প্রয়াস চলছে। আধুনিককালের এক দ্রষ্টা আইনস্টাইন তাঁর Theory of Relativity আবিষ্কার করে সনাতন সমস্যার কোনো এক দিকের কিছু নিরসন করেছেন বটে, কিন্তু তার চরিতার্থতা আংশিক, খুবই মূল্য আছে বটে তার কিন্তু দৃষ্টি সমগ্রকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পেরেছে বলে মনে হয় না; কোন মানুষই তা পারে না। প্রতিটি নতুন যুগ এবং যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিই নতুন করে নিজেকে, নিজের সমাজ ও পৃথিবীকে এবং সম্ভব হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অধ্যয়ন করে যান—যদি সম্ভব হয় কিছু নতুন আলো দিয়ে যান, কিংবা দিয়ে যেতে চেষ্টা করেন।... অধিকাংশ লোকের বেলায় দেখা যায়, পৃথিবীতে তারা জন্মগ্রহণ করে ও পরে একদিন তাদের মৃত্যু হয়, জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝখানে এমন বিশেষ কিছুই তারা নিষ্পন্ন করে না, যার জন্য সমাজ বা

BanglaBook.org

ইতিহাসের অভিযান কোনো ভবিষ্যতের মঙ্গলের দিকে সামান্যভাবেও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে জীবনকে তারা যেমনভাবে পেয়েছে, তেমনিভাবে গ্রহণ করে জীবন মৃত্যুতে লয়প্রাপ্ত হয়...অনেকদিন থেকে একটা বিস্ময় অনুভব করে এসেছি এই ভেবে যে নিঃসর্গের একটা অবাধ্য প্রণালি আছে এই—অনেক অযোগ্য লোক তার নির্দেশে ইতিহাস খ্যাতি পেয়ে যায় অথচ ঢের কৃতী ব্যক্তিদের খবর সে ইতিহাসকে রাখতে দেয় না। আজ সেই উপরোক্ত আত্মার জীবন সম্পর্কেও এই কথা না ভেবে থাকতে পারা যায় না, নানা দিক দিয়েই তিনি ইতিহাসে খ্যাতি পাবার মতন উপযুক্ত মানুষ ছিলেন...'

রসরঞ্জনকে নিয়ে লিখতে গিয়ে জীবনানন্দ জীবনকে নতুন করে আবিষ্কারের কথা বলছেন, বলছেন যাঁরা সাধারণ মানুষের থেকে উচ্চগ্রামে বাস করেন, তাঁদের কাছে জীবনের সীমা এবং সময় স্রোত কেমন একটা সমস্যার মতো দেখা দেয়। এসব তাঁর নিজের জীবনের দিকে তাকিয়েই ভাবছেন যেন। নিঃসন্দেহে তাঁর মন ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের থেকে উচ্চগ্রামে পৌছে গেছে। সময় স্রোতকে বুঝতে গিয়ে তিনি এমনকি যাচ্ছেন পদার্থবিদ্যার কাছেও, প্রশ্ন তুলছেন আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিয়ে। সেই সঙ্গে লিখছেন যে অনেক অযোগ্য লোক ইতিহাসে খ্যাতি পেয়ে যায় অথচ ঢের কৃতী ব্যক্তিদের খবর ইতিহাস রাখে না। জীবনানন্দ কি নিজের জীবনের আগাম পথরেখাটাই দেখতে পাচ্ছেন জীবনের শুরুতেই?

BanglaBook.org

দুই

কলকাতায় তখন একটা নিঃসঙ্গ জীবনই কাটাচ্ছেন জীবনানন্দ। কলেজে ক্লাস নেওয়ার পরে কলকাতার কোলাহলে ফুটপাত থেকে ফুটপাত ধরে একা একা হেঁটে বেড়ান। চুপচাপ থাকেন, লোকজনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলবার দক্ষতা তাঁর নেই। কলেজে মাস্টারি করছেন কিন্তু মনের ভেতর লিখবার ইচ্ছাটা প্রবল হচ্ছে। কিন্তু গদ্য না কবিতা, ঠিক কী লিখবেন, কী নিয়ে লিখবেন তখনো যেন ঠিক স্পষ্ট না তাঁর কাছে। ইতিমধ্যে দুটা কবিতা লিখেছেন আর দুটা গদ্য। সাহিত্যের এই যা সম্বল তাঁর। এ সময় একদিন কলকাতার পথে পথে ঘুরে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে ফিরে রাতের বেলা একটা কবিতা লিখলেন জীবনানন্দ। তাঁর আগের দুটা কবিতার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। আগে লিখেছেন বর্ষবরণ নিয়ে, রাজনৈতিক নেতা বা ধর্মীয় নেতার মৃত্যু নিয়ে। কিন্তু এবার লিখলেন একান্ত ব্যক্তিগত একটা অনুভব নিয়ে। এর আগে তিনি তাকিয়েছেন বাইরের পৃথিবীর দিকে, এবার তাকালেন নিজের ভেতরের পৃথিবীর দিকে। কলকাতার রাস্তায় নিঃসঙ্গ ভ্রমণ শেষে এই নগরকে নিয়েই স্বগতোক্তি করলেন এই কবিতায়। কাটাকুটি করে চূড়ান্ত করবার পর নাম দিলেন 'নীলিমা'

রৌদ্র ঝিলমিল;
উষার আকাশ, মধ্য নিশীথের নীল,
অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা তুমি দাও বারে-বারে
নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে!
—উদ্বেলিছে হেথা গাঢ় ধূম্রের কুণ্ডলী,
উগ্র চুল্লিবহ্নি হেথা অনিবার উঠিতেছে জ্বলি,
আরক্ত কঙ্করগুলি মরুভূর তপ্তশ্বাস মাখা,
মরীচিকা-ঢাকা!
অগণন যাত্রিকের প্রাণ
খুঁজে মরে অনিবার, পায় নাকো পথের সন্ধান;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল,—
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও-মায়াদণ্ডে ভেঙ্গেছে মায়াবী।
জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি।
কোন দূর যাদুপুর রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী!
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নিলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন ময়ূরের ডানা!
চোখে মোর মুছে যায় ব্যাধবিদ্ধ ধরণীর রক্তের-লিপিকা
জ্বলে ওঠে আকাশে গৌরী দীপশিখা;
ঊসুধার অশ্রু-পাংশু আতপ্ত সৈকত,
ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল, নিষ্করুণ এই রাজপথ,
লক্ষ কোটি মুমূর্ষের এই কারাগার,
এই ধুলি-ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার
ডুবে যায় নীলিমায়—স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে,
শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জ, শুক্লাকাশে, নক্ষত্রের রাতে;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক,
তোমার চকিত স্পর্শে, হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক!

কলকাতা নগরকে তাঁর তখন মনে হচ্ছে একটা কারাগারের মতো। শহরজুড়ে গাঢ় ধোঁয়া। তখন কলকাতা শহরের সব বাড়িতে কয়লার চুলা, ধোঁয়া তাই এই শহরের এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। শহরের কংক্রিটগুলো মরুভূমির বালুর মতো তপ্ত, পথে পথে যে মানুষেরা ছুটছে, তাদের যে কোথায় গন্তব্য, তার যেন নিশানা নেই, এরা যেন মুমূর্ষু। মৃতপ্রায় ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার নগর নামের এই

BanglaBook.org

কারাগারে এক একাকী মানুষ তাকিয়ে আছে আকাশের নীলিমায়, সেখানে ভেসে বেড়ানো মেঘপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে সে হারিয়ে যাচ্ছে দূর কল্পলোকে, কবিতায় এ কথাই জানালেন তিনি।

ভাষায়, মেজাজে এই কবিতাটা তাঁর আগের দুটা কবিতা থেকে অনেকটাই আলাদা। কবিতাটা এবার তিনি *ব্রহ্মবাদী* বা *বঙ্গবাণী*-জাতীয় পুরোনো ধাঁচের কোনো পত্রিকায় না পাঠিয়ে পাঠালেন *কল্লোল* নামের নতুন এক পত্রিকায়। সম্প্রতি পত্রিকাটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর। দেখেছেন এ পত্রিকার নামের ভেতর যেমন একটা নতুনত্ব, এখানে প্রকাশিত কবিতার বিষয়, ধরনও নতুন। বাংলা কবিতার গুরু তখন রবীন্দ্রনাথ, নোবেল পুরস্কার পেয়ে 'বিশ্বকবি' খেতাব পেয়েছেন। জীবনানন্দ লক্ষ করেছেন, *কল্লোল* পত্রিকার লেখকেরা রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে নতুন ধারার কবিতা লেখার চেষ্টা করছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এমনি আরও নতুন সব কবি সে পত্রিকায় লিখছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত *কল্লোল* পত্রিকাতেই কাজ করতেন তখন। ডাকে জীবনানন্দের কবিতাটা তাঁর হাতে গিয়ে পড়ল। কবিতাটা পড়ে চমকে উঠলেন অচিন্ত্য। মনে হলো তাঁর চেনা কলকাতা যেন নতুন করে ধরা দিয়েছে এই কবিতায়। এক নিশ্বাসে কবিতাটা পড়ে ফেললেন তিনি। খামের ওপর ঠিকানা দেখে অচিন্ত্য ছুটে গেলেন জীবনানন্দের সঙ্গে দেখা করতে। অচিন্ত্যকুমার পরে স্মৃতিচারণায় লিখেছেন: 'হঠাৎ *কল্লোলে* একটা কবিতা এসে পড়ল—"নীলিমা"। ঠিক এক টুকরো নীল আকাশের সারল্যের মত। মন অপরিমিত খুশি হয়ে উঠলো। লেখক অচেনা কিন্তু ঠিকানাটা কাছেই, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিট। বলা-কওয়া নেই, সটান একদিন গিয়ে দরজায় হানা দিলাম।'

অচিন্ত্য বললেন, 'জীবনানন্দ বাবু, আপনার নামটা শুধু মনে মনে সম্ভাষণ করে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে সশরীরে তাই আবির্ভূত হলাম।'

কলকাতার সাহিত্য মহলে কারও সঙ্গে জীবনানন্দের কোনো পরিচয় নেই তখন। কবি হিসেবে তাঁর তেমন কোনো পরিচিতিও নেই। অচিন্ত্য বয়সে জীবনানন্দের ছোট, তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কিন্তু সাহিত্য মহলে ইতিমধ্যেই বেশ আলোচিত লেখক। তাঁর কবিতা জীবনানন্দ পড়েছেন। অচিন্ত্য এভাবে তাঁর বাড়িতে চলে এসেছেন দেখে জীবনানন্দ বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। ভীরু হাসি হেসে জীবনানন্দ তাঁর হাত ধরলেন। বললেন, 'আসুন আসুন, ভেতরে বসুন।' অচিন্ত্যকে জানালেন *কল্লোল* তিনি নিয়মিত পড়েন। প্রেসিডেন্সি মেসে বসে সেদিন অনেকক্ষণ কথা বললেন দুজন। যাবার আগে অচিন্ত্য বললেন, 'চলে আসবেন *কল্লোল* অফিসে, আড্ডা হবে।' জীবনানন্দের কবিতাটা *কল্লোল*-এ পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হলো সে বছর। সেটা ১৯২৬ সাল। তাঁর নাম অবশ্য ভুল

BanglaBook.org

ছাপা হলো। লেখা হলো শ্রী 'জীবনান্দ দাশ'। নাম থেকে একটা 'ন' বাদ পড়ল। এই ভুলটা পরবর্তীকালে ইচ্ছাকৃতভাবেও অনেকে করবেন।

কল্লোল-এ এই কবিতাটা প্রকাশিত হওয়াটাকে জীবনানন্দের জীবনের একটা মোড় ফেরানো ঘটনা বলা যেতে পারে। কবিতা না গদ্য লিখবেন, কী নিয়ে লিখবেন, এসব নিয়ে একটা দ্বিধা ছিল তাঁর। কিন্তু *কল্লোল*-এর মতো একটা আলোচিত পত্রিকায় কবিতাটা প্রকাশিত হওয়ায়, অচিন্ত্যের এমন অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ায় জীবনানন্দের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। দেখা গেল, এরপর একটার পর একটা কবিতা লিখতে শুরু করেছেন তিনি। তিনি তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে কবিতা লিখবেন, অক্ষর দিয়ে তৈরি করবেন একটা দ্বিতীয় জীবন। কবিতার সিন্দবাদ তখন তাঁর ঘাড়ে ভালোমতো জেঁকে বসেছে। জীবনানন্দের প্রথম কবিতা থেকে দ্বিতীয় কবিতার দূরত্ব পাঁচ বছর হলেও 'নীলিমা' প্রকাশের পর তাঁর কবিতা লেখার একটা জোয়ার এল যেন। একের পর এক কবিতা লিখতে লাগলেন। সব দ্বিধা কাটিয়ে সাহিত্যের হাঙরভরা সমুদ্রে সত্যি নেমে পড়লেন তিনি। সেখানে তখন জলোচ্ছ্বাস। এই সব কবিতার মেজাজ কুসুমকুমারীর ঠিক চেনা নয় কিন্তু ছেলে অক্ষরের নেশায় পড়েছে তা দেখেই আনন্দিত তিনি।

নতুন এক একটা কবিতা লিখে দিনেশ দাশ সম্পাদিত *কল্লোল* ছাড়াও জীবনানন্দ পাঠাতে লাগলেন শৈলজানন্দ সম্পাদিত *কালি কলম* এবং ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *প্রগতি* নামে নতুন ধারার আরও দুই আলোচিত পত্রিকায়। সেসব পত্রিকায় ক্রমাগত ছাপা হতে লাগল তাঁর কবিতা। কবিতায় যে অদৃশ্য ছায়ারা নাচে ঘুমে জাগরণে, সে নাচ তিনি দেখতে শুরু করেছেন তখন। শুরু হয়ে গেছে তাঁর সাহিত্যের অজানা যাত্রা। তাঁর জানা নেই এই যাত্রার বাঁকে বাঁকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে কোন রোমহর্ষ।

BanglaBook.org

তিন

এসব পত্রিকায় যে নতুন কবিরা কবিতা লিখছেন তাঁরা তখন চাইছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার দ্বীপ থেকে নোঙর তুলে নতুন দ্বীপে চলে যেতে। রবীন্দ্রকাব্যের আধ্যাত্মিক আবহ থেকে কবিতাকে মাটিতে নামিয়ে আনতে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যা উপেক্ষিত সেই বিষাদ, ক্লান্তি, সংগ্রাম, ক্ষুধা, যৌনতাকে কবিতায় তুলে আনতে। পরোক্ষে, প্রত্যক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বিরোধিতা করেই এই নতুন কবিদের কাব্যযাত্রার শুরু।

জীবনানন্দ এসব নতুন পত্রিকায় কবিতা ছাপালেও ঠিক পুরোপুরি এদের দলে ভিড়লেন না। অচিন্ত্যকুমার ছাড়া আর কারও সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয়ও তখন হয়নি। কবিতা তিনি ডাকেই পাঠিয়ে দেন বিভিন্ন পত্রিকায়। নতুন কবিদের

সোচ্চার রবীন্দ্র-বিরোধিতায়ও তিনি শামিল হলেন না তখন। কবিতার নতুন দ্বীপ তৈরি করতে হবে, সেটা তিনি মানেন কিন্তু এ-ও টের পান যে রবীন্দ্রনাথের দ্বীপের সীমানা অনেক বিস্তৃত, তাকে অতিক্রম করা খুব সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের শক্তি এবং সীমাবদ্ধতাকে ভালোভাবে বুঝে নিতে চান তিনি। নতুন যুগের কবিরা একসময় 'কল্লোলের কবি' বলে পরিচিতি পাবেন, সেই কবিদের মিছিলে পেছনের সারিতে যোগ দিলেন জীবনানন্দ। অবশ্য যোগ দিয়েও থাকলেন অনেকটা যূথভ্রষ্ট। তখন কারও জানবার কথা নয় যে একদিন রবীন্দ্র-উত্তর এসব কবিকে ছাড়িয়ে মিছিলের সবার আগে দেখা যাবে তাঁরই মুখ। তিনি তৈরি করবেন একেবারে স্বতন্ত্র নতুন এক দ্বীপ, যে দ্বীপে পাঠক পা রেখেই বুঝবে এলাম নতুন দেশে। সেই কবিরা সবাই মিলে যে নতুন ভাষাটা খুঁজছিলেন, জীবনানন্দই পেয়ে যাবেন সেই ভাষার চাবি। তবে সেই দ্বীপ জেগে উঠতে তখনো অনেক দেরি। পলি মাটি পড়ছে কেবল। জীবনানন্দ ধীরে উচ্চবাচ্যহীনভাবে শুরু করলেন কবিতার বাঁক ফেরানোর যাত্রা। যাত্রা শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু জানিয়েই। তাঁকে বিনম্র প্রণতি জানিয়ে জীবনানন্দ তাঁর নিজের পথ ধরলেন। জীবনানন্দ একসময় এসে লিখলেন, "সকল দেশের সাহিত্যেই দেখা যায় একজন শ্রেষ্ঠতম কবির কাব্যে তার যুগ এমন মানবীয় পূর্ণতায় প্রতিফলিত হয় যে, সেই যুগের, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পথে যে সব কবি নিজেদের ব্যক্ত করতে চান, ভাবে বা ভাষায়, কবিতার ইঙ্গিতে বা নিহিত অর্থে, সেই মহাকবিকে এড়িয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এড়িয়ে যাওয়াটাই আসল কথা নয়; অর্থহীন অসন্তোষে বা দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে আমি আমার পূর্ববর্তী কবিকে এড়িয়ে গেলাম অকাব্যের জঞ্জালের ভিতর—সাহিত্যের ইতিহাসে এ রকম আন্দোলনের কোন স্থান নেই।

রবীন্দ্রকাব্যে রয়েছে একটি বিস্তৃত যুগের প্রাণপরিসর এবং অনেক এমন কিছু যা সময়াতীত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই সময়োত্তর কবিতাগুলোকে এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন কারণে তার গতিশুদ্ধ প্রখর মনের প্রবন্ধগুলোকে যদি বাদ দিই তাহলে দেখতে পাই যে প্রকৃত কাব্যালোকে সমাজ ও ইতিহাস সচেতন একটা নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে...'

রবীন্দ্রনাথের অপার প্রতিভাময় কবিতার ভেতরও একপর্যায়ে সমাজ ও ইতিহাস-চেতনা একটা নির্ধারিত সীমায় এসে মন্থর হয়ে গেছে, সেটা লক্ষ করলেন জীবনানন্দ। নিজের কবিতায় সেই ফাঁক ভরাট করবেন তিনি ঠিক করলেন। নজর দেবেন ওই দিকেই, সমাজ আর ইতিহাস চেতনায়।

BanglaBook.org

পথ খোঁজা একাকী নেকড়ের মতো

এক

সে সময় নতুন যে কবিতাগুলো লিখতে শুরু করলেন জীবনানন্দ, সেগুলো রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের বাইরে হলেও দেখা গেল তাতে কখনো খোলামেলা, কখনো চোরাগোপ্তা রয়ে যাচ্ছে তখনকার নতুন ধারার নামজাদা অন্য কবিদের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের বাইরে নতুন ধারার কবিদের ভেতর সবচেয়ে জোরালো কণ্ঠস্বর তখন কাজী নজরুল ইসলামের। জীবনানন্দ এবং নজরুল দুজন একই বছরে, শতাব্দীর সেই ক্রান্তিকাল, ১৮৯৯ সালে জন্মেছেন। জীবনানন্দ যখন বেড়ে উঠছেন এই পূর্ব বাংলায়, সেই একই সময় পশ্চিম বাংলায় বেড়ে উঠছেন কাজী নজরুল। একই সঙ্গে বেড়ে উঠলেও বিশ শতকের বিস্ময় আর বিপদের মুখোমুখি হয়ে তাঁদের দুজনের প্রতিক্রিয়া হলো বিপরীত। নজরুল হয়ে উঠলেন উদ্দাম, বিদ্রোহী, উচ্চকণ্ঠ আর জীবনানন্দ হয়ে গেলেন নির্জন, নিভৃত, নিম্নকণ্ঠ। নজরুল যখন দ্রোহের কবিতা লিখে, প্রেমের গান গেয়ে, মঞ্চে বক্তৃতা দিয়ে দেশ কাঁপাচ্ছেন, জীবনানন্দ তখন একাকী, স্নায়ুতাড়িত হয়ে শুধুই অক্ষরের পর অক্ষর সাজাচ্ছেন। একই বয়সী হলেও নজরুল তখন বড় মাপের তারকা কবি আর গুটিকয় মানুষ ছাড়া জীবনানন্দ দাশকে তখন চেনেনই না তেমন কেউ। আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহার করে কবিতায় এক নতুন আমেজ নিয়ে এসেছেন তখন নজরুল। কবিতা লিখতে এসে নজরুলের ওই প্রতাপ জীবনানন্দকেও দখল করল প্রথম দিকে। তাঁর সে সময়ের কোনো কোনো কবিতাকে নজরুলের কবিতা বলেও ভুল হয়ে যেতে পারে অনায়াসে। যেমন :

একাকী রয়েছি বসি,
নিরালা গগনে কখন নিভেছে শশী
পাইনি যে তাহা টের!
দূর দিগন্তে চলে গেছে কোথা খুশরোজী মুসাফের!
কোন সুদূরের তুরানী প্রিয়ার তরে
বুকের ডাকাত আজিও আমার জিঞ্জিরে কেঁদে মরে!
দীর্ঘ দিবস বয়ে গেছে যারা হাসি-অশ্রুর বোঝা
চাঁদের আলোকে ভেঙেছে তাদের 'রোজা',
আমার গগনে ঈদরাত কভু দেয়নি যে হায় দেখা.
পরানে কখনো জাগেনি 'রোজা'র ঠেকা

ঈদ, রোজা, মুসাফের ইত্যাদি শব্দের আলোড়নে নজরুলেরই দুর্বল প্রতিধ্বনি করছেন তিনি তখন। নজরুল জীবনানন্দকে তাঁর প্রথম জীবনে দখল করে

BanglaBook.org

রাখলেও কবিতা লেখায় কিছুদূর এগিয়েই অবশ্য তাঁর পথ হয়ে গেছে সম্পূর্ণ অচেনা, পৌঁছেছে একেবারে নতুন এক মহাদেশে, নজরুলের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। জীবনানন্দ তত দিনে নজরুলের শক্তি আর সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছেন। নজরুলকে নিয়ে তাঁর মোহভঙ্গের কথা জীবনানন্দ লিখেছেন পরবর্তীকালে। নজরুল তখন বাকশক্তিহীন। লোকে বলে পাগল হয়ে গেছেন নজরুল। পিকস ডিজিস হয়েছিল নজরুলের, যার সঙ্গে আছে নিউরোসিফিলিসের সম্পর্ক। জীবনানন্দ লিখেছেন, 'নজরুল ইসলাম অনেকদিন থেকে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। এর দৈহিক ওজর আমাদের জানা আছে, আত্মিক, ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে...মনের উৎসাহে তিনি লিখতে প্রলুব্ধও হয়েছিলেন, নিভে যাবার আগে বাংলার সময়পর্যায়ে তখন বিশেষভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিলো বলে। এরকম পরিবেশে হয়তো শ্রেষ্ঠ কবিতা জন্মায় না কিম্বা জন্মায়। কিন্তু মনন প্রতিভা ও অনুশীলন সুস্থিরতার প্রয়োজন। নজরুলের তা ছিলো না। তাই তার কবিতা চমৎকার কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়...কাজীর কবিতা বিশেষ একটা মাত্রার দেশে তার অতীতের ভিতর পরিসমাপ্ত। এ কবিতা পড়ে—আবৃত্তি করে সময় কেটে গেলে আধুনিক হৃদয় মনের অন্তর্লে স্পর্শিতার ক্ষোভ তৃপ্ত হতে চায় না, মন বিষয়ান্তর খোঁজে দিকনির্ণয়ী মহৎ কবিদের...বাংলার এ মাটির থেকে জেগে, এ মৃত্তিকাকে সত্যিই ভালোবেসে আমাদের দেশে উনিশ শতকের ইতিহাসপ্রান্তিক শেষ নিঃসংশয়তাবাদী কবি নজরুল ইসলাম। তার জনপ্রেম, দেশপ্রেম, পূর্বোক্ত শতাব্দীর বৃহৎ ধারার সঙ্গে সত্যিই একাত্ম। পরবর্তী কবিরা এ সৌভাগ্য থেকে অনেকটা বঞ্চিত বলে আজ পর্যন্ত নজরুলকেই সত্যিকার দেশ ও দেশীয়দের বন্ধু কবি বলে জনসাধারণ চিনে নেবে। জন ও জনতার বন্ধু ও দেশপ্রেমিক কবি নজরুল। এ জিনিসের বিশেষ তাৎপর্যের দিকে লক্ষ রেখে বলতে পারা যায় যে, যে সময়ে ও যেখানে জনমানসে তার প্রার্থিত জিনিস পেয়েছে বলে মনে করে সেখানে বাস্তবিকই তা অদ্বিতীয়।'

জীবনানন্দ জীবনের অধিকাংশ সময় বরিশালে, এই পূর্ব বাংলায় কাটিয়ে মৃত্যুর আগে গেলেন পশ্চিম বাংলায়, অন্যদিকে কাজী নজরুল প্রায় সারা জীবন পশ্চিম বাংলায় কাটালেও শেষ বয়সে তাঁকে আনা হলো এই বাংলায়, এখানেই মৃত্যু হলো তাঁর। নজরুল হলেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি। এসব পাশবদল রাজনীতির বিবেচনা। তাতে অবশ্য দুজনের ওপর অধিকার কোনো বাংলারই বাড়ে বা কমে কি? নজরুল, জীবনানন্দ সমবয়সী, একই সঙ্গে কবিতা লিখে চলেছেন তাঁরা, দুজনের ভেতর দেখা হয়েছিল কি কখনো? কথা হয়েছিল? জীবনানন্দ *কালি কলম* পত্রিকা অফিসে দূর থেকে একবার দেখেছেন নজরুলকে কিন্তু কথা বলেননি। নজরুলের কাব্যের প্রভাব মেনে নিলেও নজরুলের মতো

BanglaBook.org

অমন বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের মানুষের কাছে ঘেঁষতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি অন্তর্মুখী জীবনানন্দ। তিনি দূর থেকেই দেখেছেন নজরুলকে। কিন্তু নজরুল কি খেয়াল করেছেন জীবনানন্দকে? তিনি কি তাঁর কবিতা পড়েছেন? কবি আবুল হোসেন একবার নজরুলকে কথায় কথায় বলেছিলেন, 'জীবনানন্দ দাশ তো বলেন উপমাই কবিতা। আপনার কী মত?' নজরুল হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোমাদের এখন আর 'মা'তে হচ্ছে না, 'উপ'মা দরকার?'

জীবনানন্দকে নজরুল খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন বলে মনে হয় না।

দুই

নজরুল ছাড়াও জীবনানন্দকে সেই সব দিনে দখল করে রেখেছিলেন আরও এক নামজাদা কবি, ছন্দের জাদুকর বলে খ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। জীবনানন্দের এসব কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের ছায়াও স্পষ্ট :

দুপুর রাতে ও কার আওয়াজ!
গান কে গাহে—গান না।
কপোত-বধূ ঘুমিয়ে আছে
নিঝুম ঝিঁঝির বুকের কাছে
অস্তচাঁদের আলো তলে
এ কার তবে কান্না!
গান কে গাহে—গান না।

BanglaBook.org

তবে যেমন নজরুলের সীমাবদ্ধতা, তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের দুর্বলতাও জীবনানন্দ টের পেয়ে গেছেন অচিরে। একপর্যায়ে এসে সত্যেন্দ্রনাথের ওপরও লিখেছেন প্রবন্ধ, 'সত্যেন্দ্রনাথ তার কবিতায় আঙ্গিকের অনুশীলনের জন্যই বিখ্যাত। তিনি (মহৎ কবির নয়, সুকবির) শব্দ ও ছন্দকে ভালোবেসে গেছেন। তার কবিতায় মননধর্মের অভাব অত্যন্ত শোকাবহকভাবে আমাদের আঘাত করে।'

কবিতায় মননধর্ম, এই খুঁজছেন তখন জীবনানন্দ।

তিন

তাঁর সে সময়ের কবিতায় জীবনানন্দের নিজের কণ্ঠস্বরটা ঠিক ফুটে ওঠেনি। চেনাজানা কবিদের ছায়ায় কবিতা লিখছেন তখন। তারপরও *কল্লোল*-এর সেসব কবিতায় মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে অদ্ভুত স্বতন্ত্র সব ইমেজ, আবহ :

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল—
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার—রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল

চুল তার শাওনের মেঘ—আর আঁখি গোধূলীর মত গোলাপী রঙ্গীন
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুম পথে-স্বপ্নে-কতদিন!
মোর জানালার পাশে তারে দেখিয়াছি রাতের দুপুরে—
তখন শকুন বধূ যেতেছিলো শ্মশানের পানে উড়ে উড়ে!

কবিতার এ এক নতুন মেজাজ, কেমন রহস্যময়, ঘুম ঘুম জগৎ আর বিচিত্র রূপকল্প। একদিকে ডালিম ফুলের মতো গালের কথা বলছেন আবার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন শ্মশানের দিকে উড়ে যাচ্ছে শকুন, শকুনও ঠিক নয় শকুনের বঁধু। শকুনের স্ত্রীর কথা বাংলা কবিতায় এর আগে কেউ বলেনি। এই কবিতারই পরের অংশে দেখা যাচ্ছে ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, তার পরিণতি খুব করুণ

অশ্রুর অঙ্গারে তার নিটোল ননীর গাল-নরম লালিমা
জ্বলে গেছে-নগ্ন হাত—নাই শাঁখা—হারায়েছে রুলি'
এলোমেলো কালো চুলে খসে গেছে খোঁপা তার—বেণী গেছে খুলি!
সাপিনীর মতো বাঁকা আঙ্গুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ
ভেঙ্গেছে নাকের ডাঁশা-হিম স্তন-হিম রোমকূপ।...

একটু আগেই যার গাল ছিল ডালিম ফুলের মতো লাল, সে কবিতার শেষে একেবারে ভুতুড়ে কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গ, জন্ম আর মৃত্যুর ভেতর পায়চারি করছেন তিনি। বোঝা যাচ্ছে এই কবির পৃথিবীকে দেখার, জীবনকে দেখার চোখটা একেবারেই অন্য রকম, ভঙ্গিটা অন্য রকম, সেই দেখাকে শব্দে ধরার কায়দাটা অভিনব।

BanglaBook.org

চার

বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা ছাপালেও কলকাতার কোনো লেখকের সঙ্গে তখন জীবনানন্দের তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। অচিন্ত্যর সঙ্গে মাঝে মাঝে বসে চা-কফি খান, গড়ের মাঠে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করেন। এ ছাড়া মাঝে মাঝে তাঁর বোর্ডিংয়ে আসেন তখনকার আরেক আলোচিত কবি মোহিতলাল মজুমদার। জীবনানন্দের কবিতায় মোহিতলালের কবিতার ছায়া দেখা গেছে কখনো কখনো। তবে কারও সঙ্গে ঠিক ঘনিষ্ঠতা হয়নি তাঁর। অচিন্ত্যর অনুরোধে *কল্লোল* অফিসে গিয়েছেন বার কয়েক কিন্তু বসেননি বেশিক্ষণ। এর মধ্যে একদিন ঢাকা থেকে এলেন তরুণ কবি বুদ্ধদেব বসু। অচিন্ত্যকে বললেন, 'নীলিমার' কবির সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। অচিন্ত্য বুদ্ধদেবকে নিয়ে গেলেন জীবনানন্দের ডেরা প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে। বুদ্ধদেব উচ্ছ্বসিত হয়ে জীবনানন্দকে বললেন, 'আমরা নতুন কবিরা যে ধরনের কবিতা লিখতে চাইছি, আমার ধারণা আপনার হাত দিয়েই তার সফল প্রকাশ ঘটবে।' জীবনানন্দ খুশি হলেন এই তরুণের উচ্ছ্বাসে, ধন্যবাদ দিলেন, মৃদু হেসে

সম্মতি জানালেন। বুদ্ধদেব বললেন, 'চলুন ইন্দোবার্মা রেস্টুরেন্টে যাই।' *কল্লোল* অফিসের কাছের এই রেস্টুরেন্টে তখন কবি-সাহিত্যিকদের আড্ডা। জীবনানন্দ গেলেন না। দল বেঁধে আড্ডা দেওয়াতে কখনোই স্বচ্ছন্দ ছিলেন না তিনি। জীবনানন্দ অবশ্য তখনো জানেন না যে অচিরেই বুদ্ধদেব নামের এই অচেনা তরুণ জরুরি হয়ে উঠবেন তাঁর জীবনে।

এদিকে *কল্লোল*-এর তরুণ কবিরা মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে বা জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের সাথেও দেখা করতে যান। রবীন্দ্রবিরোধিতা করলেও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যও ছিল তাঁদের কাম্য। এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও জীবনানন্দ কখনো রবীন্দ্রনাথের কাছে যাননি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অতিভক্তি কিংবা রবীন্দ্রনাথবিরোধী কোনো দলেই ছিলেন না তিনি। এসব দলাদলি এড়িয়ে জীবনানন্দ তখন কলকাতায় হেঁটে বেড়ান একাকী নেকড়ের মতো। নেকড়ে, কারণ ইতিমধ্যে তাঁর মনে কবিতার জন্য হিংস্র একটা ক্ষুধার জন্ম হয়েছে।

শিখা জ্বলে ওঠে, কাঁপে, নিভে যেতে চায়

BanglaBook.org

এক

এই সময় জীবনানন্দের মনে হলো পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা কবিতাগুলো নিয়ে একটা বই করা যাক। কবিতার ছায়া পৃথিবী, এর আশ্চর্য মায়া, ঘোর ইতিমধ্যে পেয়ে বসেছে তাঁকে। এ পথে আরও অগ্রসর হওয়ার আগে এযাবৎ লেখা সব কবিতাকে একত্র করে দেখতে চান, কী দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু কে তাঁর বই প্রকাশ করবে? কোন প্রকাশক লগ্নি করবেন তাঁর বইয়ে? জীবনানন্দ নেহাতই অখ্যাত লেখক এক। কিন্তু পিছপা হলেন না জীবনানন্দ। নিজের খরচেই বই প্রকাশ করবেন ঠিক করলেন। টাকাপয়সা জোগাড় হলে জীবনানন্দ অতঃপর কলকাতা থেকে প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম কবিতার বই, ১৯২৭ সালে। নাম দিলেন *ঝরা পালক*। তাঁর এক কবিতাতেই আছে এই শব্দবন্ধ :

আমি কবি,—সেই কবি—
আকাশের পানে আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি!

নামটির ভেতর একধরনের পেলব অনুভূতিময়তা, খানিকটা বিষণ্নতাও।

রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা না করলেও জীবনানন্দের মনে হলো বাংলা সাহিত্যের এমন ব্যাপক সৃজনশীল মানুষটা তাঁরই সমসময়ে বেঁচে আছেন, দারুণ হয় যদি অন্তত তাঁর একটা মন্তব্য পাওয়া যায় এই নতুন বইটা সম্পর্কে। শুনেছেন লোকে

চিঠিপত্র লিখলে, বই পাঠালে তিনি উত্তর দেন। *ঝরা পালক* বইটা জীবনানন্দ ডাকে পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, সবিনয়ে অনুরোধ জানালেন মন্তব্যের।

রবীন্দ্রনাথ বইটা পেলেন, পড়লেন এবং চিঠির উত্তর দিলেন। কবি হিসেবে জীবনানন্দের তেমন কোনো পরিচিতি নেই তখন, কিন্তু চিঠির উত্তর দেবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কিংবদন্তিতুল্য নিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে চিঠিটা লিখলেন, সেটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি লিখলেন :

'কল্যাণীয়েষু,

তোমার কবিত্বশক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারি নে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহাসিত করে।

বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উলটো।

ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

BanglaBook.org

চিঠিটা কৌতূহলোদ্দীপক নানা কারণে। প্রমাণ আছে যে কেউ কবিতার বইপত্র পাঠালে, খ্যাত-অখ্যাত সবাইকেই রবীন্দ্রনাথ সে সময় মোটামুটি প্রশংসা করেই দু-চার কথা লিখে পাঠাতেন। কিন্তু জীবনানন্দকে যে চিঠিটা তিনি লিখেছেন, সেটা বেশ রূঢ়ই বলা চলে। জীবনানন্দের কবিত্ব শক্তি আছে, সেটা মেনে নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জীবনানন্দ ভাষা নিয়ে জবরদস্তি করছেন, ওস্তাদি করছেন, তাঁর মুদ্রাদোষ আছে—এসব বলছেন। তাঁর মতো অতি ভদ্রলোক এমনভাবে কড়া ভাষায় আর কাউকে লিখেছেন বলে জানা যায় না। সত্যি বলতে জীবনানন্দের ওস্তাদির তেমন কিছু তো শুরুই হয়নি তাঁর 'ঝরা পালক' কবিতায়।

অনেক আশা করেই বইটা জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর প্রথম বইকে নোবেল বিজয়ী কবি যেভাবে ঘাড় মটকে দিলেন, তাতে কী প্রতিক্রিয়া হলো জীবনানন্দের? জীবনানন্দ মফস্বলে বেড়ে ওঠা নামহীন গোত্রহীন নতুন কবি, পৃথিবী বিখ্যাত এক কবির কাছ থেকে এই ধরনের কড়া মন্তব্যের পর চুপসে যেতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের তিরস্কারকে চুপচাপ হজম করে নিতে পারতেন। কিন্তু না, তা ঘটেনি, বরং ঘুরে দাঁড়িয়েছেন জীবনানন্দ। হতে পারেন তিনি অখ্যাত কবি এবং রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য কিন্তু তাই বলে তাঁর মন্তব্যকে শিরোধার্য ভাববার কোনো কারণ দেখেননি জীবনানন্দ। রবীন্দ্রনাথের তিন লাইনের এই চিঠির এক লম্বা জবাব দিলেন জীবনানন্দ। স্তিমিত ভঙ্গিতে কিন্তু

গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে ধসিয়ে দিলেন তিনি। সেই চিঠির ভেতর আছে জীবনানন্দের এক আশ্চর্য অহংকার, অভিমান।

দুই

বরিশালের আরেক কৃতী সন্তান ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী তাঁর 'বাঙালনামায়' বরিশালের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে লিখেছেন যে বিশেষ ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক কারণে বরিশালের মানুষের ভেতর একধরনের দুঃসাহসী, স্বাধীনচেতা ভাব আছে। বরিশালের ভাষাতেই তপন রায় লিখেছেন তাদের ভাবটা এমন যে, 'ক্যান ঠেকলাম কিসে আমি কারো মাহা (মাথা) তামাক খাই?' রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দের সেই চিঠিতে তেমন একটা ভাব যেন দেখা যায়, যেন বলতে চাচ্ছেন, 'ঠেকলাম কিসে?' চিঠির শুরুতে রবীন্দ্রনাথকে রেওয়াজমতো শ্রদ্ধাভক্তি জানিয়ে শেষে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন তাঁর যুক্তি। জীবনানন্দ লিখেছেন :

'শ্রীচরণেষু,

আপনার স্নেহাশীষ লাভ করে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজকালকার বাংলাদেশের নবীন লেখকদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে তাঁদের মাথার ওপরে স্পষ্ট সূর্যালোকের মত আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকে তাঁরা পেয়েছে। এত বড় দানের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে যতখানি গভীর নিষ্ঠার দরকার দেবতা পূজারীকে কখনও তার থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু দানকে ধারণ করতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন তার অভাব অনুভব করছি। অক্ষম হোলেও শক্তির পূজা করা এবং শক্তির আশীর্বাদ ভিক্ষা করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা। আর আমার জীবনের আকিঞ্চন সেই আরাধ্য শক্তি সেই কল্যাণময় শক্তির উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। আশা করি এর থেকে আমি বঞ্চিত হব না।

পত্রে আপনি যে কথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন মনে আসছে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনো আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে উঠেন—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনো তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা 'সিরিনিটি' জিনিসটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাদের কাব্যের ভেতর এই সুর অনেক জায়গায় ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে, সে কাব্য ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের ডিভাইন কমেডির ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর সিরিনিটি বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এদের রচনার ভেতর আছে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন রকম বেষ্টনীর মধ্যে এসে

BanglaBook.org

মানুষের মনে নানা সময়ে নানা রকম 'মুডস' খেলা করে। সে 'মুড'গুলোর প্রভাবে মানুষ কখনো মৃত্যুকেই বঁধু বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরই মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভেতরই বীণার তার বাঁধবার ভরসা রাখে। যে জিনিস তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে অপরের চোখে হয়তো তা নিতান্তই নগণ্য। তবু তাতেই তার প্রাণে সুরের আগুন লাগে,—সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়। 'মুড'-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে, তাতে 'সিরিনিটি' অনেক সময়েই থাকে না—কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।

সকল বৈচিত্র্যের মতো সুরবৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভেতর। কোন একটা বিশেষ ছন্দ বা সুর অন্য সমস্ত সুর বা ছন্দের চেয়ে বেশি করে স্থায়ী স্থান কি করে দাবি করতে পারে? আকাশের নীল রং, পৃথিবীর সবুজ রং, আলোর শ্বেত রং, কিম্বা অন্ধকারের কালো রং—সমস্ত রংগুলোরই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ আছে। একটাকে অন্যটার চেয়ে বেশি সুন্দর ও সুচির বলা চলে বলে মনে হচ্ছে না। এই অন্ধকার, এই আলো, আকাশের নীল, পৃথিবীর শ্যামলিমা—এসবই তো সুচির-সুন্দর। সৌন্দর্য ও চিরত্বের বিচার তাই একটু অন্য ধরনের বলে মনে হয়। ঘুড়ির কাগজের সবুজ, নীল, শাদা বা কালো রং যখন পৃথিবী, আকাশ, প্রভাত বা রাত্রির বর্ণের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্বের দাবি করে বসে, তখন আর কোন প্রসঙ্গের প্রয়োজন থাকে না। আমার তাই মনে হয়, রচনার ভেতর যদি সত্যিকার সৃষ্টির মর্যাদা থাকে তা হলে তা ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো অবহেলাও করা যেতে পারে। শান্তি বা সিরিনিটি সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাও নিষ্ফল হয়ে যায়। বিঠোফেনের কোন কোন সিম্ফনী বা সোনাটার ভেতর অশান্তি আছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু আজো তা টিকে আছে—চিরকালই থাকবে টিকে, তাতে সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিলো বলে।

আমার যা মনে হয়েছে তাই আপনাকে জানিয়েছি। আপনার অন্তরলোকের আলোপাতে আমার ত্রুটি অক্ষমতা মার্জিত করে নেবেন আশা করি। আপনার কুশল প্রার্থনীয়। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

শ্রীজীবনানন্দ'

সিরিনিটি বা প্রশান্তি না থাকলে ভালো কবিতা হবে না, সে কবিতার স্থায়িত্ব থাকবে না, রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তিকে দান্তে, শেলি, বিঠোফেন দিয়ে একেবারে অকাট্যভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন জীবনানন্দ। 'রচনার ভেতর সত্যিকার সৃষ্টির

BanglaBook.org

প্রেরণা' এটাই দেখবার বিষয়, তার সুরটা প্রশান্তির না অশান্তির, সেটা বড় ব্যাপার নয় বলেই জীবনানন্দ মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয়ী সিদ্ধান্তকে একেবারে দুমড়ে দিয়েছেন জীবনানন্দ। একটামাত্র বই বেরিয়েছে জীবনানন্দের কিন্তু তার গভীর বিশ্বাস যে কবিতাগুলো আর যা-ই হোক এর ভেতর তাঁর একান্ত আন্তরিক সৃষ্টির প্রেরণা আছে, যা নেহাত ওস্তাদির ব্যাপার নয়। এই চিঠি বহন করছে অখ্যাত এক কবির জগৎখ্যাত এক কবিকে চ্যালেঞ্জ করবার সাহসের চিহ্ন। বাস্তবিক ওস্তাদি যদি কিছু করে থাকেন জীবনানন্দ, সেটা যথার্থ করেছেন *ঝরা পালক* বইটার পর। কিন্তু প্রখরদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ কি এই বইটার ভেতরই টের পেয়েছিলেন কবিতার এমন এক গতিমুখ যা তার চেনা ভূগোলের অনেকটা বাইরে? সে জন্যই কি তার এতটা আপত্তি?

তিন

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিস্তারিত কোনো আলোচনা না পেয়ে এবার জীবনানন্দ হাত বাড়ালেন সমসাময়িকদের দিকে। সে সময় বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ সাহিত্য সমালোচক হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বেশ নামডাক। জীবনানন্দ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন *ঝরা পালক*-এর একটা কপি, চাইলেন তাঁর মন্তব্য। বই পেয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ উত্তরে জীবনানন্দকে লিখলেন :

'জীবানন্দ বাবু,

আপনার প্রেরিত পুস্তকখানা যথাসময়ে এসে পৌঁছেছে। বাড়ি বদল করেছি বোলে বড় গোলমালে ছিলাম। ঝরা পালক উড়তে উড়তে আমার গায়ে কি কোরে এল ভেবে পাই না। তবু আমি সেটিকে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করেছি।...

বই খানি আসা মাত্রই পড়ে ফেলেছি। আমার মতগুলি এখনও তৈরি হয়নি—অবশ্য তৈরি হলেই যে তাদের কোন মূল্য থাকবে বলি না।... যাই হোক, সময় পেলেই আপনার পুস্তিকা সম্বন্ধে কিছু মতামত জানাব—certificate হিসেবে নয়, শুধু আপনার পত্রোত্তরের আশায়। আপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতি

বিনীত

ধূর্জটি'

না, ধূর্জটিপ্রসাদ আর সময় পাননি। *ঝরা পালক* নিয়ে ধূর্জটি লেখেননি কোনো দিন। জীবনানন্দের নামটাও ভুল লিখেছিলেন। জীবনানন্দ টের পেলেন ধূর্জটি তাঁর বইটাকে খুব একটা গুরুত্বের সাথে নেননি। নানা ছুতা তুলে লেখার দায়িত্বটা এড়িয়েছেন মাত্র। কিন্তু জীবনানন্দের কাছে তাঁর কবিতা তত দিনে তাঁর

BanglaBook.org

জীবনের মতোই মূল্যবান হয়ে উঠেছে। তাঁর অহংও তীব্র। ধূর্জটিপ্রসাদকেও তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। তাঁকে বেশ হালকা চালেই লিখলেন :

'ধূর্জটি বাবু,

...উড়তে উড়তে 'গায়ে এসে লাগলো' নিশ্চয়ই চোখ বুজে ছিলেন—কিম্বা চোখ বুজে আসছিলো—এহেন সময়ে পালকের আক্রমণ। আমার মনে হচ্ছিল ঝরা পালকের পলকা ফুঁয়ে আপনার ঘুম জমবে ভালো। কিন্তু জানতে পারচি পালকের অত্যাচারে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে। কিন্তু তবু চোখে ঘুমের ঘোর ছিলো—তাই আমাকে জীবানন্দ বাবু বলে সম্ভাষণ করেছেন। আমি কিন্তু জীবনানন্দ বাবু, বুঝলেন?...

ইতি

বিনীত

জীবনানন্দ'

জীবনানন্দ বেশ রেগেছেন বোঝা যায়। না, জীবনানন্দের *ঝরা পালক*কে কবিগুরু তেমন গুরুত্ব দেননি, তরুণ প্রজন্মের সমালোচকও উপেক্ষা করছেন। বইটা নিয়ে প্রবীণ কবি কালিদাস রায়ের কাছ থেকে খানিকটা প্রশংসা পেয়েছিলেন মাত্র। তবে কথা এই যে, *ঝরা পালক* জীবনানন্দের দলছুট কবিতার বই। আসল জীবনানন্দ তখনো ফুটে ওঠেননি, মাঠ চাষ করছেন শুধু।

BanglaBook.org

চার

ঝরা পালক বইটার বিশেষ আকর্ষণ অবশ্য এর রহস্যময় উৎসর্গপত্র। উৎসর্গের পৃষ্ঠায় জীবনানন্দ কারও নাম না নিয়ে শুধু লিখেছেন 'কল্যাণীয়াসুকে'। কে এই কল্যাণীয়াসু? সেই রহস্য ঘুচতে আমাদের বহুদিন অপেক্ষা করতে হলো। রীতিমতো গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে ভূমেন্দ্র গুহ, তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সেই পুনরুদ্ধারকারী, একদিন আবিষ্কার করলেন এই কল্যাণীয়াসু আসলে জীবনানন্দের কাকাতো বোন শোভনা দাশ ওরফে বেবী। এই শোভনার সঙ্গে সারা জীবন জীবনানন্দের চলবে এক আশ্চর্য প্রাণের খেলা। *ঝরা পালক* বইটা জীবনানন্দ শুধু রবীন্দ্রনাথ আর ধূর্জটি প্রসাদকেই নয়, একটা কপি ডাকে পাঠিয়েছিলেন শোভনাকেও। শোভনা তখন আসামে।

পাঁচ

প্রথম বই নিয়ে সব লেখকের একটা উত্তেজনা, উদ্দীপনা থাকে, জীবনানন্দেরও ছিল। কিন্তু চারদিকের নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়ায় তাঁর সেই উদ্দীপনা ক্রমে মিইয়ে

এল। *ঝরা পালক* তাঁর মন থেকে ক্রমশ মুছে যেতে লাগল। জীবনানন্দ মনোযোগী হলেন সিটি কলেজের শিক্ষকতায়। ইতিমধ্যে জীবনানন্দের ছোট ভাই অশোকানন্দ বরিশাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছেন। জীবনানন্দ তখন প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং ছেড়ে দিলেন। দুই ভাই মিলে বেঁচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া নিলেন। দুই ভাই মিলে বাজারঘাট করেন, রান্না করেন। দুজন মিলে ছুটিতে যান বরিশাল। কবিতার পৃথিবী থেকে তিনি নির্বাসিত এমনই মনে হচ্ছে তখন তাঁর। অচিন্ত্যকে লেখা এক চিঠিতে জীবনানন্দের সে সময়ের মনের অবস্থাটা বোঝা যায় :

'প্রিয়বরেষু,

...স্পষ্ট হদিস পাচ্ছি আমার এই টিমটিমে কবি জীবনটি দপ করেই নিবে যাবে, যাকগে—আপসোস কিসের? আপনাদের নব নব সৃষ্টির রোশনায়ের ভেতর আলো খুঁজে পাব তো—আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে চলবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব না তো। সেই তো সমস্ত। আমার হাতে যে বাঁশি ভেঙে যাচ্ছে—গেছে, বন্ধুর মুখে তা অনাহত বেজে চলেছে—আমার মেহেরাবে বাতি নিবে গেল, বন্ধুর অনির্বাণ প্রদীপে পথ দেখে চললুম—এর চেয়ে তৃপ্তির জিনিস আর কি থাকতে পারে।

চারিদিকে বে-দরদীর ভীড়। আমরা যে কটি সমধর্মা আছি, একটা নিরেট অচ্ছেদ্য মিলন সূত্র দিয়ে আমাদের গ্রথিত করে রাখতে চাই। আমাদের তেমন পয়সা কড়ি নেই বলে জীবনে creature comforts জিনিসটি হয়তো চিরদিনই আমাদের এড়িয়ে যাবে। কিন্তু একসঙ্গে চলার আনন্দ থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হই—সে পথ যতই পর্নমলিন, আতপক্লিষ্ট বাত্যাহত হোক না কেন... ।

ইতি

আপনার শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত'

BanglaBook.org

কক্ষ থেকে খসে পড়ার শুরু

এক

প্রথম কবিতার বইয়ের ব্যর্থতার আবেশ কাটতে না কাটতেই এ সময় আরেক বড় বিপর্যয় নেমে এল জীবনানন্দের জীবনে। তাঁর সিটি কলেজের চাকরিটা চলে গেল। তাঁকে বরখাস্ত করা হলো। ঘটনাটা এই রকম সিটি কলেজ

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত কলেজ। ব্রাহ্মসমাজ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিল বলে সিটি কলেজের হোস্টেল চত্বরে এ ধরনের কার্যকলাপ ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু ১৯২০ দশকে ভারতে সরস্বতী পূজার জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। সে সময় ব্রিটিশবিরোধী ভারতীয় জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী পূজার একটা জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ঘটনাটা ১৯২৮ সালে। এর আগে সিটি কলেজের হিন্দু ছাত্ররা কলেজ চত্বরের বাইরে সব সময় সরস্বতী পূজা করত। সে বছর ছাত্ররা কলেজ চত্বরের ভেতরে পূজা করতে চাইল কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র তার অনুমতি দিলেন না। কিন্তু নিষেধ অমান্য করে হোস্টেলের ছেলেরা ভোরে তাদের চত্বরেই পূজা শুরু করল। হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট গিয়ে বাধা দিলেন কিন্তু ছাত্ররা সুপারিনটেনডেন্টের নিষেধ উপেক্ষা করেই পূজা চালিয়ে গেল। প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভিসি যদুনাথ সরকারের কাছে বললেন কোনো পদক্ষেপ নেবার জন্য। যদুনাথ সরকার ছাত্রদের এই কর্মকাণ্ডের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন। কিন্তু ছাত্ররা ক্ষমা না চেয়ে বরং উল্টো পত্রিকায় বিবৃতি দিল এই বলে যে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের নিজেদের ধর্ম পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এরপর কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে তাদের জরিমানা করল কিন্তু ছাত্ররা সে জরিমানাও দিল না। এ নিয়ে তখন পত্রপত্রিকায় শুরু হলো বিতর্ক। দেশের গণ্যমান্য লোকেরা সে বিতর্কে যোগ দিলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু জীবনানন্দ এ ঘটনায় নিলেন ছাত্রদের পক্ষ। যার যার ধর্ম পালনের অধিকার থাকা উচিত, এমনই মনে হলো তাঁর। পরিস্থিতি সামাল দিতে এরপর কলেজ আগাম ছুটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো। কলেজ খোলার পর ভর্তির মৌসুম শুরু হলে দেখা গেল, সে বছর আগের বছরের চেয়ে নতুন ছাত্র ভর্তি হয়েছে অর্ধেকের কম। হিন্দু ছাত্ররা ব্যাপক হারে সিটি কলেজকে বর্জন করল। বেসরকারি কলেজ, ছাত্র ভর্তি এতটা কমে যাওয়াতে পুরো কলেজের বাজেটে রীতিমতো ধস নামল। কলেজের পক্ষে সব শিক্ষকের বেতন দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। আর্থিক এই সংকট মোকাবিলা করতে গিয়ে সে বছর কলেজ কর্তৃপক্ষ ১১ জন শিক্ষককে ছাঁটাই করল। ছাঁটাই করা সেই শিক্ষকদের দলে পড়লেন জীবনানন্দও। জীবনানন্দ ছিলেন ওই কলেজের সবচেয়ে জুনিয়র শিক্ষক। উপরন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এ খবর ছিল যে ওই গন্ডগোলের সময় জীবনানন্দ কর্তৃপক্ষের বদলে ছাত্রদের পক্ষ নিয়েছিলেন। ফলে চাকরি ছাঁটাইয়ের তালিকায় যে তাঁর নাম থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক।

BanglaBook.org

কবিতাকে জীবনের আরাধ্য ভেবে নিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে পেলেন উপেক্ষা, একটা নিয়মিত জীবিকার সংস্থান ছিল, সেটাও হারালেন। এই প্রথম জীবনানন্দ বোধ করতে লাগলেন যে তিনি জীবনের মূল কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়েছেন।

দুই

চাকরি হারিয়ে জীবনানন্দ কলকাতা থেকে ফিরে এলেন বরিশালে। বরিশালে বসে নানা দিকে নতুন চাকরি খুঁজতে লাগলেন। ভেবেছিলেন এমএ ডিগ্রি আছে, ছয় বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা আছে, কাজ একটা কোথাও জুটেই যাবে। বছর পেরিয়ে গেল কিন্তু কোনো চাকরি জোগাড় করতে পারলেন না। এমন অপ্রস্তুত, বেকায়দা অবস্থায় তিনি পড়েননি আগে। একটা সুস্থির জীবিকা, কবিতা লেখার জোয়ার মিলিয়ে জীবনটা যেন বেশ একটু গুছিয়ে উঠছিল তাঁর। কিন্তু কবিতা বইয়ের ব্যর্থতা, বেকারত্ব সব একসাথে তাঁর জীবনে এভাবে হানা দেওয়াতে, জীবন নিয়ে কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেললেন জীবনানন্দ। আত্মবিশ্বাসের পারদ নিচে নামতে লাগল তাঁর। ১৯২৯ সালের ডায়েরির একটা পাতায় লিখছেন, 'It looks like that: I shall survive to see me impotent and forgotten. My father had lived to see that I was wiser than him, and I have lived to see that he was wiser than me.'

তাঁর তখন মনে হচ্ছে নেহাত এক নিষ্কর্মা হিসেবে সবার কাছে বিস্মৃত হয়ে যাবেন তিনি। তাঁর বাবা ভেবেছিলেন ছেলেকে তিনি তাঁর চেয়েও সফল দেখে যাবেন। কিন্তু জীবনানন্দ টের পাচ্ছেন, বাবার চেয়ে সফল হবার কোনো সম্ভাবনাই তাঁর নেই। বাবা অন্তত পক্ষে একটা সংসার সামলেছেন, পাঁচজনের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা পেয়েছেন কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছে, সে যোগ্যতাও তাঁর নেই। তিনি আরও লিখছেন, 'A man, all things considered should not live in this scheme. But, why does he not die? A man like me thinks he may be misunderstood, and leave his message real unsaid by an early death.

উড়াল দিয়ে সাগর পাড়ি দেবেন ভেবে শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়লেন। জীবন নিয়ে, কবিতা নিয়ে নিজের উদ্দীপনার কথা ভেবে নিজেকেই হাস্যকর লাগতে লাগল তার। অপমানিত লাগতে লাগল। জীবনানন্দ ভাবছেন এমন একটা অপমানের জীবন নিয়ে একজন মানুষের বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। মৃত্যুচিন্তা একটু করে উঁকি দিচ্ছে তখন তাঁর মাথায়। কিন্তু জীবন তখনো তাঁকে টানছে। তিনি ভাবছেন তাঁর বলবার কথা রয়ে গেছে অনেক, মরবার আগে সেগুলো বলে যেতে হবে তাঁকে। নইলে লোকে তাকে ভুল বুঝবে।

BanglaBook.org

নিজেকে আয়নায় ভেঙে ভেঙে

এক

তাঁর ওই ভেঙে পড়া সময়ে নিজের সঙ্গে নিজে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যেন মোকাবিলা শুরু করলেন জীবনানন্দ। নিজেকে প্রশ্নের মুখোমুখি করলেন। লোকে যেন তাকে ভুল না বোঝে বুঝি সে জন্যই মগ্ন চৈতন্যে নিজেকে আয়নায় ভেঙে ভেঙে দেখবার যে গোপন আয়োজন তিনি তখন করছিলেন, তাকে উপস্থিত করলেন এক অভিনব কবিতায়। তাঁর নিজের আগের কবিতা, তাঁর পূর্বসূরি, সমসাময়িক কারও কবিতার সঙ্গে সেই কবিতার মিল নেই। 'বোধ' নামে সেই কবিতাটা ছাপা হলো বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *প্রগতি* পত্রিকায় :

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়,—পণ্ড মনে হয়;
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়!

BanglaBook.org

সহজ লোকের মত কে চলিতে পারে!
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো! তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর!—কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর?—শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর?—প্রাণের আহ্লাদ
সকল লোকের মতো কে পাবে আবার!
সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর
স্বাদ কই!—ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে,
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে

চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর 'পরে?
স্বপ্ন নয়,—শান্তি নয়,—কোন এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে।

পথে চ'লে পারে—পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে!
তবু সে চোখের চারিপাশে!
তবু সে বুকের চারপাশে!
আমি চলি, সাথে সাথে সেও চলে আসে।
আমি থামি,—
সেও থেমে যায়;

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হয়ে,—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজ ক্ষেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি?—তাহাদের মন
আমার মনের মত না কি?—
তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী।

BanglaBook.org

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?
বাল্‌টিতে টানিনি কি জল?
কাস্তে হাতে কতবার যাইনি কি মাঠে?
মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি;
পুকুরের পানা শ্যালা—আঁশটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে;
—এইসব স্বাদ;
—এসব পেয়েছি আমি;—বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,
নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
একদিন;
এইসব স্বাদ
জানিয়াছি একদিন,—অবাধ—অগাধ;
চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে;—
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা করে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে;
তবুও সাধনা ছিলো একদিন—এই ভালোবাসা;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি; যে নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি;
তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা—।

BanglaBook.org

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোন এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!

এই বোধ—শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ—অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে?—করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালোশিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে
যে সব হৃদয় ফলিয়াছে
—সেই সব।

BanglaBook.org

এক বিচিত্র বোধের কথা শোনালেন জীবনানন্দ। এই বোধ তাঁর মাথার চারপাশে ঘোরে। এই বোধ যেন একটা ভূত, সে যাকে ধরে সে আর সহজ লোকের মতো চলতে পারে না। অথচ তিনি তো সহজ লোকের মতো সবই করেছেন। বালতিতে পানি টানা থেকে শুরু করে মেয়েমানুষকে ভালোবাসা পর্যন্ত। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। এই বোধের মুদ্রাদোষ তাঁকে পেয়ে একেবারে সবার চেয়ে আলাদা করে ছেড়েছে। শিরোনামহীন এক বোধে আক্রান্ত, একাকী অভূতপূর্ব এক মানুষের গল্প শোনালেন জীবনানন্দ এই কবিতায়।

দুই

তাঁর আগের কবিতাগুলোকে অধিকাংশ লেখক, পাঠক উপেক্ষা করেছেন। দায়সারা কিছু মন্তব্য ছাপা হয়েছে তাঁর কবিতা নিয়ে। কিন্তু দেখা গেল 'বোধ' কবিতাটার দিকে নজর পড়েছে অনেকের। এই অদ্ভুত কবিতার কী প্রতিক্রিয়া তাঁরা দেখাবেন, এই নিয়ে যেন বেশ একটা ধন্দে পড়ে গেছেন তাঁরা। কেউ কেউ রীতিমতো বিরক্ত, কেউ শুরু করলেন ব্যঙ্গ। কবিতা লিখে উপেক্ষার বদলে এবার শিকার হলেন বিদ্রূপের। সে সময়ের নামজাদা একজন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনি ঘোষণা করলেন, জীবনানন্দের এই কবিতা আসলে পাগলের প্রলাপ। তিনি লিখলেন, '...আমি বোধ কবিতাটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করেছি। কবিতা আরম্ভ :

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!

'...যা কবিচিত্তে স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়, সেটি কী তা জানবার জন্য মন উন্মুখ হয়েছিল। যে "বোধ" কবির মাথায় ও হৃদয়ে আছে, তা পাঠকের মাথায় ও হৃদয়ে সঞ্চারিত করাই অবশ্য কবির উদ্দেশ্য এবং তাইতেই কবিতাটির সার্থকতা, এই মনে করে আমি অবহিত হয়েছিলাম। বহুবার একা একা পড়ে...কবির এই "বোধ" আমার বোধগম্য হলো না—ইহা লজ্জার কথা হলেও সত্য কথা। সুতরাং আমাদের নিকট এ কবিতা সমগ্রভাবে অর্থহীন বলে নিরর্থক। যদিও এর প্রত্যেক কথা সহজ, সরল অনাড়ম্বর—এর ভাষা কবিতার ভাব বোঝবার পথে অন্তরায়।

'এরকম হবার তিনটি কারণ হতে পারে :

১. কবি কি বলছেন তা নিজেই সম্যক জানেন না। অর্থাৎ তিনি sincere নন।

২. কবি যা বলতে চান তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা তার মোটেই নেই। অর্থাৎ তিনি কবি নন।

৩. পাঠকের বোঝবার মত শক্তি নেই।'

পরে যতীন্দ্রনাথ আরও লিখলেন, Stanzaয় Stanzaয় কবির 'বোধ' বস্তুটি স্পষ্টতর না হয়ে ক্রমেই এমন ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে যে কবিকেই মাঝে মাঝে মনে করে নিতে হয়েছে, 'স্বপ্ন নয়, প্রেম নয়, কোন এক বোধ কাজ করে। এমনি করে ভাব ঘোলাটে হতে হতে "বোধ" যখন একেবারে অবোধ হয়ে উঠলো তখন ভাষা প্রকৃত প্রলাপে পরিণত হয়েছে।' যতীন্দ্রনাথ এভাবেই 'বোধ' কবিতা নিয়ে তাঁর বিরক্তি, অস্বস্তি, রাগের নানা বয়ান করে গেছেন ওই লেখায়।

BanglaBook.org

তিন

এই কবিতাকে একেবারে তুলাধোনা করে ছাড়লেন সজনীকান্ত দাশ। শুধু বিদ্রূপ নয়, রীতিমতো আক্রমণ করলেন তিনি। সজনীকান্ত তখন সম্পাদনা করেন *শনিবারের চিঠি* নামের পত্রিকা। তিনি সাহিত্যে রক্ষণশীলতার পক্ষে। রবীন্দ্রবলয়ের বাইরের কবিদের ব্যঙ্গ করে ইতিমধ্যে বেশ আলোচিত সেই পত্রিকা। কাজী নজরুলকে প্যারোডি করে শুরু হয়েছিল সেই চর্চা। এরপর সজনীকান্ত পেয়ে গেলেন মোক্ষম এক শিকার, জীবনানন্দ দাশ। 'বোধ' কবিতাটা *প্রগতি* পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর সজনীকান্ত জীবনানন্দের ওপর একেবারে হামলে পড়লেন। *শনিবারের চিঠি* পত্রিকায় তিনি লিখলেন, '...জীবনানন্দের স্বরূপ জীবনানন্দ স্বয়ং ভাদ্রের *প্রগতি*তে নির্দেশ করিয়াছেন :

'সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?

'মুদ্রাদোষটি কি রূপ?

'জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হয়ে,—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজ ক্ষেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি?—তাহাদের মন
আমার মনের মত না কি?—
তবু কেন এমন একাকী?
তবু আমি এমন একাকী।

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল?'

মাথার মতন হৃদয়? হৃদয়ের সহিত গোবরের তুলনা এই প্রথম। কবিতা যেমনই হোক মুদ্রাদোষটি কিন্তু ভালো নয়। তারপর—

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,

BanglaBook.org

ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

কবি সব করিয়াই দেখিয়াছেন শুধু বিবাহ করিয়া 'মেয়েমানুষেরে' দেখেন নাই। দেখিলে ভালো হইত। গরিব পাঠকেরা বাঁচিত।

সজনীকান্ত পরে আরও লিখলেন, 'বাংলার জনগণ খবর রাখেন কিনা বলিতে পারি না, সম্প্রতি কিছুকাল হইতে "পূর্ব বঙ্গ সাহিত্য" নামক এক নতুন সুবৃহৎ এবং সম্পূর্ণ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।'

জীবনানন্দের কবিতা দুর্বোধ্য, দোষ শুধু সেটা নয়; তিনি যে পূর্ব বাংলার লোক, পশ্চিম বাংলার অভিজাত লেখকের সেটাও একটা খোঁটা দেওয়ার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সজনীকান্ত আরও লিখলেন, 'এই নব সাহিত্যের হুইটম্যান শ্রী জীবনানন্দ (জীবানন্দ নয়) দাশের কিছু বাণী আমাদের মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। এই সকল বাণীর প্রচার আবশ্যক :

'দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালোশিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে
যে সব হৃদয় ফলিয়াছে
—সেই সব।

BanglaBook.org

কবির হৃদয়ে মাংসে যে কুঁজ ও গলগণ্ড ফলিয়াছে তাহা স্বীকার করা বাণী বৈকি। কবিতাটির নামকরণে বোধ হয় কিছুটা ভুল আছে—"বোধ" না হইয়া কবিতাটির নাম "গোদ" হইবে...।'

চার

কিন্তু 'বোধ' কবিতার ভেতর দিয়ে জীবনানন্দ বস্তুত তখন পেয়ে গেছেন তাঁর একক পৃথিবীর খোঁজ। পেয়েছেন তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর। মূল স্রোতের বাইরে পেয়ে গেছেন তাঁর অজ্ঞাতবাসের ডেরা। এই অজ্ঞাতবাস থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে যেন তিনি নতুন করে চিনতে পারছেন সব। নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর অস্তিত্বের দ্বন্দ্বকে মোকাবিলার একটা পথ যেন পেয়েছেন তিনি। সজনীকান্ত বা যতীন্দ্রনাথের জানাবার সুযোগ নেই যে তাঁদের রুচিতে এই কবিতা না ধরলেও আগামী প্রজন্মের অগণিত তরুণ, তরুণী জীবনানন্দের 'সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়' লাইনটা মাথার ভেতর নিয়ে নির্ঘুম জেগে

থাকবে। তারা টের পাবে একজন মানুষ এই কবিতা পড়ার পর আর আগের মানুষ থাকে না, বদলে যায়।

চরাচরে অচেনা, অভিনব হাওয়া

এক

প্রথম সাহিত্যিক বৈরিতার অভিজ্ঞতা হলো জীবনানন্দের। মনে মনে আহত হলেন। কিন্তু সাহস জোগালেন একজন। তাঁর তরুণ সেই অনুরাগী বুদ্ধদেব বসু। তাঁকে চিঠিতে লিখলেন, যত সমালোচনাই হোক, তাঁর যেকোনো কবিতার জন্য *প্রগতি* পত্রিকার দ্বার খোলা থাকবে সব সময়। জীবনানন্দ তখন তাঁর নিজের বলবার কথাগুলো, নিজের বলবার ভাষা যেন খুঁজে পেয়েছেন। ভেতর থেকে কবিতা লিখবার তাগাদা বোধ করতে লাগলেন। বিশেষ করে, ওই বেকার বিপর্যস্ত অবস্থায় কবিতা লেখাকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা হলো তাঁর। চাকরি খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে অব্যাহত রাখলেন তাঁর নতুন ধারার কবিতা লেখা। সেগুলো এক এক করে ছাপা হতে লাগল *প্রগতি*তে :

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার,—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয়;—
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট ক'রে দেবে তার সাধের সময়!
চারিদিকে এখন সকাল,—
রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল!
মাঠের ঘাসের 'পরে শৈশবের ঘ্রাণ,—
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের পড়েছে আহ্বান!

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল!
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!

BanglaBook.org

শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক'রে,
যেই রোদ একবার এসে শুধু চ'লে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে
আহ্লাদের অবসাদে ভ'রে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া—রোদ—ক্ষুদ—কুঁড়া—কার্তিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি—ধারভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ!
আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝ'রে পড়ে তার,—
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে!
আজো তবু ফুরায়নি বৎসরের নুতন বয়স,
মাঠে মাঠে ঝ'রে পড়ে কাঁচা রোদ,—ভাঁড়ারের রস!...

'ফসলের স্তনের' মতো বিচিত্র উপমা ব্যবহার করলেন তিনি, ব্যবহার করেন 'বিয়োবার' মতো গ্রাম্য শব্দ, তাঁর কবিতায় উঠে এল প্যাঁচা, ইঁদুরের মতো অকাব্যিক সব পাখি, প্রাণী, অগণিত ড্যাশ, কখনো ব্রাকেট দিয়ে তিনি কবিতার ভেতর একটা নাটকীয়তা তৈরি করলেন, তাঁর কবিতায় দেখা গেল সাধু-চলিত ভাষার মিশ্রণ, একই লাইনে 'তাহার' আবার 'ধরে' লিখলেন তিনি। এরপর মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ছন্দ ছেড়ে লিখতে লাগলেন অক্ষরবৃত্তের কবিতা। আর তাঁর নতুন এসব কবিতা আকারেও হতে লাগল প্রচলিত কবিতার চেয়ে অনেক লম্বা। এক-একটা কবিতা দেড় শ, দুই শ লাইনের। তাঁর এসব কবিতার ওপর আক্রমণ বাড়তে লাগল। একসময় তাঁর কবিতা ছাপালেও *কালি কলম* পত্রিকায় ছাপা হলো তাঁর নতুন কবিতার বিরূপ সমালোচনা। 'আর্টের আটচালা : ব্যাধ ও মালাকর' নামে একটা লেখায় এক সমালোচক লিখলেন, 'পাহাড়িয়া কবি শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ দাশের উপদ্রপে বাঁচা দায় হয়ে উঠলো। মাসিক পত্রিকা খুললেই তার পাহাড় প্রমাণ কবিতার পাষাণ স্তূপ অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে দেখতে পাই। সেই কবিতা পাহাড়ে বিচরণ করতে গিয়ে পাঠককে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ফিরতে হয়, ছন্দহীন নীরস কথার চড়াই উৎরাই অতিক্রম করতে পাঠকের দম বন্ধ হয়ে আসে।'

দুই

চারদিকের আক্রমণের মুখে এবার জীবনানন্দের পক্ষে সরাসরি কলম ধরলেন বুদ্ধদেব বসু। বাংলা কবিতার চরাচরে যে এক নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে, সে কথা তাঁর *প্রগতি* পত্রিকায় ১৯২৯-এর এক সংখ্যায় লিখলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। 'বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ' নামের সেই লেখায়, সুরেশ আর অনিল নামের

BanglaBook.org

কাল্পনিক দুই চরিত্রের সংলাপ :

'অনিল : আজকাল একটা কবির লেখা পড়ে আমার আশা হচ্ছে, আর বেশী দেরী নেই, হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ : কে তিনি?

অনিল : জীবনানন্দ দাশ।

সুরেশ : জীবানন্দ দাশ? কখনো নাম শুনিনি তো।

অনিল : জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটি অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। তাঁর নাম না শোনারই কথা। কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তার প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি—"আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে।" ব্রাউনিংয়ের everlasting wash of air-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্তবিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটি মাত্র লাইনে আঁকা হয়েছে—একেই বলে magic line। আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হয়ে উঠেছে, শব্দের মূল্যবোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালী কবিই দিয়েছেন।

সুরেশ : (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) লাইনটি ভালো বটে।

অনিল : এই কবি সেই উভচর ভাষা অবলম্বন করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আজকালকার কবিদের মধ্যে তার ভাষা সবচেয়ে স্বাভাবিক...দ্যাখো, এতদিনে আমাদের এ কথাটা উপলব্ধি করা উচিৎ যে সংস্কৃত আর বাঙলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাঙলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা—তার ব্যাকরণ, তার বিধি বিধান তার spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা—এখন আর সংস্কৃতের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই। সংস্কৃতের ভাষা থেকে বাঙলা যে সব শব্দ আহরণ করেছে, সেগুলোকে 'বিশুদ্ধ' বা chaste বাঙলা বলে স্বীকার করবার সময় হয়েছে। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, বাঙলা কবিতা এখন পর্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত convension গুলো এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের সুন্দরীরা এখনও বাতায়ন পাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলায়িত করে দেয়, মুকুরে মুখ দেখে, চরণ অলক্তক রঞ্জিত করে, শুভ্র ও শীতল শয্যায় শোয়। আমাদের নায়িকাদের এখনো হস্তে লীলাকমলমলকে বালুকুন্দানুবিদ্ধং ইত্যাদি; যদিও ওসব ফ্যাশন দেশ থেকে বহুকাল উঠে গেছে। সংস্কৃতর দুয়ারে এই কাঙালপনা করে আর কতকাল আমার মাতৃভাষাকে ছোট করে রাখবো? আমাদের এই ভুল জীবনানন্দ বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয়, ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাঙলা করে তোলবার চেষ্টা তার মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাহস করে লিখেছেন

এই জল মেয়েদের স্তন
ঠান্ডা—শাদা—বরফের কুচির মতন।

BanglaBook.org

শুনে তোমার, শুধু তোমার কেন? অনেকেরই হাসি পাবে, বলবে—'ঠান্ডা—শাদা! এ আবার কী?' কিন্তু এই শব্দ দুটো গদ্যে লিখতে পারি, মুখে বলতে পারি আর কবিতাতেই লিখতে পারবো না? কেন কবিতায় জানালাকে জানালা বলবো না, বিছানাকে বিছানা? আয়না আর আরশি এড়িয়ে মুকুর এবং দর্পণের উপর হোঁচট খেতে হবে কেন? ঘরের পাশে যে বাতাস আর হাওয়া বয়, তা প্রত্যাখ্যান করে সমীর-পবন-মলয়ের খোঁজে অতদূর যাবো কেন? এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়কে একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্র লিখে আমরা দাঁত ভাঙতে যাই কেন? যত কথা আমাদের মুখের ভাষায় স্থান পেয়েছে—চেয়ার, টেবিল, টুল, ইস্কুল, দালান, কাপড়, পাৎলা, টোকা—এবং আরো অজস্র—কাব্য ও সমাজ থেকে তাদেরকে একঘরে রেখে কেন আমরা আমাদের কবিতাকে এক বিপুল শব্দসম্ভার থেকে বঞ্চিত করবো? মৌখিক ভাষায় ইডিয়মগুলো ব্যবহার করে কবিতাকে স্বাভাবিক সহজ করে তুলবো না কেন? আমরা যখন বাঙালী তখন Sanskritisms যতদূর এড়িয়ে আমাদের খাঁটি বাঙলায় লিখতে পারি, ভাষা তো ততদূর chaste হবার কথা। আমি তো বলি ক্ষণিকার ভাষা, জীবনানন্দের কবিতার ভাষা purest বাঙলা, কারণ তা বাঙলা ছাড়া আর কিছু নয়।...'

BanglaBook.org

অনেক কাকাতুয়া, কমলা রঙের রোদে এক সোনার পিতলমূর্তি

এক

নিয়মিত কবিতা লিখে নিজের মনকে শান্ত রাখছেন ঠিকই কিন্তু ভেতরে ভেতরে তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছেন জীবনানন্দ। বছর ঘুরে আসছে কিন্তু কোথাও কোনো চাকরি জোগাড় করতে পারছেন না। মাঝে শুনলেন বাগেরহাটের পিসি কলেজে মাস কয়েকের জন্য খণ্ডকালীন এক শিক্ষক খুঁজছে তারা। হোক কয়েক মাসের তবু তিনি চলে গেলেন বাগেরহাট। ভালোই কাটল সেখানে কিন্তু মেয়াদ শেষে আবার চলে আসতে হলো বরিশাল। এ রকম একটা সময়ে জীবনানন্দের কাকা অতুলানন্দ তাঁকে ডেকে পাঠালেন আসামে, তিনি সেখানে বন বিভাগের বড় কর্মকর্তা, থাকেন আসামের ডিব্রুগড়ে। অতুলানন্দ চিঠিতে লিখলেন সেখানে কাজ বা ব্যবসার খোঁজখবর করে দেখতে পারেন জীবনানন্দ। বন বিভাগে কাঠের ব্যবসার তো নানা সুযোগ। যেকোনো একটা উপার্জনের উপায় তখন দরকার জীবনানন্দের। কাঠের ব্যবসা হলেও চলে। জীবনানন্দ রওনা দিলেন আসামে। মনে কাজের আশা তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে আরেক তীব্র গোপন আশা।

আসামে গেলে দেখা হবে তাঁর সেই কল্যাণীয়াসুর সঙ্গে, যাঁকে তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বইটা উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর অতুলানন্দ কাকার মেয়ে শোভনা দাশ, যাঁর ডাকনাম বেবী। এর আগে অল্প সময়ের জন্য একবার গিয়েছিলেন তিনি ডিব্রুগড়ে ছুটি কাটাতে। আর সুযোগ পেলেই তাঁর কাকা শোভনাসহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন বরিশালে। এই যাতায়াতের ফাঁকফোকরেই শোভনাকে ঘিরে একটা ঘোর তৈরি হয়েছে জীবনানন্দের।

জীবনানন্দের বরিশালের বাড়িতে তোলা একটা পারিবারিক ছবি আছে, যেটা প্রকাশিত হয়েছে নানা পত্রিকায়। সেই ছবিতে তাঁর বাবা-মা থেকে শুরু করে সব কাকা, কাকিমা, তাঁদের ছেলেমেয়ে, অন্যান্য ভাই-বোনসহ তিন পুরুষের প্রায় সব আত্মীয়স্বজন উপস্থিত। ছবির তৃতীয় সারিতে বাম দিক থেকে তৃতীয়জন শোভনা। তখন সম্ভবত ম্যাট্রিক পাস করেছেন তিনি। একনজরেই ছবির আর সব মেয়ের তুলনায় শোভনার পার্থক্যটা চোখে পড়ে। শোভনা কনভেন্টে পড়া মেয়ে। তাঁর সাজ, বসার স্টাইলে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। সরু চশমা, চুলের মাঝখানে প্রচলিত সিঁথির বদলে সিঁথি করেছেন এক পাশে। সরু ঠোঁট, মিষ্টি মুখ একটু সামনের দিকে ঝুঁকে ক্যামেরার দিকে সপ্রতিভভাবে তাকিয়ে আছেন। আর কোলের ওপর রাখা তাঁর নিটোল হাত। জীবনানন্দ 'নগ্ন নির্জন হাত' নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন, সে হাত কি শোভনারই?

ডিব্রুগড়ে কাটানো সময়ের ডায়েরিতে স্পষ্ট চিহ্ন আছে জীবনানন্দ আর শোভনার ঘনিষ্ঠতার। চিহ্ন আছে শোভনার প্রতি তাঁর তীব্র, তীক্ষ্ণ প্রেমের। এই প্রেম নিদারুণ কাবু করে রাখবে জীবনানন্দকে সারা জীবন। কাঠের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাকা কিন্তু জীবনানন্দ টের পেয়েছেন কাঠ ব্যবসার জন্য জন্ম হয়নি তাঁর। তিনি আসামে কাকার বাড়িতে বিছানায় শুয়ে, বসে, বই পড়ে, কবিতা লিখে আর শোভনার কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটিয়েছেন তখন।

জীবনানন্দের মনজুড়ে তখন নানা অনিশ্চয়তা, ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট, এ রকম এক এলোমেলো সময়ে আসামে শোভনাকে ঘিরে উন্মুখ তাঁর মন, শরীর। শোভনা তখন হাইস্কুলের শেষ বর্ষের ছাত্রী। কনভেন্ট স্কুলের বাস সকালে এসে নিয়ে যায় তাঁকে আর জীবনানন্দ অপেক্ষা করেন কখন তিনি ফিরবেন স্কুল থেকে। স্কুল থেকে ফিরলে ডিব্রুগড় বাংলোর কোনার ঘরে দরজা লাগিয়ে গল্প করতে বসেন শোভনা আর তাঁর মিলুদা জীবনানন্দ।

জীবনানন্দ : আচ্ছা, কাকা-কাকিমা কি জানেন যে আমার উৎসর্গের পাতার 'কল্যাণীয়াসু' আসলে তুমিই।

শোভনা : মা-বাবার তোমার কবিতার খোঁজ রাখতে বয়েই গেছে। আমি তো বইটা ডাকে পেয়ে লুকিয়ে রেখেছি আমার ঘরে, বইয়ের ফাঁকে। অবশ্য পরে

BanglaBook.org

জানাজানি হয়েছে সব। মা-বাবা তেমন আমলে নেননি।

শোভনা গাঢ় চোখে জানতে চেয়েছেন : মিলুদা, তুমি বইটা আমাকে উৎসর্গ করলে কেন বলো তো?

জীবনানন্দ তখন সে সময় লেখা একটা কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন শোভনাকে—

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।
অন্ধকার—নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা,
যেতেছ জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহ—ব্যথিত মনে ঘায়ে
ঝরিতেছে জলের মতন,—
রাতের বাতাস তুমি,—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

BanglaBook.org

এ সময় কাকি এসে দরজায় ধাক্কা দিয়েছেন, 'দরজা লাগিয়ে এত কী গল্প তোদের?'

দুই

একদিন ডিব্রুগড়ের সবাই মিলে নৌবিহারে যাবার পরিকল্পনা হলো, জীবনানন্দ বললেন তিনি যাবেন না। শোভনাও বললেন তাঁরও শরীর ভালো লাগছে না, তিনি যাবেন না। দুজনেরই মতলব ছিল সবাই চলে গেলে দুজনে একান্তে কিছু সময় কাটাবেন। কিন্তু কাকিমা আঁচ করলেন, তিনি জোর করেই শোভনাকে নিয়ে গেলেন নৌবিহারে। কিন্তু কাকিমা জানেন না যে তাঁর চোখ এড়িয়ে ইতিমধ্যে জীবনানন্দ আর শোভনার ভেতর ঘটেছে নানা রসায়ন। তার হদিস আছে জীবনানন্দের ডায়েরিতে। সাংকেতিক ভাষায়, ইংরাজি-বাংলায় মেশানো লেখা সেই ডায়েরিতে আছে শোভনাকে ঘিরে জীবনানন্দের আবেশের খবর। আসামে যে সময়টা ছিলেন সেই ১৯২৯ সালের শেষ এবং ১৯৩০-এর শুরুর সময়ের

ডায়েরিতে লেখা কয়েকটা লাইন, 'A (blind) love does so much injury–।' লিখছেন অন্ধ প্রেম আমাদের কী যে ক্ষতি করে! এই অন্ধ প্রেম তখন তাঁর জেগেছে শোভনাকে ঘিরে। 'Tedious noon days– laying– laying– laying!... Books (not a page of them) And pathetic evening– tragic– deep– and restless nights–।' দুপুরে শুধু শুয়ে থাকছেন, হাতে বই তাঁর, একটা পৃষ্ঠাও উল্টাচ্ছেন না এবং তারপর করুণ বিকেল, গভীর, অস্থির রাত। 'And that particular night (মশারি খাটিয়ে চলে গেল and I remained awake through) and dawn following।' কোনো এক বিশেষ রাতে শোভনা এসে মশারি খাটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর সারা রাত আর ঘুম হয়নি তাঁর, কখন সকাল হয়ে গেছে টের পাননি।

'গোঁফ কামিয়েছ : how odd; hair unfurffled: how very odd!' সেভ করে গোঁফ ফেলে দিলে শোভনা নিশ্চয়ই বলেছিলেন, গোঁফ কামিয়েছ? কী বিচ্ছিরি লাগছে তোমাকে। 'Everyday when placing a glass of water on the table:' এমন এক গ্লাস জল কেউ রেখে যেত মনে পড়ে?

প্রতি রাতে বিছানার পাশে এক গ্লাস জল রেখে দিয়ে শোভনা হয়তো ফোড়ন কেটেছিলেন এভাবে, জল রেখে যাওয়ার কথা তাঁর মনে পড়বে কি না।

বোঝা যায়, এসব টুকটাক অন্তরঙ্গতা, অর্থহীন কথা, সময় কাটানো ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল শোভনা আর জীবনানন্দকে।

তারপর একদিন ডায়েরির এক পৃষ্ঠায় লিখছেন সেই গোপন খবর, 'Love & kiss & everything–but all she refuses on her health ground, hot water bag and all that.'

লিখছেন ভালোবাসা, চুম্বন এবং আরও সবকিছু। সেই দরজা বন্ধ করে কবিতা শোনানোর কোনো এক প্রহরে জীবনানন্দ শোভনাকে চুমু খেয়েছেন তারপর আরও অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন কিন্তু শোভনা প্রত্যাখ্যান করেছেন স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যাপারে। হট ওয়ার ব্যাগ ইত্যাদির কথা লিখছেন। তখন কি শোভনার পিরিয়ড চলছিল? তলপেটে ব্যথা ছিল। এসব না থাকলে ব্যাপারটা তাহলে ঘটত?

BanglaBook.org

তিন

কাকার বাড়িতে শুয়ে-বসে, কবিতা লিখে, কবিতা পড়ে, সে কবিতা শোভনাকে শুনিয়ে, কখনো লুকিয়ে শোভনার শরীরের ছোঁয়া নিয়ে যখন দিন কাটছে জীবনানন্দের, তখন একদিন বরিশাল থেকে জীবনানন্দের বাবা লিখলেন যে দিল্লির রামযশ কলেজে তাঁর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছেন তিনি। ছেলের

জন্য একটা চাকরির খোঁজখবর সত্যানন্দ বরাবর করে আসছিলেন। বরিশালের নামজাদা লোক অশ্বিনীকুমার দত্তের এক আত্মীয় সুকুমার দত্ত দিল্লির রামযশ কলেজে ইংরাজি বিভাগের প্রধান, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই কলেজে একটা চাকরির ব্যবস্থা করলেন তিনি এবং জীবনানন্দকে বললেন আর দেরি না করে দ্রুত সেখানে যোগ দিতে। বিপদে পড়ে ছেলেবেলায় মা জীবনানন্দকে নিয়ে একবার দিল্লি-আগ্রা ঘুরেছেন, এবার আরেক বিপদের সময় আবার তাঁর দিল্লি যাবার পালা। বেকার মানুষ জীবনানন্দ, তাঁর আর পছন্দ-অপছন্দের সুযোগ কী? আসাম থেকে বরিশাল ফিরে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলেন দিল্লি। হোক নিজ বাড়ি থেকে দূরে, তবু একটা নিয়মিত চাকরি তো।

কিন্তু রামযশ কলেজে যোগ দিয়েই চুপসে গেলেন তিনি। এক ফিলাথ্রপিস্টের উদ্যোগে তৈরি দিল্লির আনন্দ পর্বত এলাকায় এই রামযশ কলেজ, যেখানে তখন কোনো শহরই গড়ে ওঠেনি। জীবনানন্দ সেই বিরান এলাকায় গিয়ে উঠলেন। তখন দিল্লিতে প্রচণ্ড শীত, শীতে কাবু হয়ে রইলেন তিনি। লোকজনও কাউকে চেনেন না, সুকুমার বাবুর সঙ্গেও আগে পরিচয় নেই। সব মিলিয়ে বেশ একটা বেকায়দা অবস্থা তখন তাঁর। শুরু থেকেই নানা রকম ঝামেলার ইঙ্গিত পেতে লাগলেন জীবনানন্দ। যোগ দেবার পর থেকেই দেখলেন চাকরি দেবার সুবাদে সুকুমার বাবু নানাভাবে তাঁর ওপর বেশ একটা কর্তৃত্বপরায়ণ ভাব করছেন, ভাবটা এমন যে চাকরি দিয়ে তিনি জীবনানন্দকে উদ্ধার করেছেন। শুরু থেকেই সুকুমার বাবুর সঙ্গে জীবনানন্দের সম্পর্কটা একটা অস্বস্তির আড়কে ঢাকা রইল। একদিন দিল্লির এক শিক্ষককে বলতে শুনলেন, 'বাঙালিগুলো তাদের দেশে ভাত পায় না এখন আমাদের উপরে এসে পড়েছে।' জীবনানন্দ সতর্ক হয়ে গেলেন শিক্ষকদের সাথে মিশবার ব্যাপারে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, ছাত্রদের সঙ্গে তিনি ঠিক মানিয়ে উঠতে পারছিলেন না। কলেজের অন্য শিক্ষকেরা সব স্যুট-টাই পরে আসেন ক্লাস নিতে আর জীবনানন্দ পরেন ধুতি-পাঞ্জাবি। তিনি যথেষ্ট স্মার্ট নন, এমন একটা ইমেজ ছাত্রদের মধ্যে তৈরি হলো। শিক্ষক হিসেবেও খুব চৌকস ছিলেন না জীবনানন্দ। সেই কলেজে স্থানীয় কিছু পান্ডা ছাত্র ছিল, জীবনানন্দ ক্লাসে গেলে ছাত্ররা নানা রকম হইহট্টগোল করত। ছাত্রদের হট্টগোলে কোনো কোনো দিন তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়েও এসেছেন। এত সব অপদস্থতার পরও জীবনানন্দ মুখ বুজে চাকরিটা করে গেছেন। চাকরি তখন তাঁর খুব দরকার।

চার

এমনিতে একাকী মানুষ তিনি, দিল্লিতে গিয়ে আরও একাকী হয়ে পড়লেন জীবনানন্দ। কাটাতে লাগলেন নিরানন্দ দিন। তবে বরাবরের মতোই তাঁর চারপাশ

BanglaBook.org

যখন বৈরী হয়ে ওঠে, কবিতা তখন হয়ে ওঠে তাঁর স্বজন। কবিতা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে। দিল্লির নিঃসঙ্গতায় আবার কবিতা লিখতে শুরু করলেন তিনি। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে তাঁর কবিতা লেখা তাঁর নিজের বাস্তব জীবন নিরপেক্ষ। এ লেখার ডাক আসে ভেতর থেকে। দেখতে পাচ্ছেন দিল্লির ওই একাকী জীবনে তাঁকে তখন ভর করেছে প্রেম, অভিমান। কিছুদিন আগে কাটিয়ে আসা আসামের দিনগুলো তাঁকে তাড়া করছে তখন। তাড়া করছে শোভনার স্মৃতি। শোভনার সঙ্গে কাটানো সময়ের স্মৃতি রোমন্থনে মন ভিজে আছে তখন তাঁর। নিঃসঙ্গ প্রবাসে শোভনাকে ঘিরে কল্পজগৎ রচনা করছেন তিনি। দিল্লি থেকে শোভনাকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছেন জীবনানন্দ। প্রেম নিবেদন করেছেন। অনেকগুলো চিঠির পর শোভনার কাছ থেকে উত্তর পেয়েছেন একটা কি দুটার। কিন্তু শোভনার সেসব চিঠি নিরুত্তাপ, সেখানে জীবনানন্দের প্রেমের প্রতি তাঁর কোনো সাড়া নেই।

শোভনা আসামের দিনগুলোতে আরণ্যক ওই পরিবেশে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে, প্রাকৃতিক আকর্ষণে চোরাগোপ্তা জীবনানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু সবদিক ভেবে দেখেছেন যে জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তিনি জানেন যে তাদের যে আত্মীয়তার সম্পর্ক, তাতে ধর্মীয় শাস্ত্রমতে দুজনের বিয়ে অসম্ভব। জীবনানন্দের জন্য ধর্ম অমান্য করে বিদ্রোহী হবার মতো কোনো প্রেরণা শোভনা নিজের ভেতর দেখেননি। ক্ষণিক আনন্দ ভাগাভাগি করেছেন হয়তো কিন্তু তাঁর মতো বিত্তবান বাবার রূপসী, কনভেন্টে পড়া চৌকস মেয়ে, জীবনানন্দের মতো বরিশালের লাজুক, নিম্নবিত্ত পরিবারের একজনকে জীবনা সাথি হিসেবে কল্পনা করেননি হয়তো। ফলে জীবনানন্দের মনে যত উন্মাদনাই দেখা দিক না কেন, শোভনা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু দিল্লির বিরান প্রবাসে বসে শোভনা জীবনানন্দকে কতটা কাবু করে রেখেছেন তার প্রমাণ আবারও মেলে তাঁর ডায়েরিতে। ১৯৩০-এ দিল্লিতে লেখা ডায়েরির কতগুলো এন্ট্রি, 'What BY might be doing: her letters mystery of it all–her coolness or lovelessness: torment incarnated–...will she ever understand?'

শোভনার ডাকনাম বেবী তখন সংক্ষেপে হয়ে গেছে বিওয়াই। দিল্লিতে বসে জীবনানন্দ ভাবছেন আসামে বিওয়াই কী করছে এখন? তাঁর রহস্যময় চিঠি—তার নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়া বা ভালোবাসাহীনতা। কিন্তু নিজে জীবনানন্দ তো বেদনার এক জলজ্যান্ত মূর্তি হয়ে উঠছেন...শোভনা কি কোনো দিন তা বুঝবে?

'Why I love her: all her commonness and coolness.' আবার ভাবছেন কী কারণেই বা নেহাত সাদামাটা, শীতল এই মেয়েটাকে ভালোবাসছি আমি?

'Stale morning–Dream (BY): unique I near touch, smell flesh &

BanglaBook.org

soul: the wait & agony...' একটা নষ্ট সকাল, বেবীকে স্বপ্ন দেখেছেন। যেন তাঁকে স্পর্শ করছেন, তাঁর শরীরের, আত্মার ঘ্রাণ নিচ্ছেন। এই অপেক্ষা আর তীব্র বেদনা...

শোভনার প্রতি একাধারে ভালোবাসা আর নিরাসক্ততার দোলাচলে আছেন তখন জীবনানন্দ। শোভনার শরীরের নৈকট্য পেয়েছেন জীবনানন্দ, তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন, চুম্বন করেছেন। সে সুযোগ শোভনা তাঁকে দিয়েছেন। স্বভাবতই প্রত্যাশা বেড়েছে জীবনানন্দের, আরও নিবিড় করে পাবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে। শোভনার এই ঘনিষ্ঠতার অনুমোদনকে জীবনানন্দ তাঁর প্রেমেরই স্বীকৃতি হিসেবে ভেবে নিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশ টের পেয়েছেন শোভনা তাঁর সক্ষমতার সীমানার বাইরে।

পাঁচ

এ সময় জীবনানন্দ যে কবিতাগুলো লিখেছেন সেগুলো এমনিতেই স্বয়ম্ভু। তবু তাঁর ডায়েরির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে এর ব্যক্তিগত মাত্রা এড়িয়ে যাবার উপায় থাকে না। কবিতাগুলোর পেছনে ভেসে ওঠে শোভনার মুখ। তিনি লিখেছেন :

তুমি তো জান না কিছু, না জানিলে,—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!
যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে?
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!
তোমার এ জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই!—
শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে!—
আমি ঝ'রে যাব, তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে,—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!

আরও লিখেছেন

তোমার শরীর,—

BanglaBook.org

তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;—তারপর,—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন দিকে জানিনি তা,—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই;—ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি,—পৃথিবীর পথে পথে হেঁটে হেঁটে
কত দিন রাত্রি গেছে কেটে!

গভীর আবেগে যাঁকে কবিতা শুনিয়েছেন একদিন, তিনি আসলে সোনারূপী পিতলমূর্তিমাত্র, এমনই মনে হচ্ছে তাঁর :

একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে
অনেক কবিতা লিখে চ'লে গেলো যুবকের দল;
পৃথিবীর পথে পথে সুন্দরীরা মূর্খ সসম্মানে
শুনিল আধেক কথা;—এইসব বধির নিশ্চল
সোনার পিত্তলমূর্তি : তবু, আহা, ইহাদেরি কানে
অনেক ঐশ্বর্য ঢেলে চ'লে গেলো যুবকের দল;
একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে—একবার বেদনার পানে।

তবু মনে পড়ছে সেসব রোদেলা দিন আর মেহগনিগাছের সেই ছায়া। একি আসামের অরণ্যেরই প্রেক্ষাপট?

অনেক কমলারঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক;
অনেক কমলারঙের রোদ ছিল,
অনেক কমলারঙের রোদ;
আর তুমি ছিলে;
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

BanglaBook.org

ভালোবাসার মানুষকে যে ক্ষণকাল পেয়েছেন তারই সুখস্মৃতি তখন বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি :

একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!
একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা।
একদিন—একরাত;—তারপর প্রেম গেছে চ'লে,—
সবাই চলিয়া যায়,—সকলের যেতে হয় ব'লে

অতঃপর ঘোর সর্পিল সুড়ঙ্গে

এক

এই যখন জীবনানন্দের মনের অবস্থা, তখন দিল্লির ঠিকানায় একদিন মা কুসুমকুমারীর একটা চিঠি এল। চিঠিতে এক আচমকা খবর। মা লিখেছেন, 'চাকরি বাকরি তো হলো এবার তোর বিয়ে করা দরকার।' আরও লিখেছেন, ঢাকায় তাঁরা একজন মেয়ে দেখেছেন তাঁর জন্য, তাঁদের পছন্দ হয়েছে। ঢাকা ব্রাহ্মমন্দিরের আচার্য অমৃতলাল গুপ্তের ভাইয়ের মেয়ে, পড়ে ইডেনে, নাম লাবণ্য। মা লিখেছেন, জীবনানন্দ যেন একবার ঢাকায় এসে মেয়েটাকে দেখে যান, তাঁর পছন্দ হলেই তাঁরা বিয়ের আলাপ পাকা করবেন। লাবণ্যর একটা ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছেন কুসুমকুমারী।

লাবণ্যর ছবিটা উল্টেপাল্টে দেখেন জীবনানন্দ। মেয়েটা অপূর্ব রূপসী নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই অচেনা রূপসীকে নিয়ে কী করবেন তিনি? এক চেনা রূপসী যে তাঁর মন দখল করে আছে, সে কথাও বা মাকে বলবেন কী করে? কিন্তু ওই চেনা রূপসীর নাগাল পাওয়াও যে অসম্ভব, সেটাও টের পেয়েছেন ইতিমধ্যে। দ্বিধায় জর্জরিত রইলেন জীবনানন্দ। মনের ভেতর চলল দোলাচল। ভেবে ভেবে একসময় তাঁর মনে হলো, বৃথা কেনই-বা তিনি শোভনার জন্য অপেক্ষা করবেন। সেখানে কোনো সম্ভাবনা তো অবশিষ্ট নেই। কেনই-বা তিনি এই নতুন সম্ভাবনাকে যাচাই করে দেখবেন না? লাবণ্যকে এক অজানা নতুন জীবনের ইঙ্গিত বলে মনে হলো তাঁর। এই ভাবনা মনকে চঞ্চল করল। জীবনানন্দ সিদ্ধান্ত নিলেন ঢাকা যাবেন, পরিচিত হবেন লাবণ্যর সাথে।

রামযশ কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে বরিশাল হয়ে জীবনানন্দ চলে গেলেন ঢাকার ব্রাহ্মমন্দিরের আচার্য অমৃতলালের বাড়িতে। মায়ের কাছ থেকে ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন যে অমৃতলালের ভাই রোহিনীকুমার এবং তাঁর স্ত্রী সরযু বালা অল্প সময়ের ব্যবধানে অকালে মারা গেলে তাঁদের মেয়ে লাবণ্যকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন অমৃতলাল। লাবণ্য পাটনা থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকার ইডেন কলেজে এসে ভর্তি হয়েছেন তখন। কাকা অমৃতলালই লাবণ্যর অভিভাবক। জীবনানন্দ যখন অমৃতলালের বাড়িতে গেলেন, তখন পরীক্ষা উপলক্ষে লাবণ্য হোস্টেলে। অমৃতলাল হোস্টেল থেকে জরুরি তলব করে আনলেন লাবণ্যকে। পরদিন লাবণ্যর পরীক্ষা, তা ছাড়া সেদিন সারা সকাল প্রচুর বৃষ্টি হয়ে রাস্তাঘাট কাদাপানিতে ভরা। লাবণ্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাদাপানি ডিঙিয়ে এলেন এবং বিরক্ত হয়ে কাকাকে বললেন, 'কী এমন জরুরি দরকার পড়ল যে এই সময় ডেকে আনলে?'

BanglaBook.org

অমৃতলাল বললেন, 'বলছি সব। আগে কয়টা লুচি ভেজে একটু বসার ঘরে এসো, একজন অতিথি আছেন।' লাবণ্য বাধ্য মেয়ের মতো বেশ কতগুলো লুচি ভেজে প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে গেলেন বসার ঘরে। তাঁর শাড়ি, স্যান্ডেলে তখনো রাস্তার কাদা, আঁচল কোমরে গোঁজা। বসার ঘরে গিয়ে দেখলেন শ্যামলা মতো এক লোক বসে আছেন। অমৃতলাল বসতে বললেন লাবণ্যকে। লাবণ্য বেশ বিরক্ত হয়ে একটা মোড়ার ওপর গিয়ে বসলেন। অমৃতলাল লাবণ্যকে বললেন, 'তোকে পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি জীবনানন্দ দাশ, দিল্লিতে একটি কলেজের অধ্যাপক।'

লাবণ্য নমস্কার জানিয়ে বসে রইলেন। লাবণ্য, জীবনানন্দ, অমৃতলাল সবাই চুপচাপ। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঝুলে রইল তাঁদের মধ্যে। জীবনানন্দ সেখানে গেছেন আবার যেন যানওনি। একটা আধাআধি মন নিয়ে বসে ছিলেন। একপর্যায়ে জীবনানন্দ লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো আইএতে পড়ছেন জানলাম, তো আইএতে কোন কোন সাবজেক্ট নিয়েছেন?' লাবণ্য বিরক্তি নিয়েই বললেন, 'ইকোনমিকস, হিস্ট্রি, ফিলোসফি।' জীবনানন্দ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এগুলোর মধ্যে কোন সাবজেক্টটা বেশি ভালো লাগে আপনার?' যেন মাস্টার আর ছাত্রীর আলাপ হচ্ছে। অতিথিকে লুচি দিতে এসে এ রকম পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে ভাবেননি লাবণ্য। কোনো রকমে বললেন, 'ইতিহাস', বলেই বসার ঘর থেকে উঠে চলে গেলেন ভেতরে।

অমৃতলাল একটু অপ্রস্তুত হলেন, বললেন: 'পরীক্ষা চলছে তো তাই একটু উদ্বিগ্ন আছে। লাবণ্যর পড়াশোনার খুব শখ।'

জীবনানন্দ: 'তা তো নিশ্চয়ই। পড়াশোনাটা তো ইমপর্টেন্ট।'

লুচি খেতে খেতে দিল্লির জীবন নিয়ে কথাবার্তা বললেন জীবনানন্দ। তারপর বললেন: 'আজ উঠি।'

অমৃতলাল উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন জীবনানন্দের সিদ্ধান্ত জানবার জন্য। সপ্রশ্ন তাকালেন তিনি।

রূপসী বলে সুনাম আছে লাবণ্যর। লাবণ্যর রূপ জীবনানন্দের মনে বিস্ময় জাগায়। যেমন তিনি তাঁর কবিতায় একবার লিখেছেন বনে হরিণীর রূপ দেখে চিতার বুকে জাগে বিস্ময়। জীবনানন্দ বললেন, 'আমি এ বিয়েতে রাজি।'

অমৃতলাল উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। পরম প্রশ্রয়ে জীবনানন্দের হাত ধরলেন, পিঠে হাত বোলালেন। আবেগাক্রান্ত হয়ে বললেন, 'আজ আমার খুব আনন্দের দিন, বাবা...।'

তাঁর মা এরপর প্রয়োজনীয় আলাপ সারবেন জানিয়ে বিদায় নিলেন জীবনানন্দ।

জীবনানন্দ চলে গেলে অমৃতলাল উত্তেজনায় লাবণ্যকে ডাকতে লাগলেন,

BanglaBook.org

'লাবণ্য মা, আয় এদিকে, এখানে বস। এবার বল অধ্যাপক ভদ্রলোকটিকে তোর কেমন লাগল?'

লাবণ্য অবাক হয়ে বললেন, 'কেমন লাগল মানে?'

অমৃতলাল তখন বিয়ের ব্যাপারটা খোলাসা করলেন।

রেগে গেলেন লাবণ্য, 'কী বলছ তুমি, কাকু? আমার পরীক্ষা চলছে। আমি এখন এসব নিয়ে একদম কথা বলতে চাই না।'

অমৃতলাল, 'তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে তোর পড়াশোনার ব্যাপারে তাঁর কোনো রকম আপত্তি থাকবে না।'

লাবণ্য আর আলাপ না বাড়িয়ে বলেছেন, 'আমি হোস্টেলে চললাম, অনেক পড়া বাকি।'

ইডেন কলেজের হোস্টেলে বিষণ্ন লাবণ্যর মনে পড়ে তাঁর মা-বাবার কথা। বিয়ের মতো অত বড় সিদ্ধান্ত নিতে ভয় করে তাঁর। এ-ও টের পান যে পিতৃমাতৃহীন একটি মেয়েকে কাকা আর কতকাল ভরণ-পোষণ দেবেন? কত দিন আর তিনি এভাবে তাঁদের গলগ্রহ হয়ে থাকবেন? তা ছাড়া দিল্লির ওই অধ্যাপক সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহল হয়। সে সময়ে মেয়ে দেখার চলতি রেওয়াজ তো ছিল জটিল। মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আনা হতো পাত্রের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সামনে, তারপর চলত কঠিন সাক্ষাৎকার পর্ব, চলত মেয়ের নানা শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মেয়ের হাঁটা কেমন, চুল কেমন ইত্যাদি দেখা। কিন্তু লাবণ্য তো একেবারে সাদামাটা একটা শাড়িতে, তা-ও আবার পাড়ে, স্যান্ডেলে কাদা মাখা অবস্থায় তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন। লাবণ্য ভাবলেন, অধ্যাপক সাহেব তো এই দেখেই তাঁকে পছন্দ করেছেন। লোক তাহলে মন্দ হবেন না বোধ হয়। সব দিক বিবেচনা করে লাবণ্য অমৃতলালকে জানান যে তিনি বিয়েতে রাজি। বিয়ের দিন-তারিখ, আয়োজন নিয়ে আলাপ শুরু হলো দুই পরিবারের মধ্যে।

BanglaBook.org

দুই

জীবনানন্দ বিয়েতে সম্মতি জানিয়ে দিল্লিতে ফিরলেন। কিন্তু দিল্লির একাকিত্বে ফিরে এসে জীবনানন্দ লক্ষ করলেন, তাঁর মনে আনন্দের চেয়ে বরং শুরু হয়েছে শঙ্কা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব। লাবণ্যকে দেখে এসেছেন, এখন সে আর নেহাত ফটোগ্রাফের একটা মুখ নয়, সে এক স্পষ্ট নারী। তাঁকে বিয়ে করবার সম্মতি জানিয়ে এসেছেন। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, শোভনাকে তিনি বিদায় জানাচ্ছেন চিরতরে। অথচ দিল্লিতে ফিরে দেখতে পেলেন মনের ভেতর বারবার ফিরে আসছে শোভনা। তাঁকে কিছুতেই মুছতে পারছেন না মন থেকে। মনের ভেতর তাঁর শুরু হয়েছে লাবণ্য আর শোভনার টানাপোড়েন। তাঁর সাংকেতিক ডায়েরিতে ছড়িয়ে আছে

সেসব দ্বন্দ্বের চিহ্ন। ১৯৩০-এর সেই সময়ের জীবনানন্দের ডায়েরির কয়েকটা লাইন, 'Labanya: a dream & a nightmare–BY (full portrait, detailed analysis & all).'

লাবণ্যকে তাঁর একাধারে স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন মনে হচ্ছে। আবার ভাবছেন বেবীর কথা, যাকে তিনি বিওয়াই বলেই সম্বোধন করেন ডায়েরিতে। তাঁদের দুজনকে নিয়ে মনের ভেতর গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছেন।

'Many disires to BY but checked–tragedy Labanya background.' বেবীকে নিয়ে অনেক কামনা-বাসনা জাগছে মনে কিন্তু সেগুলোকে সামলে নিচ্ছেন, কারণ প্রেক্ষাপটে আছে লাবণ্য।

'Dreams about Y: how difficult to crush & smother associations and seek an anodyne in L: yet this is what I am to do!' এখানে বেবী শুধু Y-তে পরিণত হয়েছে আর লাবণ্য L-এ। ওয়াইকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। ভাবছেন ওয়াইয়ের প্রতি এই তীব্র আবেগ ভুলে গিয়ে এলের ভেতর স্বস্তি খোঁজার চেষ্টা কী ভয়ানক কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে অথচ সে কাজটাই তাঁকে করতে হবে।

জীবনানন্দ তখন একটা প্রবল মানসিক চাপের ভেতর আছেন। রাত জাগছেন নির্ঘুম। একদিন ডায়েরিতে লিখছেন, 'Back aching after much night through corruption: so a morning!' Corruption মাস্টারবেশনের একটা প্রতিশব্দ। জীবনানন্দ তাঁর অন্য আরও বেশ কিছু লেখায় মাস্টারবেশনকে করাপশন হিসেবেই লিখেছেন। ডায়েরির এই এন্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে, সারা রাত বেশ কয়বার হস্তমৈথুন করেছেন তিনি। তাতে সকালে পিঠ ব্যথা করছে তাঁর। স্বমেহনের যৌন আনন্দের ভেতর দিয়ে তিনি বুঝি নিজেকে ভারমুক্ত করতে চাচ্ছিলেন তখন।

মানসিক টানাপোড়েনের এ রকম একটা অবস্থাতেই একদিন একটা বেমক্কা কাজ করলেন জীবনানন্দ, গেলেন দিল্লির বেশ্যালয়ে। রামযশ কলেজের তাঁর এক সহকর্মী নিয়ে গেলেন তাঁকে। ওই নিষিদ্ধ পল্লিতে যাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন জীবনানন্দ ডায়েরিতে, 'Girls here–first impression of brothels–women here: ideas about them: everything–নমস্তে।'

বেশ্যালয়ে ঢুকতেই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরা খদ্দের ধরবার জন্য নমস্তে নমস্তে বলে চলেছে, জীবনানন্দ সেগুলো দেখতে দেখতে চললেন, তাদের নিয়ে নানা কিছু ভাবছেন তিনি। তারপর এভরিথিং। এর অর্থ কী দাঁড়ায়। গণিকালয়ের সব রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর? বলা যাচ্ছে না। তবে একটা দ্বিধান্বিত, বিধ্বস্ত মানসিক অবস্থায় তিনি বেশ্যালয়ের বিচিত্র উত্তেজনায় কিছুটা সময় কাটিয়েছেন, সেটা জানা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

তিন

দিল্লিতে যখন জীবনানন্দ এক অস্থির সময় পার করছেন, লাবণ্য আর শোভনাকে নিয়ে দ্বন্দ্বে ভুগছেন, কৌতূহলে একদিন বেশ্যালয়েও পা রাখছেন, তখন বরিশালে চলছে তাঁর বিয়ের আয়োজন। ইতিমধ্যে কুষ্ঠি ইত্যাদি দেখে বিয়ের দিন ধার্য হয়েছে ৯ মে ১৯৩০। ঠিক হয়েছে বিয়ে হবে ঢাকার ব্রাহ্মমন্দিরে। এর মধ্যে একদিন দিল্লিতে শোভনার চিঠি পেলেন জীবনানন্দ। শোভনা লিখেছেন, তাঁর বিয়েতে আনন্দ করতে তিনি যাচ্ছেন বরিশাল। এই চিঠি পেয়ে একাধারে বেদনা আর কৌতুক বোধ হলো জীবনানন্দের। কী আশ্চর্য মেয়ে এই শোভনা। মানুষের হৃদয় নিয়ে কী অদ্ভুত খেলা খেলতে পারে সে।

জীবনানন্দ রামযশ কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে গেলেন ঢাকায়। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হবে ঢাকায়। বরিশাল থেকে তাঁর বাবা-মা আর বয়োজ্যেষ্ঠরা এলেন। পরিবারের বাইরে আর এলেন তাঁর সাহিত্যজীবনের একমাত্র প্রহরী বুদ্ধদেব বসু, সঙ্গে তাঁর বন্ধু কবি অজিতকুমার দত্তও।

বিয়ের দিনে তোলা জীবনানন্দ ও লাবণ্যর যুগল ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে বেশ নিপাট করে ধুতি, পাঞ্জাবি পরেছেন জীবনানন্দ, গায়ে একটা চাদর জড়িয়েছেন, আঙুলে একটা আংটি। বিয়েতে তখন বরের সোনার বোতাম, ঘড়ি এসব নেওয়ার রেওয়াজ, জীবনানন্দ নেননি। ওই আংটিটা নিয়েছেন। যদিও সেটা নিয়ে পরে অপরাধবোধে ভুগেছেন। ছবিতে জীবনানন্দের পাশে বসা রূপসী লাবণ্য। লাবণ্য উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছেন ক্যামেরার দিকে। তাঁর চোখে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন। মনে খানিকটা দ্বিধা নিয়ে স্বপ্ন জীবনানন্দও দেখছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রবাদ আছে, মানুষ স্বপ্ন দেখে আর কোথাও কেউ একজন হাসে।

বিয়ের পর জীবনানন্দ স্টিমারে করে ঢাকা থেকে বরিশাল ফিরলেন নতুন বউ নিয়ে। বরিশালে সর্বানন্দ ভবনে হবে বিবাহ-উত্তর উৎসব। স্টিমারঘাটে বাড়ির সব অনুজ আত্মীয়রা এসেছেন নববধূকে বরণ করে নিতে। জীবনানন্দ দেখলেন সেই আত্মীয়কুলের ভিড়ে আছেন শোভনাও। মিলুদার বিয়েতে আনন্দ করতে আসবেন, এ কথা শোভনা আগেই দিয়েছিলেন। যে নারীর জন্য বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন একদিন, যাঁর ঠোঁটের উষ্ণতা লেগে আছে তাঁর ঠোঁটে, তিনি কিনা ফুলচন্দন দিয়ে বরণ করছেন তাঁর স্ত্রীকে, এই দৃশ্যের বৈপরীত্য বিহ্বল করে রাখে জীবনানন্দকে। কিন্তু তাঁর মনের সেই খবর বিয়েবাড়ির হট্টগোলে কারও টের পাবার কথা নয়। শোভনা কি পেয়েছেন?

নবদম্পতিকে ঘিরে বরিশালের সর্বানন্দ ভবনে আনন্দ উৎসব। ভিড়, হইহুল্লোড়ের ফাঁকে আড়ালে-আবডালে শোভনার সাথে দু-একবার কথা বলেছেন জীবনানন্দ। শোভনার এত ফুর্তি দেখে যে তিনি বিস্মিত, সে কথা জানিয়েছেন।

BanglaBook.org

এভাবে একান্তে কথা বলা যে সমীচীন নয়, শোভনা বলেছেন তাঁকে। শোভনাবিষয়ক উদ্বেগ মনে চেপে নববিবাহিত বরের ভূমিকা পালন করে গেছেন জীবনানন্দ। আরও অন্যদের সঙ্গে মিলে জীবনানন্দের বাসরঘর সাজিয়ে দিয়েছেন শোভনা। দিনের শেষে অনুজরা সব মিলে তাঁকে ঠেলে দিয়েছে বাসরঘরে। সেখানে ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসে লাবণ্য। জীবনানন্দ দেখলেন, লাবণ্য ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। মৃদু স্বরে জানতে চাইলেন, কী হলো?

লাবণ্য বললেন, 'কিছু না, এমনি। মাকে, বাবাকে মনে পড়ছে খুব।'

জীবনানন্দ নীরবে শোনেন লাবণ্যর কথা। মা-বাবাহীন এই অচেনা মেয়েটার জন্য মনে মায়া জাগে তাঁর।

পরিবেশ খানিকটা হালকা করতে জীবনানন্দ বলেন, 'শুনেছি তুমি গান করো। একটা গান শোনাবে?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে লাবণ্য বলেন, 'কোন গান করব?'

জীবনানন্দ : রবীন্দ্রনাথের 'জীবন মরণ সীমানা ছাড়ায়ে' গানটা জানো?

লাবণ্য ঘাড় নেড়ে বললেন জানেন। তারপর হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে বাসরঘরের বিছানায় বসে মৃদু স্বরে গাইলেন, 'জীবন মরণ সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।'

লাবণ্য গানটা শেষ করলে জীবনানন্দ বললেন, 'আরেকবার একটু গাইবে?'

লাবণ্য একটু অবাক হলেন। বাসররাতে শুনবার মতো এটা একটা গান? তা-ও আবার দুবার? লাবণ্য গানটা গাইলেন আবার।

বিয়ের দিনকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ মনে হলো কেন জীবনানন্দের? সেই জীবন-মৃত্যুর সীমানায় কোন বন্ধুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছেন তিনি? কার কথা স্মরণ করছেন তিনি?

অবশ্য জীবনানন্দ বলেছেন অন্য কথা। বিয়ের অনেক দিন পেরিয়ে যাবার পর একদিন লাবণ্য জীবনানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তুমি প্রথম রাতেই জীবন-মরণের সীমানা ছাড়াতে চেয়েছিলে কেন, বলো তো?'

জীবনানন্দ হেসে বললেন, 'ওই গানটার এ রকম দুটা লাইন আছে না—

আজি এ কোন গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নামিয়া

জীবনের শুভ আরম্ভেই তো এ গান গাওয়া উচিত, শোনা উচিত, তাই না?'

চার

পেছনের সবকিছু ভুলে একটা শুভ আরম্ভই করতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দ। কিন্তু কিছুদিনের ভেতরেই তাঁর দাম্পত্যে দেখা দিতে লাগল নানা রকম অশুভ সংকেত।

BanglaBook.org

বিয়ে উপলক্ষে রামযশ কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন জীবনানন্দ। ছুটি শেষ হয়ে আসছিল। কিন্তু মনটা তখনো দিল্লির সেই অনাত্মীয় পরিবেশে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত নয়। ছুটি বাড়ানোর একটা দরখাস্ত তিনি পাঠিয়ে দিলেন কলেজে। কিন্তু ফিরতি ডাকে পেলেন এক অপ্রত্যাশিত চিঠি। কর্তৃপক্ষ তাঁর ছুটি না বাড়িয়ে তাঁকে বরং জানিয়ে দিয়েছে যে তাঁর আর কলেজে যোগ দেবার দরকার নেই। জীবনানন্দকে চাকরিচ্যুত করা হলো। কলেজে এমনিতেই জীবনানন্দ অজনপ্রিয় ছিলেন, বিভাগীয় প্রধান সুকুমার দত্তও তাঁর ওপর প্রসন্ন ছিলেন না, ফলে ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। তাঁর ছুটির দরখাস্তের সুযোগে জীবনানন্দকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হলো। দ্বিতীয়বার বেকার হলেন জীবনানন্দ।

দিল্লির চাকরিটা তাঁর পছন্দের ছিল না নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাই বলে এই মুহূর্তে, বিয়ের ঠিক পরপরই এভাবে চাকরি চলে যাওয়া একটা মারাত্মক বিপর্যয়ের ব্যাপার হলো জীবনানন্দের জন্য। সংসারে টাকাপয়সার টানাটানি সব সময় আছে, তার ওপর ঘরে তাঁর সদ্য বিয়ে করে আনা স্ত্রী। এই অবস্থায় উপার্জনহীন হয়ে থাকা চলে কী করে? খুব নিরালম্ব বোধ করতে লাগলেন জীবনানন্দ। হন্যে হয়ে আবার একটা চাকরি খুঁজতে লাগলেন। পত্রিকা দেখে দরখাস্ত করতে লাগলেন। কিন্তু মাসের পর মাস যায়, চাকরি আর মেলে না। এর আগে একবার এমন একটা পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে গেছেন জীবনানন্দ সিটি কলেজে চাকরিটা হারিয়ে। আবার সেই একই পরিস্থিতিতে পড়ে খুব নাজেহাল বোধ করতে লাগলেন তিনি।

এদিকে লাবণ্যও ভেঙে পড়েছেন মানসিকভাবে। বিয়ের পরপরই সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেছে তাঁর। স্বপ্নভঙ্গ ঘটে গেছে। অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারিয়ে কাকার কাছে বড় হয়েছেন লাবণ্য। সেখানে পেয়েছেন স্নেহ, অবাধ স্বাধীনতা। বিয়ের পর বরিশালের সর্বানন্দ ভবনের বিরাট যৌথ পরিবারের নানা নিয়মকানুনের ভেতর এসে তাঁর মন হাঁসফাঁস করতে লাগল সব সময়। স্বামী জীবনানন্দকে বিয়ে করেছিলেন দিল্লির অধ্যাপক জেনে কিন্তু দেখলেন বিয়ের পরপরই তিনি বেকার। এই যৌথ সংসারে নানা রকম কাব্যজ্ঞানের চর্চার কমতি না হলেও টাকাপয়সার কমতি বরাবর। স্বামীর উপার্জন নেই, ফলে টাকার জন্য তাঁকে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যদের দিকে। আগে জানতেন না কিন্তু বিয়ের পর এ খোঁজও পেলেন যে তাঁর স্বামী একজন কবি। লাবণ্য সাহিত্য-পৃথিবীর খোঁজ তেমন রাখেন না। জীবনানন্দের কবিতার বই উল্টেপাল্টে দেখেছেন কিন্তু সেসব কবিতা তাঁর কাছে কোনো অর্থ বহন করেনি। লাবণ্য চেয়েছিলেন নেহাত সচ্ছল এক পরিবারের সাধারণ এক স্ত্রী হতে। লাবণ্যর সে প্রত্যাশায় ভাঙন ধরল। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর লাবণ্য দাশ তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'আমি শৈশব কাটিয়েছি ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল গিরিডিতে।

BanglaBook.org

শালবনের আলো-আঁধারিতে ছায়াঘেরা পথে ঘুরে বেরিয়ে বর্ষায় উচ্ছল যৌবনা পাহাড়ী নদী উশ্রীর রুপোলী ধারায় পা ডুবিয়ে এবং ছোট ছোট পাহাড়ের উপর দৌড় ঝাঁপ করেই আমার দিন কেটেছে। বন্ধন কাকে বলে জানতাম না। তাই বরিশালে প্রতি পদে পরাধীনতার শিকল ফাঁস হয়েই আমার গলা আটকে ধরল। টানাটানি করে সে ফাঁস আগলা করতে গিয়ে চোখের জলেই ভেসেছি কিন্তু তাকে তার জায়গা থেকে একটুও নড়াতে পারিনি।'

লাবণ্যর স্মৃতিচারণায় তাঁর নিজের বঞ্চনার কথা যেমন আছে, পাশাপাশি আছে তাঁর আত্মীয়স্বজন, ভাইবোনদের বৈষয়িক নানা সাফল্যের তালিকা। এর ভেতরে কোনো কিছু গুছিয়ে উঠবার আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে গর্ভধারণ করলেন লাবণ্য। বছর না ঘুরতেই জন্ম হলো তাঁদের কন্যা মঞ্জুশ্রীর। বিপর্যস্ত সংসারে সন্তান পালনের বিড়ম্বনায় শরীর-মন আরও বিগড়ে গেল লাবণ্যর, মেজাজ খিঁচড়ে থাকতে লাগল তাঁর। সবকিছুর জন্য দোষারোপ করতে লাগলেন জীবনানন্দকে, কাঁদতে লাগলেন সারা দিন। মাঝে মাঝে কথা বন্ধ, খাওয়া বন্ধ করে দরজায় খিল লাগিয়ে বসে থাকতেন। বিয়ের পর লাবণ্যর বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থার খোঁজ পাওয়া যায় জীবনানন্দের ডায়েরিতে। বিয়ের বছরখানেক পরের ১৯৩২-এর ডায়েরিতে লিখছেন, 'The same old rejection কথা বন্ধ। তুমি আমার কি benefit her great concern and solicitous for me step by step brought down to this callous negativity... .' লাবণ্য জীবনানন্দের সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন। এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের সম্পর্ক একটু একটু করে একটা হৃদয়হীন ঘোর নেতিবাচকতায় পৌঁছেছে।

আরেক পৃষ্ঠায় লিখছেন, 'Our marriage is scram...সারা দিন কাঁদে...আমায় ধুলায় মিশিয়ে দেয়...মুক্তি চায়...উঠে পড়ি...কী করব? আত্মহত্যা? শীতের রাতে অন্ধকার পুকুরে ডুবে মরব?...'

তাঁদের বিয়ে একটা চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে টের পাচ্ছেন জীবনানন্দ। লাবণ্য সারা দিন কাঁদছেন, জীবনানন্দকে অপদস্থ করে ধুলায় মিশিয়ে দিতে চাচ্ছেন, মুক্তি চাচ্ছেন। কীভাবে মুক্তি দেবেন তিনি ভাবছেন। শীতের রাতে অন্ধকারে পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করে কি তাঁকে মুক্তি দেবেন?

'L terrible অবস্থা for 3-4 days দরজা বন্ধ, নাওয়া না, খাওয়া না, শুধু মুড়ি—দিনের পর দিন—কোনো অনুনয়-বিনয় কিছু না...will strave to death...এ বাড়ির সবাই তারপর...ওকে ভূতে পায় নাকি?' এখানে L লাবণ্যকেই চিহ্নিত করছে। লাবণ্য তিন-চার দিন ধরে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে ঘরে নিজেকে আটকে রেখেছেন। শুধু মুড়ি খেয়ে থেকেছেন, না খেয়ে মরে যেতে চান। বাড়ির সবাই মিলে বুঝিয়ে তারপর তাঁকে খাইয়েছে।

BanglaBook.org

বোঝা যায়, নতুন দাম্পত্যে লাবণ্যর একরকম ভূতে পাওয়ার অবস্থাই হয়েছিল। ডাক্তারি ভাষায় হয়তো বলা যেত ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন। দাম্পত্যের শুরুতেই জীবনানন্দ টের পেলেন যে লাবণ্যর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সেতু ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

পাঁচ

জীবনানন্দ তখন বস্তুত এক খাদে পড়ে গেছেন। চাকরিটা চলে গেছে আর বিয়ে ব্যাপারটা এক দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে লেখালেখি। সব মিলিয়ে এমন এক বাজে অবস্থায় পড়বেন, তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। এই পর্যায়ে জীবনানন্দ সিদ্ধান্ত নিলেন বরিশালে আর থাকবেন না, কলকাতায় চলে যাবেন। বরিশালে বসে চাকরি খোঁজাখুঁজি করে লাভ হলো না কোনো। ভাবলেন এবার কলকাতায় গিয়ে চাকরি খুঁজবেন। কলকাতায় গিয়ে একটা মেসে উঠলেন। জোগাড় করলেন একটা টিউশনি। টিউশনির টাকায় খাওয়ার আর মেসের খরচ মেটাতে লাগলেন। সেই সঙ্গে চলল পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির দরখাস্ত। এদিকে তাঁর ছোট ভাই অশোকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস করে আবহাওয়া দপ্তরে একটা চাকরি পেয়ে গেলেন। তাঁর পোস্টিং হলো কলকাতার বাইরে। অশোকানন্দ চাকরি পেয়ে টাকা পাঠাতে লাগলেন জীবনানন্দকে, বরিশালে লাবণ্যকে। ছোট ভাইয়ের টাকায় কায়ক্লেশে নিজের সংসার চলছে তখন তাঁর। মনে মনে ভীষণ কুণ্ঠিত হয়ে আছেন তিনি। দরখাস্ত করে কোথাও কোনো চাকরি হচ্ছে না। একটা কাজের চেষ্টায় কলকাতায় দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন জীবনানন্দ, নানা রকম ব্যবসার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন ঘোর নাজেহাল অবস্থায় তিনি পড়েননি কোনো দিন জীবনে। কলকাতায় তাঁর ওই মর্মান্তিক বঞ্চনার দিনগুলোর ছবি ফুটে আছে তাঁর ১৯৩১-৩২ সালের ডায়েরিতে, জীবনানন্দের সেই সংকেতিক ভাষায়, 'Today: a day much soiled: degraded in soul (I have bowed down before every cat & dog).' জানাচ্ছেন দিনটা কেমন মাঠে মারা গেল, অপমানিত লাগছে। জানাচ্ছেন চাকরি খুঁজতে কত কুকুর-বিড়ালের কাছে নতজানু হতে হচ্ছে তাঁকে।

'A unsuccessful man, a failure, an unemployed kicked: Show the least success & you will be fawned.' নিজেকে সর্বাংশে ব্যর্থ মনে হচ্ছে তাঁর। বলছেন, একজন বেকারকে সবাই লাথিগুঁতো দিয়ে তাড়িয়ে দেয়; সাফল্য দেখাও, একমাত্র তখনই লোকে পুছবে তোমাকে।

'Ushar ranjan & insurance & business etc. talks and pleasure of খেলা দেখা for me: many things gone out of life.' ইনস্যুরেন্সের দালালি

BanglaBook.org

করবেন কি না এ নিয়ে কথা হচ্ছে কারও সঙ্গে। আনন্দের ভেতর ছিল সুযোগ পেলে স্টেডিয়ামে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখা। টিকিটের পয়সা নেই, ফলে সেসব আনন্দও বাদ দিতে হচ্ছে তাঁকে। এ রকম আরও কত কিছু তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, সে কথা ভাবছেন।

'ট্যাড়স sustaining me: The irony & beauty of it.' বোর্ডিংয়ে ট্যাড়স খেয়ে বেঁচে আছেন। ট্যাড়সের এই কৌতুক আর সৌন্দর্য নিয়ে ভাবছেন।

'Heat, little sleep at noon- Tea shop once for all, can't spend more than 3 pice-poverty limiting & crushing the soul down. Thinking of scrapping the newspaper.' বোর্ডিংয়ে দুপুরে একটু ঘুমাবেন, গরমে সেটা আর হলো না। চা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। হাতে তিন পয়সা আছে। মাস চলতে হবে। দারিদ্র্য তাঁকে একেবারে পিষে ফেলছে। মনটাকে একেবারে ছোট করে দিচ্ছে। সংবাদপত্র একটা রাখতেন, সেটাও বাদ দেবেন ভাবছেন।

'Both- Business: 'malacca cane' ছাতার ডাঁট, House mortgage etc, Brokerage-Life!

ছাতার বাঁট তৈরির জন্য মোটা বেত লাগে, সেই বেতের ব্যবসার ব্যাপারে কথা হয়েছে কারও সঙ্গে কিংবা বাড়ি মর্টগেজের দালালিও করা যায় কি না এসব ভাবছেন। এই তাহলে জীবন, আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করছেন।

'Fine clear breezy night with fleecy clouds and moon..And the bogey of no money, no position, no opening or opportunity, no sympathy.' ফুরফুরে হাওয়ায় একটা খুব পরিষ্কার রাত, আকাশে চাঁদ আর মেসের বিছানায় শুয়ে নিজেকে মনে হচ্ছে কাল্পনিক এক লোক, যার কোনো টাকা নেই, সমাজে কোনো জায়গা নেই, কোথাও কোনো সুযোগ নেই, সহানুভূতি নেই।

'no more than 3 pices & what can 3 pices give you?' হাতে শুধু তিন পয়সা আছে। তিন পয়সা দিয়ে কীভাবে চলবে তা-ই ভাবছেন।

'Dr. Das. the insane idiot throwing the door in my face-long walk (No bus fare).' কোনো এক ডা. দাসের কাছে গিয়েছিলেন হয়তো চাকরির জন্য। সেই ইডিয়টটা মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বাসভাড়া নেই, হেঁটে হেঁটে মেসে ফিরেছেন।

'Kali & গরম জল দিয়ে খাটের ছারপোকা।' সস্তা মেসের খাটে রাজ্যের ছারপোকা। কোনো এক কালিকে নিয়ে গরম পানি দিয়ে সেই ছারপোকা মারছেন তিনি।

'...moneylessness, like a dirty wallowing pig.' টাকাপয়সা ছাড়া নিজেকে কাদায় পড়ে যাওয়া একটা শুয়োরের মতো মনে হচ্ছে।

'To what social position & status have I arrived now?–A PARIAH-

BanglaBook.org

A man who can't incur debts. Reflect 1 great disability-Like a bankrupt moral and material-a nuisance.' ভাবছেন সমাজের কোথায় এসে ঠেকলাম? ব্যর্থ, অথর্ব, নৈতিক, বাস্তবিক সব দিক দিয়ে একটা নুইসেন্সে পরিণত হয়েছেন যেন।

মানুষ ভাত খেয়ে বাঁচে না শুধু

এক

প্রথম বছর কোনো চাকরি মিলল না, ভাবলেন পরের বছর একটা কিছু তো মিলবেই। তাও মিলল না, মিলল না তার পরের বছরও। একদিকে চাকরি নেই, অন্যদিকে সংসারে তীব্র তিক্ততা সব মিলিয়ে এক হৃদয়বিদারক, শ্বাসরোধী পরিস্থিতি তখন তাঁর জীবনের। বছরের পর বছর জীবন-জীবিকার কোনো কূলকিনারা করতে পারছিলেন না তিনি। একটা ঘোর অসহায়ত্বের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। জীবনের কাছে যেন একটা ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছেন তিনি তখন।

কিন্তু জীবনানন্দ জানেন পৃথিবীতে একটা জায়গা অন্তত তাঁর আছে, যেখানে গেলে তিনি সম্রাট। সেখানে তাঁর কোনো প্রভু নেই, সেখানে জয়-পরাজয়ের মামলা শুধু নিজের সঙ্গে। সেটা লেখার দেশ। সেই ঘোর অসহায়ত্বের ভেতর বেঁচে উঠবার জন্য, বেঁচে থাকবার জন্য তিনি আবার লেখায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কিন্তু কী লিখবেন? কবিতা যা লিখেছেন তা সাগ্রহে ছাপিয়েছে *প্রগতি* পত্রিকা। কিন্তু আশ্চর্য পরিহাস, তাঁর বিয়ের ঠিক পরপরই বন্ধ হয়ে গেল বুদ্ধদেব বসুর *প্রগতি* পত্রিকা। তাঁর কিছুদিন আগে বন্ধ হয়ে গেছে আধুনিক কবিতার আরেক পত্রিকা *কালি কলম*। যেসব পত্রিকা তাঁর কবিতা ছাপাত, সেগুলোর দরজা তখন বন্ধ। এই রকম সময় জীবনানন্দ অভিনব এক সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি যা কোনো দিন লেখেননি, তা লেখা শুরু করলেন। জীবনানন্দ গল্প লিখতে শুরু করলেন, লিখলেন উপন্যাসও। কবিতা ছাপা হবে না, গল্প-উপন্যাসও ছাপা হবে না কিন্তু ওই মুহূর্তে জীবনের অভিজ্ঞতার যে জটাজালের ভেতর আটকে আছেন, তা গল্পেই খোলাসা করা যাবে বলে মনে হলো তাঁর। মনে করলেন জীবনের ওই ক্রান্তির সময়টায় নেহাত নিজের জীবনের দিকে তাকাবার জন্য, নিজের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য, নিজের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্যই গল্প লিখবেন তিনি। নিজের এক গল্পের চরিত্রের মুখেই খোলাসা করে গেছেন সেই অভিপ্রায়। তাঁর 'জামরুল তলা' গল্পের চরিত্র বলে, 'গল্প লিখবার ঘণ্টা মুহূর্তগুলো মানুষের জীবনের খুব একটা উৎসর্জনের জিনিস বলে মনে

BanglaBook.org

হয়।...সারাদিন গল্পটা লিখতে গিয়ে দীন, গ্রন্থিমাংশের পুনরুক্তি ও জীবনের জীর্ণশীর্ণ পুরনো বিষণ্নতা ও মূল্যবোধের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে কোথাও চলে যেতে পারি তাহলে আমার কাজ হবে...মানুষ ভাত খেয়ে বাঁচে না শুধু, সে পুঁইশাকের চচ্চড়ি ও কুঁচো চিংড়ির ঘন্ট খেতে পারে কিন্তু চিন্তা ও কল্পনা তবুও তার। সে পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ আবিষ্কার করতে পারে, অদৃশ্য সমুদ্রের শব্দ শুনতে পারে, ভোরের রাঙা সূর্যে অর্ধনারীশ্বরেরর ভয়াবহ সুন্দর রূপ দেখতে পারে।'

তাঁর নিজের জীবন তখন বস্তুত দীন, গ্রন্থিমাংসের পুনরুক্তি। সেই কুঁচো চিংড়ির দারিদ্র্য ভোগের ভেতরও চিন্তা আর কল্পনাকে জারি রেখে পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ আবিষ্কারের আশায় গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন তিনি। সেসব গল্প-উপন্যাস কোথাও ছাপাননি, গুপ্তধনের মতো সেগুলো আবিষ্কৃত হলো তাঁর মৃত্যুর পর পাওয়া সেই কালো ট্রাঙ্কগুলোতে।

বলা যায় জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসগুলো প্রায় সর্বাংশেই আত্মজৈবনিক। তাঁর নিজের জীবনের সংকটগুলো নিয়েই তিনি নাড়াচাড়া করেছেন সেই গল্পে। গল্প-উপন্যাসগুলো যেন তাঁর ডায়েরিরই এক সম্প্রসারিত রূপ। সে সময় লেখা তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের মূল চরিত্রের কোনো চাকরি নেই, সে নবিবাহিত, প্রেমিক তাকে উপেক্ষা করেছে, স্ত্রীর সঙ্গে তার বিস্তর মনের ফারাক। গল্পগুলো যে নিজের জীবনকে অদলবদল করে লেখা, সে ইঙ্গিতও গল্পেই রেখে গেছেন তিনি। 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' গল্পটা শুরু হয়েছে এভাবে, 'বিনোদ নিজের জীবনের একটা গল্প লিখছে।' তারপর লিখছেন, 'এখন লেখবার অবসর নেই, রুচি নেই, আবেগ নেই। চারিদিককার পরিশ্রম অবসাদের দরকার মেটাতে মেটাতে জীবনে আর কিছুই নেই যেন...তবু এইটুকু লিখে রাখা যাক।...এইটুকু নিজে লিখে নিজেকে দেখবারও কেমন একটা প্রয়োজন আছে যে। নিজের জীবনের কথাই, নামগুলো মাত্র বদলে দিয়ে লিখতে শুরু করেছে সে।'

জীবনানন্দ গল্পগুলো লেখার সন-তারিখ লিখে রাখলেও গল্পগুলোর কোনো নাম দেননি। নামগুলো দিয়েছেন পরবর্তীকালে তাঁর পাণ্ডুলিপির সম্পাদকেরা। তাঁর সেই সময়ের গল্পগুলো বস্তুত তাঁর দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতারই এক ধারাবিবরণী যেন। বিয়ের পরপরই তাঁর জীবনের যে ব্যাপক ওলটপালটগুলো হতে শুরু করল, সেগুলোর দিকেই তিনি গভীর অভিনিবেশে তাকিয়েছেন এসব কথাসাহিত্যে।

দুই

জীবনানন্দ যাঁকে ভালোবাসতেন, মনে মনে যাঁকে প্রেমিকা হিসেবে ভেবে নিয়েছিলেন, তাঁকে তিনি স্ত্রী হিসেবে পাননি, বিয়ে করতে হয়েছে অচেনা এক

BanglaBook.org

নারীকে। অথচ বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেই নারী, যাঁকে তিনি তাঁর ভালোবাসার মানুষ বলে মনে করতেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, জীবনানন্দের একেবারে শুরুর গল্পগুলোর বিষয় ঠিক এটাই। সেসব গল্পের অধিকাংশগুলোতেই দেখা যায় গল্পের পুরুষ চরিত্রের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে তাঁর প্রেমিকা এবং তাতে তৈরি হয়েছে মনের এক দ্বন্দ্বের। 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' গল্পের চরিত্রের নাম হিমাংশু, তার প্রেমিকা অরুণা কিন্তু হিমাংশুর বিয়ে হচ্ছে সরোজিনীর সঙ্গে। বিয়ের অনুষ্ঠানে আসবে সে কথা জানিয়ে হিমাংশুকে চিঠি লিখেছে প্রেমিকা অরুণা। জীবনানন্দের বিয়েতে শোভনার উপস্থিতির সরাসরি সূত্রকে লক্ষ না করে উপায় নেই। অরুণার সেই চিঠি নিয়ে হিমাংশুর অনুভূতি, ...আগাগোড়া সমস্ত চিঠিটাই এমন তাচ্ছিল্য ও তামাশার মুডে লেখা এবং তা এতই স্বাভাবিক (অকৃত্রিম) যে মনে হয় হিমাংশু এতদিন পরে যে এমন ধরনের একটা কাজ করতে যাচ্ছে অরুণার নিজের দিক দিয়ে অন্তত আকস্মিক বা নিদারুণ মনে করা তো দূরের কথা, সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে করে আগ্রহের সঙ্গে সহানুভূতি করছে, কোনো আঘাত পাওয়া, স্তব্ধ হয়ে যাওয়া, দূরে পড়ে থাকার কোন প্রয়োজন নেই যেন অরুণার। সে সকলের সঙ্গে একজন হয়ে হিমাংশুর এই বিয়ে ব্যাপারটাকে পুরো মাত্রায় উপভোগ করতে পারে। হিমাংশুর বিয়েতে কি কি তামাশা ও ফুর্তি করতে পারা যায় তারই এক মর্মান্তিক লিস্টি দিয়ে চিঠিটাকে সে ছেলেমানুষির শেষ সীমায় নিয়ে পৌঁছিয়েছে।'

অরুণার সঙ্গে তাঁর প্রেমের দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে হিমাংশুর, '...এক হিসাবে দেখতে গেলে, জীবনের প্রকৃত প্রয়োজনের হিসাবের দিক দিয়ে অরুণার সঙ্গে যে কটি বছর তার ভালোবাসা গেছে—বটেই অপচয়ের বছর। যে ভালোবাসা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না, যেমন বিবাহে বা বিবাহহীন দাম্পত্যেও, জীবনকে তাও অভিজ্ঞ করে বটে, জীবনের কোনো এক সময়ের প্রয়োজনও মেটায়, পরিতৃপ্তিও বোধ করা যায়, কিন্তু কাকের কালো পাখনার ভিতর থেকে—থেকে থেকে যে ময়ূরকণ্ঠী রঙ ফুটে বেরয় তেমনি ক্ষণিকের জিনিসগুলো, জীবনের সাদাসিদে প্রচার প্রয়োজনের সম্পর্কে একেবারে অবান্তর। এসবই বোঝে হিমাংশু, কিছুদিন থেকে বুঝে আসছে। কিন্তু তবুও, শিগগিরই বিয়ে করতে যাচ্ছে যদিও হিমাংশু—তবুও না পারছে সে বিবাহিত জীবনের আগাগোড়াটাকে ভালো করে ধরতে। কখনো সেটাকে সম্পদের জিনিস বলে মনে হয়, কখনো কর্তব্যের, কখনো বোঝার, না পারছে সে জীবনের প্রয়োজনীয় প্রেমটাকে ছেড়ে দিতে, অরুণার ভালোবাসাকে...অরুণাকে ভালোবেসে জীবনটা আজও খেয়ে যাচ্ছে যেন, এ রকম খরচ হয়ে যাচ্ছে। কেবলই দ্বিধা, কেবলই বাধা, কেবলই যাতনা, অপচয়। কোন শান্তি বা স্থিরতা না পেলে জীবনের কোন কাজই যে আরম্ভ হতে পারবে না...'

BanglaBook.org

জীবনানন্দের ডায়েরির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় হিমাংশুর দ্বিধার উৎস।

তার 'উপেক্ষার শীত' গল্পের চরিত্র শরদিন্দু অরুকে ভালোবেসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু অরু সব দিক বিবেচনা করে বলেছিল, এ বিয়ে হবার নয়। শরদিন্দু এখন অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করছে। অরু শরদিন্দুর আত্মীয়কুলেরই একজন। এ গল্পেও দেখা যাচ্ছে শরদিন্দুর প্রাক্তন প্রেমিকা এসেছে তার বিয়ের অনুষ্ঠানে। বিয়ের অনুষ্ঠানের কোলাহল এড়িয়ে শরদিন্দু এক ফাঁকে অরুকে বলছে, 'তোমার ভালোবাসা আমাকে কী দিয়েছে? কুম্ভিপাকের যন্ত্রণাও না, স্বর্গের চরিতার্থতাও না, নির্জীব পৃথিবীর হয়তো মেরুর দিকের পৃথিবীর খানিকটা অসাড়তা, প্রাণহীনতা, অকৃত্রিম কৃত্রিমতা, তার নিষ্ফলতা, তার শীত, এই তুমি দিয়েছ। কিন্তু তবু আমার ভালোবাসাকে জাগিয়ে প্রেমে যে কত আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, আগুন, আবিষ্কার, নিজে না বুঝে সেসব বুঝবার সুযোগও তুমিই আমাকে করে দিয়েছ বটে। তা ঠিক। তুমি জীবনে না এলে প্রেমও বুঝতাম না, অপ্রেমকেও না।'

কেন বিয়ে করছে তার একটা ব্যাখ্যা শরদিন্দু দিচ্ছে অরুকে, 'বিবাহকে গুণী লোক যতই নিরর্থক মনে করুক না কেন, জীবনকে এ ঢের দেয়, সাধ তৃপ্তি, অবসাদ, অসাধ, অভিজ্ঞতা, সাহস, দায়িত্ব, ক্ষমতা ও আবিষ্কার। বিবাহের ভিতর রেখেও বিবাহের অতিরিক্ত জীবনে পৌঁছিয়ে দেয় মানুষকে। যেন মাটির ভিতর ঘাস হয়ে ফুটে উঠবার স্বাভাবিকতা, ঘাসের বুকে শিশিরের ফোঁটার ভিতর নক্ষত্রকে প্রতিফলিত করবার মতো প্রতিভা বিবাহ। বিবাহের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে জীবনের অনাবিষ্কৃত বিস্তৃত খননের মধ্যে মানুষকে এইসব দেয়।'

নিজের সদ্য বিবাহিত স্ত্রী সম্পর্কে ভাবছে তাঁর 'বিবাহিত জীবন' গল্পের চরিত্র অজিত? 'এই মেয়েটি তার জীবনে আজ কে? একে বিয়ে করে এনেছে মাত্র। অবিশ্যি নিজের ইচ্ছায় ও যত্নে একটা বিবাহিত জীবন থাকা দরকার। জীবনের ফাঁকফোকরে নানা সময়েই যে আশ্রয়টা না হলে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক পুরুষ বা নারী কারুরই চলে না।'

নিজের বিয়ের সিদ্ধান্তের সময় যেসব টুকরো ভাবনা তাঁকে তাড়িত করেছে, এসব গল্পে সেসবই নেড়েচেড়ে দেখেছেন যেন জীবনানন্দ। তাঁর 'আকাঙ্ক্ষা কামনার বিলাস' গল্পের চরিত্র প্রমথ ভাবছে, 'মানুষের জীবনে রূপের স্থান কোথায়, ভালোবাসার সঙ্গে রূপের কী যোগ, নিতান্ত শরীরেই বা কতটুকু, ভালোবাসার পথে পরিপূর্ণ অর্থটুকু কী, বাস্তবিক প্রেম কী যে, এর সূচনা কোথায়, পরিণামই বা কতদূর, কোথায় বা ব্যথা তার, তার ঈর্ষা, হিংসা তার, তার শ্লেষ, দৌরাত্ম্য, দুরাচার, মাদকতা, উল্লাস, অমৃত, তারপর কুয়াশা, তার শীত, তার মৃত্যু।'

BanglaBook.org

লক্ষ করবার যে জীবনানন্দের গদ্যে ভর করে আছে তাঁর কবিতার আমেজও। এ এক নতুন ধরনের গদ্য যেন।

তিন

দাম্পত্য তাঁর প্রথম দিককার গল্পগুলোর প্রধান থিম হলেও গল্পগুলোর সন-তারিখ লক্ষ করলে দেখা যায়, সময়ের সঙ্গে সেসব গল্পের ভেতরের প্রসঙ্গগুলো পাল্টে যাচ্ছে। শুরুর গল্পগুলোতে পুরুষ চরিত্রের প্রাক্তন প্রেমিকার প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এলেও ক্রমশ তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে শুধু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের দিকে। লক্ষ করলে দেখা যায় তাঁর গল্প-উপন্যাসের দম্পতির সম্পর্কের বিবর্তনের সমান্তরালে চলছে জীবনানন্দের নিজের দাম্পত্যের বিবর্তনও।

জীবন প্রণালী উপন্যাসে অঞ্জলি তার স্বামীকে বলছে, 'বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে, এমএ পাশ করেছ এক যুগ আগে, তবুও একটা পয়সা যদি সম্বল নেই তোমার—মেয়েমানুষকে জীবনে আকাঙ্ক্ষা করতে গিয়েছিলে কেন?...একটা খাঁচার পাখিকে পুষতে হলেও তো নিঃসম্বল হলে চলে না! অথচ সৃষ্টির সব চেয়ে বড় জিনিস নিয়ে খেলা করলে কপর্দকহীন হয়ে।'

'বাসর রাত' গল্পের প্রেমনীহারের স্ত্রী মনিকা স্বামীকে বলছে, 'নিজেরা কায়ক্লেশে যে সংসার চালাতে পারে না সেখানে একজন পরের মেয়েকে এনে যারা কষ্ট দেয় তারা কি সৎ?'

অসম্ভব নয় জীবনানন্দের বেকারত্বে এই ছিল লাবণ্যর প্রতিক্রিয়া। সেই যে বিয়ের পরপর কথা বন্ধ, খাওয়া বন্ধ করে দিলেন লাবণ্য তখন তাঁর মুখেই কি এমন কোনো সংলাপ উচ্চারিত হয়েছিল? তাঁর গল্পের পুরুষ চরিত্র অবশ্য অকপটে মেনে নিচ্ছে যে স্ত্রীর এই অভিযোগ খুবই যৌক্তিক। কিন্তু সেসব চরিত্র নিজেরাই নিঃসহায়।

তাঁর গল্পের স্বামী কপর্দকহীন বটে তবু স্ত্রীর রূপে তাদের মুগ্ধতা জাগে, আকাঙ্ক্ষা জাগে স্ত্রীর সান্নিধ্যের। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, কারণ স্ত্রীর মেজাজ ইতিমধ্যে বিগড়ে গেছে। 'বাসর রাত' গল্পে স্ত্রী মনিকাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখছে স্বামী প্রেমনীহার, তার মনে হচ্ছে, '...বউয়ের মাথাটা যেন একটা গোক্ষুরের নীড়, মেয়েটি এপাশ ওপাশ ফিরছে আর নাকে কপালে বুকে শাড়ির উপর সাপশিশুদের মত অজস্র চুল ভেঙ্গেচুরে ফণা তুলে ঘুমিয়ে পড়ছে। ঘুম থেকে জেগে ফণা বিস্তার করে দিচ্ছে। অপলক হয়ে এই রূপ দেখা যায়। প্রতিবারই মনের ভেতর অসহ্য বিদ্যুৎ খেলে, হয়তো সৃষ্টির শেষ দিন অবধি এ রূপের সংস্পর্শে এমনি পুলকবিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়ে চলবে। প্রেমনীহার হাঁ তাকিয়ে, চোখ বুঝে অনেকক্ষণ ভেবে দেখে...ধীরে ধীরে ওর মাথায় নিবিড়

BanglaBook.org

আকুতিতে হাত রাখলো প্রেমনীহার। চুলের ভেতর দিয়ে আস্তে আস্তে আঙ্গুল বুলিয়ে নিতে লাগলো।

কিন্তু মনিকার মাথাসুদ্ধ সমস্ত চুল যেন তারের মতো কঠিন হয়ে উঠল, মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আঃ কি সব করছো।' বিড়ালের মতো ফোঁস করে ওঠে।

না না ওঠে না যেন সে, তার চেয়ে প্রেমনীহারই বরং একটু সরে শোবে, সভয়ে মনিকার চুলের ভেতর থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে প্রেমনীহার খুব সন্তর্পণে অনেকখানি দূরে সরে গেল। সমস্ত বিছানাটাই প্রায় মনিকার জন্য ছেড়ে দেয়নি কি? চায় যদি আরও ছেড়ে দেবে। বুকের ভেতর কেমন একটা ঢিবঢিব করে উঠল প্রেমনীহারের।

মনিকা গজগজ করতে করতে বলল, 'ধেত্তর, কেমন পাট পাট করে সাজানো ছিলো দিল আমার চুলের পাট নষ্ট করে...'

এরপর প্রেমনীহার ভাবছে, '...কেনই বা মানুষ বিয়ে করতে যায়? আজ রাতেই হয়তো লক্ষ লক্ষ লোকে পৃথিবী ভরে বিবাহের উৎসবে খেতে গিয়েছে এবং কোটি কোটি লোক তাদের জয় জয়কার করছে, কিন্তু কাল তাদের কাছ থেকেই ঢের সত্য কথা শোনা যাবে। সে কথাগুলো মোটেও ভরসা জনক নয়...

বিয়ে করে একধরনের ফাঁদে পড়া গেছে, এমন একটা ভাবনা জীবনানন্দের গল্পে ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকে। তাঁর গল্পের অনেক চরিত্রই লেখক, তারা টের পায় বিবাহিত জীবনে শিল্প-সাহিত্য চর্চা করা একটা দুরূহ ব্যাপার। 'ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া' নামের গল্পে বিরাজ, যে কিনা লেখালেখি করতে চায়, বলছে, 'কোন ব্যতিব্যস্ততার ভিতর আর্ট টিকতে পারে না, দারিদ্র্যতার ভিতর তা হতে পারে না, জটিল পরিবারের তোলপাড়ের ভিতর আর্ট কী করে টিকবে?...বিয়ে করা আর্টিষ্টের পক্ষে মারাত্মক—বিবাহ এদের দুজনের নিকট একদিনও হয়তো মোহের রূপে আসেনি, একদিনের জন্যও হয়ত এরা মেয়ে বা পুরুষ জীবনের কুহককে বুঝতে পারেনি পরস্পরের সংসর্গে।'

'চাকরী নেই' নামের আরেক গল্পে সুকুমার ভাবে, 'নিজের জীবন ঢের অপরাধী। ঢের বিমুখ। ঢের অপারগ। কিন্তু তাই নিয়ে সুকুমার এতদিন কাউকে ভারাক্রান্ত করতে যায়নি। আকাশের দিকে উধাও একটা ভারী বেলুনের মত নিজের বোঝাও সে বুঝছিলো না। সে কবিতা লিখতে, নদীর পাড়ে গিয়ে বসত, একা একা সারাদিন সাইকেলে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু বিয়ে করার পরের থেকেই বেলুনটা নামছে যেন, নামছে, নামছে, নেমে পড়ছে।...

বিয়ের পর থেকেই জীবনানন্দের নিজের জীবনের বেলুনটাও তো নামতেই শুরু করেছিল।

BanglaBook.org

চার

ক্রমশ জীবনানন্দের গল্পগুলোর পুরুষ চরিত্রের নারী এবং পুরো বিয়ে ব্যাপারটা নিয়েই একটা মোহভঙ্গ ঘটতে থাকে।

'বত্রিশ বছর পর' গল্পের চরিত্র অভয় ভাবে, '...স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক তার কাছে এখন অবসাদের মত বোধ হচ্ছে...জীবনে কোন প্রেমিকা নেই এখন অভয়ের, কোন অভিসারিকা নেই, নেই, আজকের জীবনে এ একটা চমৎকার অর্জন, মেয়েমানুষের যা কিছু যতকিছু সুন্দর, অভয়ের কাছে সমস্ত নিরর্থক—আজ। সে অন্য অনেক জিনিস নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়।'

'আঘ্রাণের শীত' গল্পের পুরুষ কথক বলে, 'একদিন নারীকে নিয়ে যে অভিনব স্বপ্ন ও মোহের রাজ্যে থাকব বলে ভাবতাম, যেখানে আর কোন কিছু প্রবেশ করতে পারবে না। সে খেয়াল আমার ভেঙ্গে গেছে...'

দাম্পত্য ক্রমশ মর্মান্তিক হয়ে ওঠে জীবনানন্দের গল্পগুলোতে। তাঁর গল্পের দম্পতিদের ভেতর এরপর শুধু মানসিক নয়, শারীরিক দূরত্বও তৈরি হতে শুরু করে।

'বাসর শয্যার পাশে' গল্পে দেবব্রতকে সাবধান করে দিয়ে তার স্ত্রী নীহার বলে, 'উনুনের ধোঁয়া আমার সহ্য হয় না আগের থেকে বলে রাখছি...সবদিক হবে কি করে? সুন্দর ভোগা ভোগা শরীরও চাই, আবার রান্নাবাড়িও চাই, তা কি কখনো হয়?' বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল নীহার। ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছিল। দেবব্রত অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর একটা বাতি অন্ধকার করে ঘুমন্ত বধূকে আদর করতে গিয়েই বাতিটা তৎক্ষণাৎ জ্বালিয়ে ফেলতে হলো দেবব্রতকে। স্ত্রী বলল, 'ভালো হবে না কিন্তু বলে রাখছি, তুমি আলাদা বিছানায় শোও গে।'

'প্রেমিক স্বামী' গল্পের স্বামী প্রভাত তার স্ত্রী মালিনাকে বলে, 'সেসব কাঁচা আনাড়ির বর্বর মোহ ভালোবাসার সময়, সেসব অনেকদিন হয় কেটে গেছে। মনে ওসব নিরর্থক ধোঁয়া নিয়ে স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গের জীবনটাকে পণ্ড করে দেয়ার সময় এখন আর নাই। এখন আমি বস্তু চাই।'

'বস্তু মানে?'—মালিনা ঘাড় হেঁট করে থেমে গেল।

প্রভাত একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেন মিছেমিছে ঢঙ করছো, জানো না তুমি সব?'

মোট কথা, তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোর বিয়ের আনন্দ মিটে গেছে। তাঁর গল্পের বিবাহিত চরিত্রকে এরপর দেখা যায় বিড়ম্বিত হয়ে একা একা মাঝরাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর 'অশ্বত্থের ডালে' গল্পটি অদ্ভুত। আজকের দিনে লিখলে লোকে এর ওপর ম্যাজিক রিয়েলিজমের তকমা লাগিয়ে দিত হয়তো। সেই গল্পের কথক বলছে, ...ঘরের উত্তর দিকের একটা কোনে আমার কোঠা। ছোট্ট একটা কোঠা। একটা টেবিল রয়েছে, একটা চেয়ার, বইয়ের আলমারী একটা আর খাট

BanglaBook.org

একখানা। আমি একাই থাকি সেখানে। বিয়ের আগে যেমন ছিলাম, তেমনি আছি। নিজেকে অবিবাহিত একাকী মানুষ ভাবতে বেশ লাগে। বিশেষত এই শীতের রাতে এই পাড়াগাঁয়ে।...'

'অশ্বত্থের ডালে' গল্পের চরিত্র এরপর গভীর রাতে পেঁচার ডাক শুনে বাইরে বেরিয়ে যায়। যায় মজুমদারদের পরিত্যক্ত বাড়ির দিকে। সেখানে প্রায় অন্ধ এক লোক বাড়ি পাহারা দেয়, যার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয় সে। এ লোক কখনো ঘুমায় না। সে বলে, যে পেঁচা পেঁচানী ডাকছে তারা আসলে মজুমদার এবং তার স্ত্রী। মজুমদারের স্ত্রী মরে পেঁচা হয়ে গেলে মজুমদারও মরে পেঁচা হয়, কারণ তারা দুজন একত্রে থাকতে চায়।

আগেকার দিনে এমন ভালোবাসা হতো। এখন আর হয় না, বলে সেই একাকী কথক পাহারাদার। তারপর সে বলে, 'হয় না যে তার নমুনা তো তুমি। রাত দুটো অবধি একটা কানার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছ।'

বিয়ে নিয়ে চরম মোহভঙ্গের পর তাঁর গল্পের পুরুষ চরিত্ররা ডিভোর্সের চিন্তাও করতে শুরু করে, 'মাংসের ক্লান্তি' গল্পে স্বামী রাগ করে এসে বলছে, 'খ্রীস্টান হতে হবে।'

স্ত্রী হেম আঁতকে ওঠে, 'কেন?'

'তোমাকেও হয় খ্রীস্টান না হয় মুসলমান করে ছাড়ব।'

হেম মুখ দিয়ে রা'টি বের করতে পারে না। স্বামী কী বলছে?

স্বামী : 'হিন্দু সমাজ ডাইভোর্স দেবে না। দিক না দিক বয়ে গেল, আমি খ্রীস্টান হয়ে তোমাকে ডিভোর্স করব। আবার সামান্য কথার ছুতা ধরে—তোমাকে মুসলমান করব কি আমি মুসলমান হব।'

'তারপর?'

'নতুন করে সংসার পাতব, নতুন একটা বউ আনব, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম যাই হোক না কেন, তোমার সঙ্গে এই ম্যারেজটা আবার ফেইলর হয়ে গেছে, ডিভাস্টেটিং...'

১৯৩০, ৩১, ৩২-এ লেখা জীবনানন্দের গল্পগুলো এমন একটা ডিভাস্টেটিং দাম্পত্য জীবনেরই ধারাবিবরণী যেন। মনে রাখা দরকার যে সেটা জীবনানন্দের বিয়েরও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর।

পাঁচ

লক্ষ করলে দেখা যায় নিজের দাম্পত্য জীবনের স্তর আর জীবনানন্দের গল্পের চরিত্রগুলোর স্তর সমান্তরালে এগোচ্ছে। দেখা যায়, যে বছর তাঁর গল্পের নারী চরিত্রগুলো গর্ভবতী, সে বছর লাবণ্যও গর্ভবতী। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোর

BanglaBook.org

গর্ভধারণ খুব বেদনাদায়ক এবং কুৎসিত অভিজ্ঞতা। 'মা হবার কোন সাধ' গল্পের চরিত্র শেফালীর মোটেও মা হবার কোনো সাধ নেই। ঘটনাক্রমে গর্ভবতী হয়েছে সে। জীবনানন্দ লিখছেন, '...সেই প্রথম মাসের বমি, অরুচি, বমি, চাপ, পেটের কষ্ট, দুর্বলতা, ওর সৌন্দর্যের অবিশ্রাম ধ্বংস তারপর কি রকম একটা বিকৃতি বীভৎসতা। শেফালীর জীবনের এই মোটা দিকটার সঙ্গে ওর আর একটা নিবিড় কষ্টের দিক জড়িয়ে রয়েছে, তা শুধু সংসারের অভাব নিয়েই নয়, মানুষের পরিহাস নির্মমতা নিয়েও বটে, কিন্তু শুধু তা নিয়েও নয়, কেনই এমন সন্তান হচ্ছে এবং যদিও বা হলো প্রমথের ভেতর দিয়ে তা কেন হলো, এমনতর একটা পরিহাসের ভিতর এসেই বা হতে গেল কেন, এসবের ভিতর থেকে কে তাকে বাইরে নিয়ে যাবে, হায় কে? এমনই একটা প্রবল মর্মান্তিক বিষম হাঁফ শেফালীর জীবনে এই সাত আট মাস ধরে দেখে আসছে প্রমথ।'

শেফালীর মনে হয় সন্তানের চাপ তার সমস্ত পেটটাকে গিলে খাচ্ছে, 'বাচ্চাটাকে তার একটা বিজাতীয় টিউমারের মত মনে হয়। অপেক্ষা না করে খামোখাই যে সে স্ত্রীকে গর্ভবতী করে দিয়েছে একথা ভেবে গল্পে স্বামী অপরাধ বোধে ভোগে।

'...শেফালীর সংস্কার বা শিক্ষার খাতিরে নয়, নিজের উপভোগের চাতুর্য্যের পরিপাটি ব্যবস্থার জন্য নয়, শেফালীর রূপের প্রয়োজনে অন্তত প্রমথের ঢের প্রতীক্ষা করা উচিৎ ছিলো। গাছের নীচে একরাশ শেফালীর উপর যখন একটা কুকুর এসে বিছানা গুটিয়ে বসে (তখন ব্যাপারটা এমন হয়)?'

এ গল্পটা যে বছর লিখছেন, সেই ১৯৩১-এ জীবনানন্দের প্রথম সন্তান মেয়ে মঞ্জুশ্রীর জন্ম হয়।

এ সময় জীবনানন্দ একটা উপন্যাসও লিখেছেন *পূর্ণিমা* নামে। সে উপন্যাসের পুরুষ চরিত্রকে খুব নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে দেখা যায়। সে এমনকি সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর মৃত্যুও কামনা করছে। *পূর্ণিমা* উপন্যাসের চরিত্র সন্তোষ আর পূর্ণিমার অসুখী দাম্পত্য। পূর্ণিমা যখন গর্ভবতী তখন সন্তোষ ভাবছে, 'পূর্ণিমার যদি মৃত্যু হত—এই প্রসবের সময়—তা হলে দু জনেই বেঁচে যেতে পারত তারা। কিন্তু তা কি হবে? তা যে হবে না এই মনে রেখেই জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল—দু জনের সমগ্র জীবনটা সমস্ত পরিশ্রম, প্রয়াস ও ব্যর্থতার ও প্রয়াসের জন্য।'

প্রেমহীনতা, রূঢ়তা, নিষ্ঠুরতায় ভরা এক দাম্পত্যের ইতিবৃত্ত জীবনানন্দের এই পর্যায়ের গল্পগুলো।

BanglaBook.org

ছয়

কিন্তু জীবনানন্দ কি গল্পগুলো লিখেছেন দাম্পত্যে জড়িয়ে পড়া এক পুরুষের মোহভঙ্গের বর্ণনা দিতে শুধু? তিনি কীটের বুকের ব্যথা টের পান, একটা অসম দাম্পত্যে জড়িয়ে পড়া একজন নারীর বুকের ব্যথা কি তিনি টের পাবেন না? জীবনানন্দের গল্পে দম্পতির স্ত্রীদের দৃষ্টিকোণটাও জানতে পারি আমরা। 'মা হবার কোন সাধ' গল্পের বেকার স্বামীর স্ত্রী শেফালী তার স্বামীকে চিঠিতে লেখে, 'আমার জন্মের থেকে বোর্ডিং-এর শেষ দিনগুলো অব্দি দুঃখ কাকে বলে তা ত জানিনি, কেমন নির্ভাবনায়, হাসিতামাশায় দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল আমার। কিন্তু সে যাক, সেসব কথা মনে পড়লেই বড্ড কষ্ট হয়। বিয়ে মানুষ সাধ করেই করে, কিন্তু আমি অত সুখের কল্পনা না করতে গেলেও কোনদিন কি ভেবেছিলাম ঠিক এরকমটা হবে...কলেজে কোনদিনও তা অতিবড় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। বুঝতে পারতাম না মানুষের জীবনের ভেতর এত সব তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নোংরামি থাকতে পারে নাকি আবার...এও আমার দুর্ভাগ্যর আর এক কিস্তি যে বিয়ের আগে চার পাঁচ বছর নানা জায়গায় চাকরী করলে, কিন্তু বিয়ের পর থেকেই তোমার আর কাজ নেই...'

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর লাবণ্য যে স্মৃতিকথা লিখেছেন, তার বহু আগেই যেন লাবণ্যর কথাগুলো তাঁর হয়ে লিখে গেছেন জীবনানন্দ। তাঁর গল্পে স্ত্রীর অসহায়ত্বে সহানুভূতিশীল স্বামীকেও দেখতে পাই আমরা। দেখা যায়, এই গল্পেই শেফালীর স্বামী প্রমথ তার স্ত্রীর পরিণতির কথা ভেবে বরং কষ্ট পাচ্ছে। সে ভাবছে, 'শেফালী অনেক বড় ঘরে পড়লে পারত। যে রকম বেদনা মেয়েটি চায় না, যে উপলব্ধি অলক্ষ সহিষ্ণুতা মমতার জীবনকে মেয়েটি আপাদমস্তক জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে ঘৃণা করে, এর কপালের সৌভাগ্যও বরাবর একে যেই পথ থেকে দূরে রেখেছে, রাখত যেন, আশ্বাস দিয়ে গেছে যেন, হায় কোন আকস্মিকতার দুর্ভাগ্যে সেই বিবিধ সম্ভাবনার সমৃদ্ধির থেকে মেয়েটি এই সবচেয়ে দুঃসাধ্য পথেই খসে পড়লো। প্রমথের জীবনের নিষ্ক্রিয়তা ও নিরর্থকতার ভিতর, নিজের পশুপ্রায় জীবনকে উদ্ধার করার জন্য প্রমথের এইসব ঘৃণা তুচ্ছ ষড়যন্ত্রের ভিতর, এই উপহাসের মধ্যে, এই কদর্যতার মধ্যে।'

পুরো পরিস্থিতিতে স্বামী ভাবছে তার নিজের অসহায়ত্বের কথাও,? '...কি করে শেফালীকে উপশম দেয়া যায় তার পথ খুঁজবার, কোন দিনও পথ পাওয়া যাবে না ভেবে অনেকক্ষণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে থেকে তবুও প্রতীক্ষা করবার, আশা করবার, সব সময়ই নিজের ব্যথাকে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী অনুভূতিপ্রবণ, বড় অশ্রুআবেগপূর্ণ বুঝতে পেরে সেগুলোকে জমিয়ে রেখে নিশ্চেষ্টতায় লজ্জা, ঘৃণা পেয়ে প্রয়াসে ব্যাকুল হয়ে উঠবার এই সবের ভার প্রমথের ওপর, এই সবের সার্থকতা ও অসার্থকতা নিয়ে তার জীবন। এই জীবনকে প্রশ্ন করবার কোনো অবসর তার নেই। ইচ্ছাও আছে কি?...

BanglaBook.org

তাঁর গল্পের স্ত্রীরাও টের পাচ্ছে তাদের স্বামীদের বঞ্চনা। *কারুবাসনা* উপন্যাসে স্ত্রী স্বামীকে বলছে, 'বাস্তবিক, তোমার স্ত্রী হয়ে এসে তোমাকে বড্ড লাঞ্ছনা দিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে—নিজের জীবনের কথা ভেবে দেখ যদি তুমি, তা হলে হয় তা উপলব্ধি করতে পারবে যে লোকসান আমার বেশি হলেও শূন্যতা যেন তোমার বেশি—কারণ সঞ্চয় বলে কোনদিনই কিছু যেন পাওনি।'

তাঁর গল্পগুলো সেল্ফ রেফারেনশিয়াল হলেও জীবনানন্দ তাঁর নিজের জীবনকেই তাঁর গল্পের বিষয় করে নিয়ে বস্তুত নিংড়ে বুঝবার চেষ্টা করছেন নর-নারীর সম্পর্কের নানা মাত্রাকেই। একজন ব্যক্তি হিসেবে নয় শুধু লেখক হিসেবে একটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে যখন তিনি তাঁর গল্পের কিম্বা বলতে গেলে তাঁর নিজের দাম্পত্যের দিকে তাকাচ্ছেন, তখন একটি অসম বিয়ের পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই তার মনে হচ্ছে নিরাশ্রয় দু'টা জীব যেন। 'দাম্পত্য এক অবোধ জোনাকী' লিখেছেন তিনি, জ্বলে আর নিভে।

সাত

এই গল্পগুলো যখন জীবনানন্দ লিখছেন, তখন পাশাপাশি অব্যাহত আছে তাঁর কলকাতায় মেসে থেকে অবিরাম চাকরি খোঁজার চেষ্টা। অনেকগুলো গল্প তিনি ওই মেসে বসেই লিখেছেন। দেখা যায় জীবনানন্দের গল্পের দম্পতির স্বামী চরিত্রও ঠিক তাঁর মতোই একসময় মফস্বলের বাড়ি ছেড়ে চলে আসে কলকাতায়, ওঠে মেসে। কলকাতায় গিয়ে পরিবারের প্রতিদিনকার অসহায়ত্বের জাল থেকে বেরিয়ে একটা একাকিত্ব খোঁজে তাঁর গল্পের চরিত্র, সেই সঙ্গে আদাজল খেয়ে খোঁজে চাকরি। তাঁর এই সময়ের গল্পে, উপন্যাসে আছে সেই মেস-জীবনের প্রকট বিড়ম্বনার চালচিত্র। তাঁর *বিভা* নামের উপন্যাসের চরিত্র মেসে থাকে। মেসের এই চরিত্র পয়সার অভাবে খায়নি। সে ভাবছে, 'সারাদিন আজ খেয়েছি-বা কী? বিকেলে এক কাপ চা খেয়েছিলাম। অযথা পয়সা খরচ হবে বলে এক পয়সার ডালমুট কিনে খেতেও ভরসা পাইনি।' এ সময় সে মেসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে, পাশের বাড়ির বিভা নামের মেয়েটার ঘরের টেবিলে অনেক খাবার, '...কেক-বিস্কুট কফি পড়ে আছে—যে কেউ নিয়ে যেতে পারে। চুরুট টানতে-টানতে ভাবি চড়াইয়ের মত হলে বেশ হত। আমার এ জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে উড়ে একেবারে গিয়ে পড়তাম বিভার ছোট টি-টেবিলটার ওপর। তারপর যা নিরবচ্ছিন্ন সার্থকতা তা চড়াইই জানে আর চড়াইর ভুবন—'

'নিরুপম যাত্রা' গল্পের চরিত্রও কলকাতার দারিদ্র্যক্লিষ্ট এক মেসবাসী। সে ভাবছে, 'বিপদ এই যে সামান্য দাড়ি কামাতে, একটা দেশলাই ব্যবহার করতেও যার সাহায্যের দরকার, সেই পয়সাই নাই। বয়স ত্রিশ বছর—আরো কুড়ি কি ত্রিশ বছর যদি সে বাঁচে তাহলে তিন টাকা সোয়া আনায় হয় না।'

BanglaBook.org

সফলতা নিষ্ফলতা উপন্যাসের চরিত্র নিখিল তার কলকাতার মেসে খাওয়ার বর্ণনা দেয়, 'বোর্ডিং এর ম্যানেজারকে বড্ড অমানুষ বলে মনে হয়—ঘেন্না করতে ইচ্ছা করে। পুঁইশাকের চচ্চড়ি-রামঝিঙ্গে আর কুঁচো চিংড়ির ঘ্যাট-গোরুর কলাই—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বচ্ছরের পর বচ্ছর এই একই ব্যবস্থা—এই বোর্ডিং এ এসেই প্রথম দেখলাম। ট্যাংরা মাছ আর পারসে মাছ দিয়ে ঝোল করে কিন্তু মাছ ভাজে না—ঝোলে তেল বা মশলাও কিছু তেমন দেয় না, সমস্তই সিদ্ধর ব্যাপার যেন, কেমন একটা আঁশটে গন্ধ মাছের ঝোলের মধ্যে লেগে থাকে যেন—মনে হয় যেন বাজারের মাছের গা ধোওয়া জল খাচ্ছি—আর এই কাঁচা মাছই চিবুচ্ছি যেন। এক আধ দিন পোনা মাছ আসে—কিন্তু বরফের জন্যই হোক না তা এত অসার যে মুখে দিয়ে বিড়ালের ভিজে লোমের আস্বাদ পাই কখনও কখনও—(কিম্বা এত শক্ত থাকে যে মনে হয় সুন্দরী কাঠ চিবুচ্ছি) এই বোর্ডিং এ এসেই মাছ খাওয়ার সাধ আমার ঢের কেটে গিয়েছে। মাছ মাংসের ভিতরকার অশ্লীলতা এমন গভীরভাবে আমি আগে কোনও দিন টের পাইনি।'

চাকরি খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত তাঁর গল্পের চরিত্ররা। *আমরা চারজন* উপন্যাসের এক চরিত্র বলে, 'অনেকটা সময় কেটে যায়। চাকরি খুঁজতে বেরুই না তবু আর। কোনও চাড় নেই। পথে ঘুরে ঘুরে কাপড় নোংরা হবে শুধু। জুতোর বাঁট খসে যাবে, পথে পথে মানুষের কফ পিত্তি মাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চলব, কুষ্ঠ রোগীদের দেখব, পয়সার জন্য বার বার বেচারারা নুলো হাতে সেলাম ঠুকবে আমাকে! দয়া হবে না আমার। চায়ের দোকানে ঢুকব—তাকিয়ে দেখব, জোঁকের মত কালো পুরু বা পান রঙা মাদারি বা চেকনাই মিহি ঠোঁট, নোংরা বা ঝর্ঝরে বক ঠুটোর মত চোখ নাক নিয়ে চা খোরের দল বসে গেছে চারদিকে—হাসছে, ঠাট্টা করছে, রগড় করছে—হয়তো কাব্য চর্চাও করছে।...'

গল্পগুলো যেন তাঁর সেই সময়কার জীবনেরই গোপন ডকুমেন্টেশন। যেমন তিনি তখন করতেন তেমনি তাঁর গল্পের চরিত্র মাঝে মাঝে কলকাতার মেস থেকে মফস্বলের বাড়িতে ফেরে। সে বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করে এক হিমশীতল চাপা বিভীষিকা। 'অঘ্রানের শীত' গল্পের বেকার পুরুষ চরিত্র কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে রাতে কথা বলছে স্ত্রীর সাথে :

'উমা : ঘুম পেয়েছে?

স্বামী : রাত তো কম হয়নি উমা।

উমা : কালেকটরের ঘড়িতে তো দশটা বাজলো।

স্বামী : কিন্তু শীতের রাতে এই ঢের বিশেষত পাড়াগাঁয়ে।

উমা : কলকাতায় হলে কী করতে?

BanglaBook.org

স্বামী : তা হয়তো বাইরেই থাকতাম, হেঁটে বেড়াতাম কিম্বা একটা পার্কে গিয়ে বসতাম।

উমা : এত রাত অবধি বসে থাক?

স্বামী : হ্যাঁ তা থাকি মাঝে মাঝে।

উমা কোথায় বসো?

স্বামী : বেঞ্চিতে কিংবা ঘাসের উপর পার্কে বা মনুমেন্টের কাছে।

উমা : একা?

স্বামী : একাই তো।

উমা : খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললে, বসে বসে কী কর?

স্বামী : মতলব আঁটি।

উমা : কীসের?

স্বামী ভবিষ্যতে কী করব।

উমা : বাস্তবিক একটা চাকরী টাকরী পেলে না।'

তারপর তারা আলাপ করে মাসে ৭০ টাকা বেতনের একটা চাকরি পেলে কী কী করবে। স্বামী বলে, ২০ টাকা কলকাতায় বাসা ভাড়া দেবে এবং জানতে চায় বাকি ৫০ টাকায় সংসার চলবে কি না? উমা কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসে সেই কাল্পনিক বেতনের ওপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ সংসারের একটা খসড়া করতে।

স্ত্রী যখন হিসাব করছে স্বামী ভাবে, '...এমন কত খসড়া তার বসন্তের বাতাসে লেখা হয়েছে আর কালবোশেখীতে উড়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠে তৈরি হয়েছে আবার আষাঢ় শ্রাবণের জলে ভিজে গেছে। আশ্বিনে গড়া হয়েছে ফের হেমন্তের হিমে চিমসে গেছে...'

স্ত্রী উমা বলে স্বামীর চাকরি হলে তার ছোট বাচ্চাটার জন্য একটা উলের টুপি কিনবে। কোন রঙের টুপি হলে ভালো হয় এ নিয়ে দুজনে পরামর্শ করে। অথচ ঘরে ফুটো পয়সা নেই। উমা একটা বই পড়ছিল, বইটার চল্লিশ পৃষ্ঠা পড়তে তখনো বাকি। পরদিন উঠে পড়বে, জানাল স্বামীকে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল দুজন। গভীর রাতে বাড়ির পেছনের পুকুরে ঝপ করে একটা শব্দ শোনা গেল। স্বামী গিয়ে দেখল উমা পুকুরে ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। একটা বইয়ের বাকি অর্ধেকটা না পড়ে, ছেলের জন্য একটা টুপি কেনার স্বপ্ন দেখতে দেখতে উমা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। তারপর স্বামী কলকাতার মেসে ফিরে যায়। আগের নিয়মে মেসের জীবন চলে। স্বামী ভাবে, '...জীবন সম্বন্ধে আমার ধারণা আগের মতই আছে। অন্ধকার রাতে মেসের ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় এখনই এই মেসের প্রকাণ্ড লবজোন তেতালা বাড়ি ভূমিকম্পে দুমড়ে উঠে আমাকে কোন অতলে তলিয়ে দিতে পারে। সেখান থেকে অনন্তকালের ভেতরও

BanglaBook.org

কেউ আমাকে খুঁজেও বের করতে পারবে না।...জীবন এরকমই। উমার মৃত্যুর আগেও আমি এই কথা ভাবতাম। এখনো ভাবি। জীবন সম্বন্ধে আমার মতামত স্থিরই আছে। জীবন এরকমই। সে আমাকে বাঁচতে দিয়েছে, খেতে দিচ্ছে, জীবনের অন্ধতা ও ভয়ঙ্করতার সম্বন্ধে কলম ধরে লিখতে দিচ্ছে। এই তার যথেষ্ট কৃপা। এতদিন লিখতে দিচ্ছে, লিখে চলি। আর কি করব? আর কিছু করার নাই। মাঝে মাঝে দেশের বাড়িতে গিয়ে খেতে মাঠে রোদে প্রজাপতি মৌমাছিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি কিন্তু তাদের উজ্জ্বল চঞ্চল জীবন সত্যি না মুখোস বুঝতে পারি না। খুব সন্দেহ হয়। কিন্তু মুখোস হোক সত্যি হোক মৌমাছিকে দাঁড়কাকে ঠুকরে খাচ্ছে এ আমি দেখেছি। দেখেছি ছোট ছোট ছেলেরা প্রজাপতির পাখনা ছিঁড়ে খেলা করছে।'

জীবনানন্দ জানিয়ে দিচ্ছেন যে জীবনের বাঁকে বাঁকে লুকিয়ে থাকা বীভৎসতা, নির্মমতার খোঁজ তিনি পেয়েছেন। পতঙ্গের জীবনের আনন্দকেও সন্দেহ করছেন তিনি, তাঁর মনে হচ্ছে ওসব আসলে মুখোশ। কারণ তিনি জানেন মৌমাছি যত আনন্দেই উড়ুক, তাকে ঠুকরে খাবার জন্য আছে দাঁড়কাক, প্রজাপতি যে ফুর্তিতেই তার রঙিন পাখা মেলুক, তার সেই পাখা ছিঁড়ে ফেলবার জন্য প্রস্তুত আছে দুষ্ট ছেলের দল। একজনের আনন্দ, প্রেম নস্যাৎ করবার জন্য বরাবর ওত পেতে আছে কেউ। জীবন, জগৎ সবকিছুর ভেতর একটা গভীর অসহায়ত্ব আছে যেন, আছে আশ্রয়হীনতা, এমনই মনে হচ্ছে তাঁর।

BanglaBook.org

আমরা সবাই বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত হরিণ

এক

এসব গল্প জীবনানন্দ একের পর এক লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু কাউকে দেখাননি। ছাপাবার জন্য কোনো পত্রিকায় পাঠাননি। ওই সময়টাতে সাহিত্যজগৎ থেকে জীবনানন্দ একরকম নির্বাসিত। বেশ কয় বছর হলো কোথাও কোনো ছাপা লেখা নেই তাঁর। সাহিত্যজগতের কারও সঙ্গে যোগাযোগও নেই তাঁর। তাঁর একসময়ের সুহৃদ অচিন্ত্য বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে মুনসেফের চাকরি নিয়ে চলে গেছেন কলকাতার বাইরে। তা ছাড়া জীবনানন্দের নতুন কবিতার ব্যাপারে অচিন্ত্যর আগ্রহও কমে গেছে ইদানীং। বুদ্ধদেব বসুর *প্রগতি* পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তাঁর সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ নেই অনেক দিন। বেকার মেসবাসী হারিয়ে যাওয়া এক কবি তখন জীবনানন্দ।

এই রকম এক সময়ে জীবনানন্দ একটা চিঠি পেলেন সেই সময়ের আরেক উদীয়মান আধুনিক কবি বিষ্ণু দের কাছ থেকে। বিষ্ণু দে জীবনানন্দকে জানালেন যে সে সময়ের রবীন্দ্রোত্তর নামজাদা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নতুন একটা পত্রিকা প্রকাশ করছেন *পরিচয়* নামে এবং অনুরোধ করলেন এই নতুন পত্রিকার জন্য একটা কবিতা দিতে। বেশ কিছু গল্প লিখলেও জীবনানন্দ কবিতা লেখা বন্ধ রেখেছিলেন অনেক দিন। বিষ্ণু দের কবিতা লেখার অনুরোধে চাঙা হয়ে উঠলেন তিনি। সমাজ-সংসারে নানা বিড়ম্বনার ভেতর আছেন তখন জীবনানন্দ। তবু অনেক দিন পর বসলেন কবিতা লিখতে। ইতিমধ্যে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে জীবনের নতুনতর উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন জীবনানন্দ। মূলত জীবনের ভেতর যে গোপন এক সর্বব্যাপী নিঃসহায়তা আছে, এ তাঁর সাম্প্রতিক উপলব্ধি। জীবনের এই নতুন বোধ নিয়ে তিনি এক বিস্ফোরক কবিতা লিখলেন এ সময়। কবিতায় এক শিকারের গল্প শোনালেন জীবনানন্দ। কিন্তু এ কবিতা শিকারের গল্প ছাড়িয়ে স্পর্শ করল জীবনের আরও গভীরতর স্তরকে। কবিতার নাম তিনি দিলেন, 'ক্যাম্পে'

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে!

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন!
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে;
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষ-হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার;

BanglaBook.org

তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে!
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়,—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে!
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নেই আর যেন!
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়!
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে;
এইখানে আমার নক্‌টার্ন্‌—।

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নিচে—জ্যোৎস্নায়!—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে,
হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।
ঘুমাতে পারি না আর;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে

BanglaBook.org

বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণের ডাক শুনে শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এইসব।
আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
...মাংস-খাওয়া হল তবু শেষ?
...কেন শেষ হবে?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকেনি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহরিণীর মতো?

আমার হৃদয়—এক পুরুষ-হরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে!
মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস লয়ে আমরাও প'ড়ে থাকি;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মতো—।
প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা মৃত্যু পাই;
পাই না কি?

BanglaBook.org

দোনলার শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা একা শুয়ে থেকে;
বন্দুকের শব্দ তবু চুপে চুপে ভুলে যেতে হয়।
ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন;—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে—ভেবে।
এই ব্যথা,—এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে,—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে,— মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় ঐ মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

BanglaBook.org

কবি বনের পাশে ক্যাম্প ফেলে গভীর বনে ঘাই হরিণীর ডাক শুনছেন, সেই ডাক শুনে দলে দলে ছুটে আসছে পুরুষ হরিণের দল, সেই সুযোগে শিকারি গুলি করে হত্যা করছে হরিণদের। সেই মৃত হরিণদের দেখে কবির মনে হচ্ছে, আমরা সবাই এদের মতোই। এই হচ্ছে কবিতার মূল কথা। এর আগে আমরা দেখেছি জীবন, জগৎ সবকিছুর ভেতর যে একটা গভীর অসহায়ত্ব আছে, আশ্রয়হীনতা আছে সে কথার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তাঁর গল্পে। গল্পের সেই কথাই যেন সম্প্রসারিত করলেন এই কবিতায়।

'ঘাই' একটা অসমিয়া শব্দ, যার অর্থ শিকারের টোপ হিসেবে ব্যবহৃত জ্যান্ত পাখি। এই শব্দ জীবনানন্দ শিখেছেন আসামে অতুলানন্দ কাকার কাছে বেড়াতে গিয়ে, যখন শোভনার সঙ্গে চলছে তাঁর প্রাণের খেলা। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, জীবনানন্দের এই কবিতায় রয়েছে অন্তত তিনটা স্তর। এক স্তরে এটা নেহাত একটা হরিণ শিকারের গল্প। শিকারের গল্প তো সেই ছোটবেলার মনিরুদ্দীনের কাছেও তিনি শুনেছেন অনেক, তারপর শুনেছেন অতুলানন্দ কাকার কাছে। বনের পাশে ক্যাম্প করে সে রকমই একটা হরিণ শিকারের গল্প জীবনানন্দ শোনালেন। আবার আরেকটা স্তরে এটা এক ব্যর্থ প্রেমের গল্পও। হরিণী যেন একটা টোপের মতো সারা রাত ডেকে ডেকে আকৃষ্ট করেছে তার

পুরুষ প্রেমিক হরিণকে, তারপর সেই পুরুষ হরিণ ঘাই বা টোপ হরিণের ডাকে তার কাছে আসতে গিয়ে অসহায়ের মতো নিহত হয়েছে শিকারির হাতে। আবার তৃতীয় স্তরে এই কবিতা শিকার, প্রেম ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে মানুষের মৌলিক অসহায়ত্বেরও বিবরণ। শুধু প্রেমিক-প্রেমিকা নয়, সব মানুষই এই পৃথিবীতে এসে নানা স্বপ্নের টোপে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে বেড়ায়, তারপর কোনো এক অদৃশ্য শিকারির হাতে যেন নিহত হয় তারা। যেমন গল্পে তিনি বলেছেন মৌমাছি নিহত হয় দাঁড়কাক দ্বারা, প্রজাপতির হন্তারক হয় দুরন্ত বালক।

জীবনানন্দের জীবনে ঘাই হরিণী নামক টোপ তাহলে কোনটা? শোভনার প্রেম, লাবণ্যর রূপ নাকি কবিতা আর সাহিত্য সৃষ্টির ইচ্ছা? সেসব হরিণীর ডাকে বাস্তবের কোনো চিতাবাঘের ভয় না করে তিনি ছুটে গেছেন সেই দিকে, তারপর কোথাকার কোন অদৃশ্য শিকারি তাঁকে পরিণত করেছে এক বেকার, চালচুলাহীন, অকর্মণ্য মেসবাসীতে।

দুই

অনেক দিন পর পত্রিকায় একটা ছাপা কবিতা দেখে জীবনের চারদিককার দৈন্য আর ব্যর্থতার ভেতর মনে আনন্দ এল জীবনানন্দের। কিন্তু তাঁর আনন্দ ম্লান করে দেবার জন্য ওত পেতে আছেন অনেকেই। অনেক দিন পর পত্রিকায় জীবনানন্দের একটা কবিতা পেয়ে তাঁর ওপর হামলে পড়ার দারুণ মওকা পেয়ে গেলেন তাঁর সদাপ্রস্তুত প্রতিপক্ষ সজনীকান্ত। *শনিবারের চিঠি* পত্রিকায় 'ক্যাম্পে' কবিতা নিয়ে তিনি লিখলেন, 'চোরা গাইরা যে কেবল জয়ন্তী উৎসর্গের মাঠে আসিয়া কপিলা গাই সাজেন তাহা নহে, তাঁহারা মাঠবিশেষে ভিন্ন যোনীতেও বিহার করিয়া থাকেন। সম্প্রতি 'পরিচয়' ক্ষেত্রে এইরূপ কোন বর্ণচোরা গাই হরিণীরূপে ঘাই মারিয়াছেন। কবিতাটার যদিও 'ক্যাম্পে' ধাম কিন্তু ক্যাম্পের বাইরে। কবিতাচ্ছলে কবি যে বিরহিণী ঘাইহরিণীর আত্মকথা ও তাহার হৃত্তুতো দার মর্মকথা কহিয়াছেন, তাহা পরম রমণীয় হইয়াছে।

'হৃত্তুতো দার কথা পাঠক বোধহয় বুঝিলেন না। কবি বলিতেছেন যে বনের যাবতীয় ঘাইহরিণকে "তাহার হৃদয়ের বোন" ঘাইহরিণী "আঘ্রাণ" ও "আস্বাদে"র দ্বারা তাহার "পিপাসার সান্ত্বনা"র জন্য ডাকিতেছে। পিস্তুতো মাস্তুতো ভাইবোনদের আমরা চিনি। হৃত্তুতো বোনের সাক্ষাৎ এই প্রথম পাইলাম। এবং সে ডাক শুনিয়া—

> 'একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে
> দাঁতের নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
> সুন্দরী গাছের নীচে—জ্যোৎস্নায়।

BanglaBook.org

মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে...

'ভাইয়েরা নাহয় তাদের বোনের কাছে আসিল, মানিলাম, আটকাইবার উপায় নাই—কবির তন্ময়তায় না হয় গাছও সুন্দরী হইল, বুঝিলাম—কবির ঘোর লাগিয়াছে—কিন্তু "মেয়েমানুষ" কি করিয়া নোনা হইল? নোনা ইলিশ খাইয়াছি বটে কিন্তু কবির দেশে মেয়েমানুষেরও কি জারক প্রস্তুত হয়? কবি যে এতদিনে হজম হইয়া যান নাই, ইহাই আশ্চর্য।...'

এরপর সজনীকান্ত লিখলেন, '*পরিচয়* একটি উচ্চশ্রেণীর কালচার বিলাসী ত্রৈমাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে স্নেহে অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইহাতে লিখিয়া থাকেন।

'রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা যে কাগজের সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহাতে কি প্রকার জঘন্য অশ্লীল লেখা বাহির হইতে পারে ও হয় তাহার একাধিক পরিচয় *পরিচয়* দিয়াছে। 'ক্যাম্পে' তাহার চূড়ান্ত নমুনা।'

সজনীকান্ত ঘোষণা দেবার পর 'ক্যাম্পে' একটি অশ্লীল কবিতা এই বলে বেশ একটা প্রচার-প্রচারণা হলো। ১৯৩২ সালে *পরিচয়* পত্রিকার যে সংখ্যায় 'ক্যাম্পে' কবিতাটা ছাপা হয়, সে একই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'মাঘের আশ্বাস' কবিতাটা। রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটা পড়েছিলেন এবং পড়েছিলেন 'ক্যাম্পে' কবিতাটাও। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠজন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর ডায়েরির পাতাতে লিখছেন, তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথের ওখানে গিয়ে দেখেন রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথের সাথে কথা বলছেন তাঁর *পরিচয়* পত্রিকাটা নিয়ে। প্রশান্তচন্দ্র শুনলেন রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'জীবনানন্দ দাশের ঐ "ঘাইহরিণী" কিচ্ছু হয়নি।' সুধীন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ওর মধ্যে লেখার কোন ষ্টাইল নেই, কেমন পাঁচমিশেলী।'

'ক্যাম্পে' কিচ্ছু হয়নি, 'ক্যাম্পে' পাঁচমিশেলী, কথাগুলো মনে রাখা যেতে পারে।

তিন

সাহিত্যমহলে 'ক্যাম্পে' কবিতা নিয়ে নানা রকম অপব্যাখ্যা শুরু হলে একপর্যায়ে জীবনানন্দ আগে কখনো যা করেননি তা-ই করলেন, 'ক্যাম্পে' কবিতার ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেই একটা লেখা লিখলেন। তিনি লিখলেন, 'আমার ক্যাম্পে কবিতাটি সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা দরকার মনে করি। কবিতাটি যখন লেখা হলো তখন মনে হয়েছিলো সহজ শব্দে শাদা ভাষায় লিখেছি বটে কিন্তু তবুও কবিতাটি হয়তো অনেকে বুঝবে না। বাস্তবিকই "ক্যাম্পে" কবিতাটির মানে অনেকের কাছে এতই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে যে এ কবিতাটিকে তারা নির্বিবাদে অশ্লীল বলে মনে করেছেন।

BanglaBook.org

'কিন্তু তবু ক্যাম্পে অশ্লীল নয়। যদি কোন একমাত্র স্থির সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তা জীবনের—মানুষের কীট ফড়িঙের সবার জীবনেই নিঃসহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়—ক্যাম্পে কবিতাটির ইঙ্গিত এই, এই মাত্র। কবিতাটির এই সুর শিকারী, শিকার, হিংসা এবং প্রলোভনে ভুলিয়ে যে হিংসা সফল—পৃথিবীর এইসব ব্যবহারের বিরক্ত তত নয়—বিষণ্ন যতখানি, বিষণ্ন, নিরাশ্রয়। ক্যাম্পে কবিতায় কবির মনে হয়েছে তবু যে স্থূল হরিণ শিকারীই শুধু প্রলোভনে ভুলিয়ে হিংসার আড়ম্বর জাঁকাচ্ছে না, সৃষ্টিই যেন তেমন এক শিকারী, আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তার সকল শিকার চলছে, প্রেম প্রাণ স্বপ্নের একটা ওলটপালট ধ্বংসের নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন যেন সবদিকে: King Lear এর As flies to want on boys are we to the gods. They kill us for their sport. এই আয়োজন।

'বাংলা সাহিত্যে অন্তত কাব্যে এ সুর ক্যাম্পে কবিতার এই পবিত্র কঠিন নিরাশ্রয়তার সুর, "জ্যোৎস্নার ওই মৃত মৃগদের মতো আমরা সবাই"—এই সুর আগে এসেছে কিনা জানি না। অন্তত এ সুরের সঙ্গে চলতি বাঙালি পাঠক ও লেখক যে খুব কম পরিচিত তা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে। যে জিনিস অভ্যস্থ বুদ্ধি বিচার ও কল্পনাকে আঘাত করে যা পরিচিত নয় তার অপরাধ ঢের। কিন্তু তবু অশ্লীলতার দোষে ক্যাম্পে কবিতাটি সবচেয়ে কম অপরাধী। ইংরাজি, জার্মান বা ফ্রেঞ্চে এ কবিতাটি অনুবাদ করে যদি বিদেশী literary circle এ পাঠানো যেত, তাহলে কবিতাটির যে সুরের কথা আমি ইতিপূর্বে বলেছি তাই নিয়ে বিশ্লেষণ চলতো। দু একটি prurient মন ছাড়া এ কবিতাটির ভিতর অত কিছু খুঁজে বার করবার কোনো ক্ষমতা কারু থাকতো না; prurient; মন যাদের সব সময়েই সব জায়গায়ই সব কিছুর ভিতর থেকেই নিজেদের প্রয়োজনীয় খোরাক খুঁজে বার করবার অবাধ শক্তি তাদের রয়েছে; এই তাদের একমাত্র শক্তি। এই prurient এর কাছে ক্যাম্পে অশ্লীল, আকাশের নক্ষত্রও শ্লীল নয়। শেলীর soul sister পাশ্চাত্য কবি সমালোচক ও পাঠকদের গভীর আদরের Expression কিন্তু "হৃদয়ের বোন" (এই expressionটির জন্য শেলীর কাছে আমি ঋণী)—এই শব্দ দুটি prurient অন্তঃকরণকে শুধু বুঝতে দেয় যে সে কত prurient—তার ভিতর অন্য কোন চেতনা জাগায় না। Muleykeh (একটি ঘোটকী) সম্বন্ধে Browning বলেছেন, She was the child of his heart by the day, the wife of his breast by night. না জানি Browning সম্বন্ধে prurient কি বলত।

'কিন্তু বাংলাদেশে সজনে গাছ ছাড়া আরো ঢের গাছ আছে—সুন্দরী গাছ বাংলার বিশাল সুন্দরবন ছেয়ে রয়েছে যে সজনের কাছে তা অবিদিত থাকতে

BanglaBook.org

পারে—prurient এর কাছে প্রকৃত সমালোচক অন্তরাত্মা যেমন চিরকালই অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত। বাংলাদেশের সব কবিই এই ১৯৩২ সালে কালজয়ী কবিতা যুদ্ধেরও ভিতর রয়ে যায়নি। কিন্তু হায় যদি তেমন হয়ে থাকতে পারা যেত। সহজ সরল বোধ নিয়ে সুসাধ্য সুগম পথে চিন্তালেশ শূন্যতার অপরূপ উল্লাসে জীবন কত মজারই না হতো তা হলে।'

নিজের লেখার ব্যাপারে জীবনানন্দের আস্থা বরাবর ষোলো আনা, ফলে কারও অক্ষম সমালোচনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত নন তিনি। হতে পারেন জীবনযাপনে বিপর্যস্ত কিন্তু সাহিত্যকে তিনি বরাবর রাখেন উঁচু মঞ্চে। মেডিওক্রাসিকে তিনি ভয় পান। নিজের লেখাকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ঠেলে দিয়ে বিচার করবার চ্যালেঞ্জ ছুড়বার সাহস রাখেন তিনি। এই লেখায় তাই একটা সুপ্ত রাগ আছে। কবিতাটার বহিরাঙ্গ ছাপিয়ে এর ভেতর যে জীবনের গভীর নিরাশ্রয়তার সুর তাকে তাই তিনি চোখে আঙুল দিয়ে স্পষ্ট করে তুলতে চাইলেন। সামাজিক, মানসিকভাবে জীবনানন্দ নিজেও তখন নিরাশ্রয়। তাঁর এই নিরাশ্রয়তাকে একটা দার্শনিক স্তরে নিয়ে পুরো সৃষ্টির নিরাশ্রয়তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইলেন। ব্যঙ্গ করে যে সজনেগাছের কথা তুলেছেন, সেটা যে সজনীকান্তকে মনে করেই তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ক্ষোভের বশে লেখাটা তিনি লিখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু শেষে আর কোথাও ছাপতে দেননি। অনেক বছর পর ভূমেন্দ্র গুহকে এই লেখার কথা বললে, ভূমেন্দ্র তাঁদের সম্পাদিত *ময়ূখ* পত্রিকায় লেখাটা ছাপতে চাইলে জীবনানন্দ রাজি হননি। তিনি বলেন, 'এসব করে আসলে কিছু হয় না, পাঠক নিজের মত করে সময় মত বুঝে নেবে।'

ভূমেন্দ্র বলেন, 'আপনার লেখাটা না দিলেন আমরা সজনীকান্তের সমালোচনার উচিত জবাব দিয়ে একটা লেখা লিখতে চাই আমাদের পত্রিকায়।'

জীবনানন্দ তাতেও রাজি হলেন না, বললেন, 'এসব ছেপে কি হবে? ওরা যখন থাকবেন না, আমিও থাকবো না, এবং আপনারাও নির্ঘাৎ বুড়ো হয়ে পড়বেন তখন হয়তো ব্যাপারটার এক রকমের যাথার্থ নির্ণীত হবে, হয়তো হবে না। এসব ছেপে কিছু হয় না। ছাপাবেন না।'

জীবনানন্দের এই লেখা অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পর ছাপা হয়েছিল *শতভিষা* পত্রিকায়। যখন সত্যিই তাঁরা নেই, জীবনানন্দও নেই, তারপর একদিন ভূমেন্দ্র বুড়ো হলেন তখনই বস্তুত এ কবিতার যাথার্থ নির্ণীত হলো। 'ক্যাম্পে' নামের সেই পাঁচমিশেলি কবিতা বাংলার বাঁক ফেরানো এক কবিতা হিসেবেই দেখা দিল।

BanglaBook.org

অবিরল অন্ধকারের ভেতর

এক

সাহিত্যে নিজের আত্মবিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক না কেন ব্যক্তিজীবনে তখন তাঁর ধস নেমেই চলেছে। চাকরি হারানোর পর চার বছর পেরিয়ে গেছে, নানা চেষ্টাচরিত্র করেও কোনো কাজ তিনি জোটাতে পারেননি তখনো। কলকাতার মেসে তখনো মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন জীবনানন্দ। সে সময়ের ডায়েরির দিকে আবার চোখ রাখা যাক, 'বড় পিসিমার চিঠি & its tone–Everywhere I am 'downed': my problem puzzling and vexing everyone (the greater pity).' কলকাতার মেসে বসে বড় পিসিমার চিঠি পেয়েছেন বরিশাল থেকে। চিঠিটার টোন নিশ্চয়ই মন বিগড়ে দেওয়ার। চিঠি থেকে টের পাচ্ছেন বাড়ির সবাই তাঁর অবস্থা নিয়ে খুবই চিন্তিত এবং খেপেও আছে। কতটা নিচে নেমে গেছেন তাই ভাবছেন।

'Lavanya's letter (stabbing): I might flow down the wave of this dark wind & never return.' মেসে বসে লাবণ্যর চিঠি পেয়েছেন। চিঠিতে নিশ্চয়ই খুব রূঢ় কোনো কথা ছিল। চিঠিটা একেবারে তাঁর বুকের ভেতর ছুরির মতো বিঁধেছে। মনে হচ্ছে অন্ধকারে ডুবে যাই আর ফিরে না আসি কখনো।

'I wish I would be bachelor again–Aghast when I think of the future domestic life–' তাঁর মনে হচ্ছে আবার ব্যাচেলর হয়ে যেতে পারলেই বরং ভালো হতো। বিশেষ করে যখন সংসার-জীবনের ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন, তখন এ কথা আরও বেশি করে মনে পড়ছে।

'Letter to Kristi Da & Prankristo: deep humiliation-any cat & dog.' কোনো কৃষ্টি, প্রাণকৃষ্ট প্রমুখের কাছে চাকরির আশায় চিঠি লিখেছেন জীবনানন্দ কিন্তু অপমানিত হয়েছেন কুকুর-বিড়ালের মতো।

On 'বসে থাকা'—বেকার কখনো বসে থাকে না, 'they stand & run & throb & palpitate, it is only the well-placed who have eternal charm of the easy chair or cushions, sofas & beds for them.' কেউ হয়তো জীবনানন্দকে বলেছে কোথাও চাকরি করছ না, বসে বসে কী করছ? কথাটায় রাগ হয়ে এই বসে থাকা নিয়ে ভাবছেন। বেকাররা তো বসে থাকে না। তারা দাঁড়ায়, দৌড়ায়, ছুটে বেড়ায়। কেবল ভালো অবস্থানের লোকেদের জন্যই বরাদ্দ আছে ইজিচেয়ার, কুশন, সোফা বা বিছানার অনন্ত শৌখিনতা।

সমাজ সংসার মিছে সব, 'such moods very frequent.' রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা 'সমাজ-সংসার মিছে সব, মিছে এই জীবনের কলরব'—প্রায়ই তাঁর মনে আসছে আজকাল।

BanglaBook.org

'...lovelessness of wife-preposterous of marriage, missing a girl & destroying an infant all things combined to creat the swelling tears of yesrternight:' স্ত্রীর প্রেমহীনতা, হাস্যকর একটা বিয়ে, একজন নারীকে বারবার মনে পড়া, নিজের কন্যার কথা ভেবে মনে হয়েছে একটা ছোট শিশুর জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছেন যেন, এসব কথা ভেবে আগের রাতে একা একা কেঁদেছেন।

দুই

এমন দীর্ঘ বেকারত্বে এক রকম হতভম্ব জীবনানন্দ। ডায়েরির এই ভাবনাগুলোই তখন বরাবরের মতো বিস্তারিত করে চলেছেন গল্প-উপন্যাসে। তাঁর *নিরুপম যাত্রা* উপন্যাসের চরিত্র প্রভাত কলকাতায় মেসে বসে বসে ভাবে, '...জীবনটাকে নেড়েচেড়ে দেখলাম, সংসারে যারা সফল হবে তাদের জাত আলাদা ভালবাসার চেয়ে সফলতাকেই তারা ভালবাসে বেশি—আমার ঠিক উল্টো, প্রেম, দাক্ষিণ্য, মমতার, ঘরানা গন্ধেই তৃপ্তি!...মানুষ যদি এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তা হলে জীবন তাকে মনে করে অপদার্থ শব, সময় আসে শুকুনের মত উড়ে, তাই আসে—তাই আসে...'

তারপর, '...প্রতিদিন সকালবেলা এই দুরারোগ্য ছন্দ তাকে পেয়ে বসেছে; কেরোসিন কাঠের টেবিলে ডিটমারের লণ্ঠনটা নিভিয়ে অন্ধকারের ভিতর মেসের বিছানায় শুয়ে থেকে প্রতিদিন রাতের বেলা মনে হয়েছে, এই অন্ধকারের যেন শেষ না হয় আর, এ বিছানার থেকে কোনো দিন যেন আর তাকে উঠতে না হয়।'

অন্ধকারে ডুবে যেতে চাওয়া, ঘুম থেকে আর জেগে উঠতে না চাওয়ার এই আকাঙ্ক্ষার কথা জীবনানন্দ লিখেছেন ডায়েরিতে, গল্পে। 'ক্যাম্পে' কবিতাটা লিখবার পর এ সময়ে লেখা আরেকটা কবিতা জীবনানন্দ লিখেছিলেন, যার নামই তিনি দিয়েছিলেন 'অন্ধকার'। সেই কবিতা ঠিক এই ভাবনাকে কেন্দ্র করেই। এই কবিতাটা সে সময় লিখলেও সেটা কোথাও ছাপাতে দেননি তিনি। বিশেষ করে, 'ক্যাম্পে' কবিতা নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া তিনি পেয়েছেন, তাতে এই কবিতা ছাপাবার স্পৃহা পাননি তিনি। কবিতাটা পরে হারিয়েও ফেলেছিলেন। বহু বছর পর কাগজের ফাঁকে খুঁজে পেয়ে ছাপিয়েছিলেন। সে কবিতায় তিনি লিখেছিলেন :

জানো না কি চাঁদ,
নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
জানো না কি নিশীথ,
আমি অনেক দিন—
অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে থেকে

BanglaBook.org

হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের
আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে।
হায়, উৎসব!
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভেতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া
আমাকে জাগাতে চাও কেন।

BanglaBook.org

সেই সময় জীবনযুদ্ধে লিপ্ত তিনি। কিন্তু এভাবে সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি হতে আর ইচ্ছা করছিল না জীবনানন্দের। এই পৃথিবীকে তাঁর মনে হচ্ছিল যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে উৎসব করছে। এই পৃথিবীতে জেগে থাকার বদলে কোনো এক অন্ধকার পৃথিবীতে ঘুমিয়ে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল তখন তাঁর। সময়, সূর্য, কোকিল, স্মৃতি, ঠান্ডা হাওয়া কাউকে অনুরোধ করতে বাদ রাখছেন না, তারা যেন তাঁকে সেই ঘুম থেকে না জাগায়।

তিন

কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে, সংসার, সমাজের এই পরাজয়ের ভেতরও জীবনানন্দের মনের ভেতর উঁকি দিচ্ছে তাঁর পুরোনো প্রেম, শোভনা ওরফে বেবী ওরফে Y, বিওয়াই তখন পর্যবসিত হয়েছে শুধু 'ওয়াই'তে। এ সময়ের ডায়েরির

আরও কিছু লাইন, '-Y, etc. evoking no feeling: only my struggle for settlement. ...' ওয়াইর কথা তখনো মনে পড়েছ তাঁর কিন্তু তখন আর তা কোনো বিশেষ অনুভূতি আনছে না আর। তাঁর তখনকার সংগ্রাম শুধু টিকে থাকার।

'Y's card...There was a day...now no impression: How things change: Now pity' বেবীকে কি জন্মদিনের কার্ড পাঠাবার কথা ভাবছিলেন? কিন্তু তার সঙ্গে এখন সেসব দিন আর নেই, সেটা টের পাচ্ছেন তিনি। ভাবছেন কীভাবে দিন সব বদলে যায়, এখন মনে ভালোবাসা বলে কিছু নেই, আছে শুধু করুণা।

'About Y's জন্মদিন, telephone & her silence.' বেবীর ভাবনায় মনে বিশেষ কোনো অনুভূতি আনে না বলছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করছেন। বেবীর জন্মদিনে তাঁকে ফোন করেছিলেন হয়তো। কিন্তু অপর প্রান্তে বেবীর নীরবতা।

'Y what of her?...No letter, nothing....I can imagine her in the romantic setting: kissing and kind-would be life & death to me even two years back: but now!' নিজেকেই প্রশ্ন করছেন তিনি, বেবী নিয়ে কেন এত ভাবছি আমি? তাকে নিয়ে রোমান্টিক দৃশ্যের কথা ভাবছেন, সেই চুমু এবং আরও কিছু—বছর দুয়েক আগে এসবই ছিল তাঁর কাছে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন কিন্তু এখন সেসব দূর অস্ত।

এই সময় সমান্তরালভাবে তাঁর উপন্যাসেও উঠে আসছে এমন ভাবনা। *সফলতা নিষ্ফলতা* উপন্যাসের চরিত্র নিখিল এক জায়গায় বলছে, 'যাকে ভালবাসতাম, অন্যরা একে একে এসে তাকে ভালবাসছে। সাহিত্যে যে জায়গা করে নিয়েছিলাম, তা নষ্ট হয়ে গেছে। বায়োস্কোপ থিয়েটার ফুটবল কাউন্সিলের জন্য কোনও স্পৃহাও নেই আর। হেমন্তের ধানক্ষেতের নরম ধূসর অভিজ্ঞতা জন্মেছে জীবনে—শান্ত ধূসর নিস্পৃহ পাকা অভিজ্ঞতা—মাঝে মাঝে মাইনে অর্জন করবার অধিকারটা আজ সব চেয়ে বেশি ঘৃণা করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তবুও এই ঘৃণিত জিনিসটাই প্রেমের চেয়েও আমাকে ঢের বেশী দখল করে রেখেছে যেন, আমার মৃত্যুর সময়েও এক হাতে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার—হয়তো একশ টাকার কেরানিগিরির আর এক হাতে সেই মেয়েটির আত্মনিবেদনের চিঠি—এই দুটি জিনিসের মধ্যে কোনটিকে যে ভালবাসব, বুঝে উঠতে পারছি না।'

BanglaBook.org

চার

প্রেম, সংসার এসব তো তাঁর হাত ফসকে গেছেই। চেয়ে চেয়ে দেখছেন যে সাহিত্যের জন্য সবকিছুর সঙ্গে বাজি ধরেছেন, সেই সাহিত্যের পৃথিবীতেও তাঁর কোনো স্থান নেই তখন। তাঁর সমসাময়িক লেখকদের কাছ থেকে

পাচ্ছেন অবজ্ঞা, উপেক্ষা। ত্রিশ দশকের গোড়ায় কলকাতার সে সময়ের সাহিত্যিকদের দিকে একধরনের কৌতুক, ব্যর্থতা, ঈর্ষা নিয়ে তাকাচ্ছেন তিনি। তাঁর সেই গোপন পর্যবেক্ষণগুলো রয়ে গেছে তাঁর ডায়েরিতে, 'Lucky Achin & others, prospering in every phase: in literature (কথাকাহিনী of up to date & various magazines & otherwise writings & the incessant notices & reviewes of them so much so that even to nod to me seems perhaps humiliating to the them).' অচিন্ত্যকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে জীবনানন্দের। তিনি দেখছেন, কীভাবে সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি তরতর করে বাড়ছে। অবিরাম কথাসাহিত্য লিখছেন, নানা পত্রিকায় তাঁর লেখার রিভিউ হচ্ছে। জীবনানন্দকে একটু দূর থেকে সম্ভাষণ করাও যেন তাঁর জন্য অপমানজনক এখন। অথচ এই অচিন্ত্য একদিন 'নীলিমা' কবিতা পড়ে ছুটে এসেছিলেন তাঁর কাছে। কত বিকেল একসঙ্গে হেঁটেছেন গড়ের মাঠে, তাঁকে চা, কাটলেট খাইয়েছেন।

'Premen & others enjoying ছানা & রসগোল্লা'। লিখছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র আর অন্যরা বেশ ছানা, রসগোল্লা খাচ্ছেন। অর্থাৎ বেশ অর্থ, বিত্ত, খ্যাতি জুটছে তাঁদের।

'Premen Mitra in college square: on writing & so on...more genuine than Achin.' কলেজচত্বরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে জীবনানন্দের। তাঁকে অচিন্ত্যের চেয়ে আন্তরিক মনে হয়েছে জীবনানন্দের।

'A wonder: How the asthmatic Achin & others of the type with appearently less means & planks than me stand where they stand. ' জীবনানন্দ অবাক হয়ে ভাবছেন অচিন্ত্য এবং অন্যরা তাঁর চেয়ে কম ক্ষমতা নিয়েও কীভাবে ওই অবস্থানে আছে।

'Vishnu De: mag. Board- current lit (disunity). Hankering or hunger for fame of Rabi & Pramatha even: an ironical drama.' জীবনানন্দ দেখছেন তরুণ কবি বিষ্ণু দে খ্যাতির জন্য কেমন ক্ষুধার্ত, রবীন্দ্রনাথের মতো কিংবা নিদেনপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর মতো খ্যাতি পাবার ইচ্ছা তাঁর।

'Advance' article 'Modern Bengali poetry' omitting me: tremendous shock- Elvis of poisonous propaganda- As if nothing matters- 'Keep head cool' আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে কেউ একজন প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু সেখানে জীবনানন্দের নাম নেই। ভীষণ আঘাত পেয়েছেন জীবনানন্দ। টের পাচ্ছেন বিষাক্ত প্রপাগান্ডা চারদিকে। তারপরও মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে, সে কথা ভাবছেন। যেন কিছুই হয়নি, মনের ভেতর এমন ভাব ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন।

BanglaBook.org

'Everything old musty worn out & second hand about me: literature, liberty, catalogue- Even in peorty thrust back, my anthologies & cuttings don't help me: oh were I like Sudhin Dutta controlling even the newest French journal!...' জীবনানন্দের মনে হচ্ছে তাঁর সবকিছুতেই জং ধরে গেছে—সাহিত্য, স্বাধীনতা। তাঁর কবিতা সংকলনও আর তাঁকে সাহায্য করছে না। ভাবছেন আহা সুধীন দত্তের মতো যদি হতে পারতেন। একটা নতুন ফরাসি পত্রিকার ওপরও সুধীনের কেমন হাত আছে।

'Great insult & injury both by city Coll as well as literary body: What do I prayed? Who serves me! No body, nowhere & the corruption, bulging flesh & washing away...To die thus. এই কলকাতা শহর, এখানকার লেখক-শিল্পীরা জীবনানন্দকে কী ভীষণ অপমান করল ভাবছেন। কোন ঈশ্বরের সেবা করলাম, নিজেকেই প্রশ্ন করছেন। প্রশ্ন করছেন, তাঁর কথা কে ভাবে? নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, না, কেউ না, কোথাও কেউ নেই, শুধু ফেঁপে ওঠা মাংসপিণ্ড সব...ভাবছেন বরং মরে যাওয়াই ভালো...

বলাবাহুল্য ত্রিশ দশকের গোড়ার ঠিক সেই সময়টায় বাংলা সাহিত্যের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিশ্বভ্রমণ করছেন। রাজকীয় অতিথি হয়ে তিনি ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড হয়ে জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড যাচ্ছেন। লালগালিচা সংবর্ধনা হচ্ছে তাঁর সর্বত্র। সুইজারল্যান্ড থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে যাচ্ছেন কমিউনিস্ট রাশিয়ায়, নানা সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছেন। একদিন রবীন্দ্রনাথের সমান্তরালে যদিও উচ্চারিত হবে তাঁর নাম, তবু ঠিক এই সময়টাতে জীবনানন্দ মেসের বিছানার ছারপোকা মারছেন আর পা খেতে পেয়ে পাশের বাড়ির চড়ুইয়ের রেখে যাওয়া বিস্কুট খাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে গল্প লিখছেন।

BanglaBook.org

পাঁচ

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও কোনো চাকরি পেতে যখন ব্যর্থ হলেন, তখন জীবনানন্দ ভাবতে লাগলেন যেকোনো রকম একটা কাজ পেলেই বর্তে যাবেন, শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ থাকার দরকার নেই। ডায়েরিতে লিখলেন, 'Had I been even an office typist!' একটা অফিসের টাইপিস্ট হলেও মন্দ হতো না।

'*Statesman* reporting flood: Could I be a reporter?' *স্টেটসম্যান* পত্রিকায় বন্যার কথা পড়েছেন। ভাবছেন কাগজের রিপোর্টার হলেও তো চলে।

'My own students- me...' মশাই যখন চাকরি করবেন etc. 'E.B.R and all that low- - -mean- - -dull life – story.. If I die - -my ghost: an old gurd (humor, pathos & peorty of all that)'

জীবনানন্দের এক ছাত্রও তাঁকে চাকরি দিতে চাইছে তখন, ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়েতে, গার্ডের চাকরি। পুরো ব্যাপারটা তাঁর কাছে একাধারে করুণ এবং হাস্যকর মনে হচ্ছে। এ নিয়ে একটা গল্প লেখার কথা ভাবছেন তিনি, যে গল্পে তিনি হবেন রেলের গার্ড এবং মরে গিয়েও তিনি গার্ড হয়ে ঘুরবেন। পরে তাঁর *সফলতা নিষ্ফলতা* উপন্যাসে সত্যিই এমন একটা দৃশ্য নিয়ে লিখলেন তিনি। উপন্যাসের চরিত্র বলছে, 'গার্ডের চাকরিটা নিলাম না কেন জানো? একদিন দুপুর বেলা জেগে জেগে স্বপ্নের কী অদ্ভুত খেয়ালের ছবি দেখতে লাগলাম, মনে হলো আমি গার্ড হয়েছি গার্ডগিরি করে বুড়োও হয়েছি, তারপর মরে গেছি, তবু তারপর নৈহাটি ষ্টেশনে সাদা স্যুট সাদা টুপি পরে পায়চারি করছি—

মরে গিয়েও?

হাতে একটা সবুজ ফ্ল্যাগ, সাদা সু—সাদা টুপি—আমার ভূত—কমল চুপ করে রইল।

আমি বললাম, এই হতো না কি আমার?

কত লোকে গার্ড হচ্ছে—

কিন্তু আমি গার্ড হলে এটাই হত না কি আমার, কমল?

সবুজ ফ্ল্যাগ।

সবুজ ফ্ল্যাগ—সাদা সু—সাদা টুপি।

নৈহাটি প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছ।

আমি তো সমস্ত জীবন ভরেই করেছি—তারপর আমার ভূতও করছে বটে—'

ডায়েরিতে গার্ডবিষয়ক যে করুণ, হাস্যকর এবং কাব্যময় এক দৃশ্যের কথা বলেছেন, এই দৃশ্য যেন তাই।

তার গল্পের বেকার চরিত্রদেরও ঠিক এভাবে নানা রকম কাজ খুঁজতে দেখা যায়, সেই কাজ খোঁজার আলাপের ভেতর থাকে চাপা কৌতুক মেশানো বেদনা। *কারুবাসনা* উপন্যাসের সংলাপ,

'একটা টেকনিক্যাল কিছু শেখো।'

'কোনো জবাব দিলাম না।'

'শিখে এসো।'

'টাকা নেই।'

'বেশ, তা হলে ব্যাঙ্কিং শেখো না। তাও টাকা নেই? আচ্ছা, তা হলে নিরিবিলি বসে দর্জিগিরি শেখো না কেন?'

খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কিংবা ডিমের ব্যবসা করতে পার, ছোট ডিমের?'

BanglaBook.org

'পোলট্রি ফার্মিং।'

'...পাঁচ হাজার প্রাইভেট কার, দু হাজার ট্যাক্সি, এক হাজার বাস।' চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে—'বাংলাদেশের পথে-ঘাটে এই সব ছুটছে; কত ড্রাইভার দরকার হয়, ভেবে দেখ তো! মোটর ড্রাইভারি শিখে নাও।'

ছয়

মাঝে মাঝে জীবনানন্দের তখন মনে হচ্ছে এসব চাকরি, ব্যবসা সবকিছুর ভাবনা বাদ দিয়ে তাঁর উচিত শুধু লেখায় মনোযোগ দেওয়া। সেটাই তাঁর আসল কাজ। ডায়েরিতে লিখছেন, 'Very often I think that instead of frittering away my energy, I ought to just do that for what I stand & in which I excel & delight & which in my true vocation: literature. '

এ সময় প্রায়ই তিনি ভাবছেন এভাবে নানা রকম চাকরি খুঁজে অযথা শক্তিক্ষয় না করে তাঁর শুধু সেই কাজই করা উচিত যে কাজ তিনি সবচেয়ে আনন্দের সঙ্গে করেন, ভালো করতে পারেন এবং যেখানে তাঁর সত্যিকারের ক্ষমতা, প্রেরণা : সাহিত্য... 'I–concerned from every point of view and suffering greatly materially, spiritually and what pains me infinitely-artistically...' লিখছেন বস্তুগত, আধ্যাত্মিক নানা দিকে তীব্রভাবে ভুগছেন। কিন্তু বেশি ভুগছেন শৈল্পিকভাবে।

BanglaBook.org

অস্বাভাবিক, অবৈধ মানুষ, এই আর্টিস্ট

এক

প্রশ্ন হতেই পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে, এত চেষ্টা করা সত্ত্বেও জীবনানন্দ কোনো চাকরি পাচ্ছিলেন না কেন? বেশ কয়েকটা কারণ ভাবা যেতে পারে। প্রথমত, জীবনানন্দ যখন বিয়ে করলেন ঠিক সেই সময়, ১৯৩০ দশকের গোড়ায় শুরু হয় বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝের টালমাটাল সময় তখন পৃথিবীতে। আমেরিকার শেয়ারবাজারে বড় ধস নেমেছে। তার বিরাট প্রভাব পড়েছে ইউরোপের অর্থনীতিতেও। ব্রিটেনের উপনিবেশ তখন ভারত। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য সে সময় ভারতের বাজেট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বহুগুণ। অফিসে, আদালতে, কারখানায় নতুন কোনো নিয়োগ তো দূরের কথা, বহু মানুষকে ছাঁটাই করা হচ্ছে। অল্প কিছু কাজের সুযোগ তৈরি হলে চাকরির দরখাস্তের বিশাল লাইন পড়ে যাচ্ছে।

জীবনানন্দের একটা গল্পে দেখা যাচ্ছে, কোনো এক অফিসের দুটা পোস্টের জন্য দরখাস্ত করেছেন তিন শ মানুষ। ফলে সাধারণভাবে চাকরির ব্যাপক আকাল তখন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও নতুন নিয়োগ তেমন ছিল না বললেই চলে। ফলে জীবনানন্দের জন্য সুযোগ সীমিত হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির বিজ্ঞাপনে জীবনানন্দ দরখাস্ত করলেও সেই যে এমএ পরীক্ষায় সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছিলেন, সে জন্য পিছিয়ে পড়তেন। শিক্ষকতার সামান্য যে কয়টা শূন্য পদ তৈরি হতো, তাতে দরখাস্ত করত প্রথম শ্রেণি পাওয়া ছাত্ররা। জীবনানন্দ পাস করেছেন প্রায় বছর দশ আগে, ইতিমধ্যে বহু ছাত্রই বেরিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, তাঁদের বহুজনই পেয়েছেন প্রথম শ্রেণি। ফলে ইন্টারভিউ তালিকায় নাম আর উঠত না তাঁর। এই সেকেন্ড ক্লাস পাওয়ার আক্ষেপ নিয়ে তাঁর *জীবন প্রণালী* উপন্যাসে কথা আছে সরাসরি, 'শ্রীবিলাস তোমার মতন এমএ পাশ শুধু?'

'হ্যাঁ।'

'তবে ওর চাকরী হল, তোমার হল না কেন?'

'শ্রীবিলাস এমএতে ফার্স্টক্লাস পেয়েছিল।'

'আমি তো এমএ দেবই না ভেবেছিলাম, বন্ধু-বান্ধবেরা ধরে বেধে—'

'এ রকম রুচিবিকার হল কেন তোমার? ইস, নিজের জীবনটাকে এ রকম করে নষ্ট করে দিতে হয়।'

'কয়েক নম্বরের জন্য ফার্স্ট ক্লাস পাইনি। বোধ হয় দশ কি বার—'

'ছি, মোটে এই দশটা নম্বরের জন্য তোমাতে আর ওতে এতখানি তফাৎ?'

BanglaBook.org

পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে চাকরি পাওয়ার এই কায়দা নিয়ে জীবনানন্দ ক্ষোভের কথা লিখেছেন তাঁর 'শিক্ষা, দীক্ষা, শিক্ষকতা' প্রবন্ধে, 'ফার্স্ট ক্লাস এমএ হলেই যে সে সেকেন্ড ক্লাসের চেয়ে বেশি বিদ্বান বা কুশলী শিক্ষক হতে পারে আমি তা মনে করি না...যে সব সেকেন্ড ক্লাস ডিগ্রীওলা প্রফেসর কুড়ি পঁচিশ বছর অধ্যাপনা করেছেন কিন্তু এখন বাস্তুভিটা থেকে ছিটকে পড়ে নিশ্চয়তা ও ছন্দ হারিয়ে পশ্চিম বাংলার পথে ঘাটে ফিরছেন—কোন কলেজে স্থান পাচ্ছেন না, তারা শেষ পর্যন্ত কি করবেন ভাবনার বিষয়।'

অবশ্য সেই *জীবন প্রণালী* উপন্যাসেই তাঁর চরিত্র বলে, 'কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস পেলেও শ্রীবিলাসের মত সুস্বাস্থ্য আমার কোনোদিনই হত না।'

'কি করে বলো তুমি তা?'

'শ্রীবিলাসের জলজ্যান্ত চেহারা, সে আত্মতৃপ্তিতে কথা বলে, জীবনের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তার, আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলের চেয়ে ঢের বেশি, কায়ক্লেশে

যারা পথে-পথে ঘুরছে তাদের মাড়িয়ে চলতে শ্রীবিলাস খুব ভালবাসে, জীবনটাকে যারা মাৎলার হাটে কিনে চেতলার হাটে চড়িয়ে বিকোতে পারে দিনে দু'শ বার করে, তাদের সঙ্গে শ্রীবিলাসের খুব বন্ধুত্ব—বরাবরই এই রকম।'

জীবনানন্দের ইতিমধ্যে এ উপলব্ধিও হয়েছে যে শুধু ডিগ্রি হলে চলে না, কৃতকার্য হতে হলে 'জীবনটাকে মাৎলার হাটে কিনে চেতলার হাটে চড়িয়ে বিকোতে' পারার দক্ষতাও লাগে। সেই চতুরতা জীবনানন্দের ছিল না। ফলে চেনাজানা কোনো প্রভাবশালী লোকজনের যোগসাজশ ঘটিয়ে চাকরির বিশেষ সুযোগও তিনি তৈরি করতে পারেননি। কলকাতার সিটি কলেজে, তারপর দিল্লির রামযশ কলেজে যে চাকরি পেলেন, দুটাই তাঁর বাবার ব্রাহ্মসমাজ সূত্রে। কিন্তু দুটা চাকরিই তিনি হারালেন। চাকরি টিকিয়ে রাখার জন্য যে কিছু কায়দাকানুন জানা দরকার, সেগুলোও আয়ত্তে ছিল না তাঁর। ফলে তাঁর বাবার পক্ষে ব্রাহ্মসমাজের যোগাযোগ ব্যবহার করে আর নতুন কোনো চাকরির ব্যবস্থা করার সুযোগ ছিল না। কিংবা দুবার ব্যর্থ হবার পর তিনি হয়তো আর কাউকে বলতেও কুণ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য বাংলার বাইরে দু-একটা চাকরির সুযোগ জীবনানন্দের হয়েছিল। তাঁর বাবা শিলংয়ে একটা চাকরির খোঁজ পেয়েছিলেন, তাঁর এক পিসতুতো বোন সরকারের শিক্ষা বিভাগের বড়কর্তা ছিলেন, তিনি পাঞ্জাবের অমৃতসরে একটা কলেজে চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু জীবনানন্দ এর কোনোটাই নেননি। দিল্লির চাকরির অভিজ্ঞতার সুবাদে বাংলার বাইরে চাকরি করতে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর একাধারে অনীহা এবং ভীতি ছিল। বাংলার বাইরে চাকরি করতে না যাবার ইচ্ছার কথা লিখেছেন ডায়েরিতে। তাঁর 'আকাঙ্ক্ষার জগৎ' গল্পের চরিত্রেরও তেমন ভাবনা, '...বিভূতি কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া কহিল—পেশোয়ার যাওয়ার কথা বলছো, হয়তো পঁচিশ ত্রিশ টাকার একটা কেরানিগিরির জন্য কিন্তু জীবনে টাকাই কি সব? আচ্ছা তুমি বলো উপমা, মানুষ এটা উপলব্ধি করে দেখে না যে জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে গভীর সম্ভাবনা ও সফলতার জিনিস রয়েছে তার মূল্য সমস্ত টাকার ওপরে, এই তো খুকিকে দেখছি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম রাস্তার কত বন্ধুবান্ধব রয়েছে আমার, এই সবের বদলে যদি আমি একরাশ টাকার মালিক হয়ে বসতাম...'

চাকরি বলতে তিনি মূলত এতকাল করেছেন শিক্ষকতা। শিক্ষকতা যে তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে করতেন, তা বলা যায় না। ছাত্রদের ভেতর জনপ্রিয় হতে পারেননি। শিক্ষকতার বাইরে আরও নানা রকম কাজ করারও চেষ্টাও করেছেন জীবনানন্দ। ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, ছাতার বাঁটের ব্যবসা। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের যে ধাত, তাতে ওই সব ব্যবসার ভেতর তাঁর মানিয়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপারই হতো। ইনস্যুরেন্সের এজেন্টকে তো রীতিমতো কথা ভাঙিয়েই চলতে

BanglaBook.org

হয়, তেমনিভাবে ব্যবসার একটা বড় পুঁজি কথা। অথচ জীবনানন্দ তো কথাই বলতে চাইতেন না, পারতেন না। মোট কথা, যেকোনো জাগতিক কাজে সাফল্য পেতে হলে যে ন্যূনতম সজাগ, সতর্ক একধরনের প্রবণতা দরকার, জীবনানন্দের মগ্ন ব্যক্তিত্বে সেই প্রবণতা ছিল না।

তবে সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে জীবনানন্দ বস্তুত কোনো চাকরি করতে না পারলেই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। লাবণ্য তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে জীবনানন্দ চাকরি পেতেন না কথাটা যতটা সত্য, তার চেয়ে বড় সত্য যে তিনি চাকরি করতে চাইতেন না। চাকরির দাসত্ব ব্যাপারটা তাঁকে বরাবর পীড়া দিত। জীবনানন্দ লিখেছেন :

পৃথিবীতে নাই কোন বিশুদ্ধ চাকুরী
এ কেমন পরিবেশে রয়ে গেছি সবে
বাকপতি জন্ম নিয়েছিলো যেই কালে...

জীবনানন্দের *কারুবাসনা* উপন্যাসের মূল চরিত্র নিজেকে যেভাবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, তাতে তাঁকে চিনতে অসুবিধা হয় না আমাদের। সে বলছে, 'আমার বয়স চৌত্রিশ, বার বছর আগে এমএ পাশ করেছিলাম বটে, বিয়ের আগে দু-তিনটে কলেজে অস্থায়ী কাজ করেছি—আরো অনেক কাজ করেছি; কিন্তু সংসার ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষদের জীবনের পদ্ধতির সঙ্গে কোথাও না কোথাও সম্পূর্ণ ভিন্নতা ও জটিলতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি আমি। কাজেই এমএ ডিগ্রি ও স্ত্রী-সন্তান সত্ত্বেও এই চৌত্রিশ বছর বয়সে আজও আমি সংসারী হয়ে উঠতে পারলাম না। আক্ষেপের কথা হয় ত। কিংবা আক্ষেপের কথাই-বা কেন আর? জীবন তো শুধু স্ত্রী-সন্তান নিয়েই নয়।'

'কবিতা আর কবিতা, তারপরও কবিতা' এই নামের গল্পের মূল চরিত্রকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, 'কী ভালো লাগে তোমার?'

সে বলছে, 'কলকাতার এক নির্জন কিনারে একটা সাদা একতলা বাড়ি, পড়বার কোঠা, কয়েকটা মেহগিনি কাঠের টেবিল চেয়ার, কার্পেট আর আমার দরকার মত অজস্র বইয়ে ভরা—সারাদিন লিখব পড়ব চুরুট টানব...'

এই হচ্ছে জীবনানন্দের মনের কথা। এমন একটা ভাবনা তিনি বরাবর ভেবেছেন, এমন একটা জীবন যদি পাওয়া যেত, যেখানে শুধু নিজের মতো ভাবনায় মগ্ন থেকে আর লিখে পার করে দেওয়া যায় সময়, তাহলেই হয়তো তিনি সবচেয়ে খুশি হতেন। যদি শুধু লিখেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারতেন, তাহলেই বর্তে যেতেন। একজন শতভাগ শিল্পীর জীবনই খুঁজছিলেন জীবনানন্দ।

BanglaBook.org

দুই

এই সময়েই একটা নতুন বোধোদয় হলো জীবনানন্দের। এই যে একজন শতভাগ শিল্পীর জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা, তাঁর মনে হলো সব সংকটের মূল হচ্ছে ওইখানে। তাঁর গল্প-উপন্যাসের সব চরিত্রই প্রায় বলা যায় তাঁর মতো শিল্পপ্রেমিক কিন্তু জীবন-জীবিকায় ব্যর্থ। এই সময়ে লেখা তাঁর গল্প-উপন্যাসের বেশ কিছু চরিত্রের এই উপলব্ধি ঘটে যে শিল্পসাহিত্যের প্রেম, আর্ট, এগুলোই তাদের ডুবিয়েছে, এগুলোই তাদের জীবনে সফল হতে দেয়নি। *কারুবাসনা* উপন্যাসের চরিত্র একেবারে স্পষ্ট করে বলে সে কথা, 'কারুবাসনা আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সব সময়ই শিল্প সৃষ্টি করবার আগ্রহ, তৃষ্ণা, পৃথিবীর সমস্ত সুখ-দুঃখ, লালসা, কলরব, আড়ম্বরের ভিতর কল্পনা ও স্বপ্ন চিন্তার দুর্ভেদ্য অঙ্কুরের বোঝা বুকে বহন করে বেড়াবার জন্মগত পাপ। কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট করে নিয়েছে। আমার সংসারকে ভরে দিয়েছে ছাই-কালি-ধূলির শূন্যতায়...আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের অকুতোভয় স্বাভাবিকতা ও অমিততেজা সাংসারিকতা যদি থাকত তাহলে গত ছ-সাত বছরের মধ্যে কোনো না কোনো কাজ আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পেতাম; হয়ত কোনো ইস্কুলে পঁচিশ টাকার মাস্টারি নিতাম, কোনো মেসের সরকার হয়ে যেতাম হয়ত, লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একদিনে হয়ত প্রদীপ জ্বালিয়ে ফেলতে পারতাম, দর্জির কাজ শিখে ফেলতাম কিংবা স্টেনোগ্রাফার হয়ে যেতাম, নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতায় ক্যানভাস করতাম হয়ত, কিংবা প্রাণপণে শেয়ার বিক্রি করতাম, হয়ত মুদির দোকানের মালিক হয়ে বসতাম, কিংবা-দুতিন গ্রুপে এমএ নিয়ে ফেলতাম, হয়তো নিদারুণ একনিষ্ঠতার সঙ্গে জেলে পচতাম, কিংবা ভ্রুক্ষেপহীন অক্লান্তিতে পথে পথে জুতো সেলাই করে চলতাম...আলুর আড়ৎ না-খুলে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাচ্ছি বলে মনের ভিতর কোনো বেদনা থাকত না। যদি আমি বিবাহ না করতাম, সন্তান না হত আমার, যদি একা থাকতাম আমি—তা হলেও শিল্পসৃষ্টি ভালবেসে, সংসারে বিফল হয়ে, মনের ভিতর কোনো নিরবচ্ছিন্ন বেদনা থাকত না। হয়ত খুব লঘুভাবে থাকত। কিন্তু কল্যাণী ও খুকির ভার এমন একজনের উপর পড়েছে, যে, না পারে ঐকান্তিকভাবে শেয়ার ক্যানভাস করে বেড়াতে, না পারে ঘোলের শরবতের দোকান খুলে লক্ষ্মীকে অধিকার করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাতে...একখানা গল্পের বইয়ের সাংসারিক দাম যে তেমন কিছু নয়, একখানা কবিতার বইয়ের দাম যে আরো ঢের কম তা তাকে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সংসার; কিন্তু তবুও সমস্ত কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সংসারের ছককাটা উন্নতির পথে পরিপূর্ণ অন্তর্ধান করবার মত স্বাভাবিকতা কোনোদিনই সে অর্জন করতে পারে না। এমনই অস্বাভাবিক অবৈধ মানুষ সে, এই আর্টিস্ট...'

BanglaBook.org

প্রেতিনীর রূপকথা উপন্যাসের চরিত্রও বলছে, 'ছোটবেলায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি কেমন আসক্তি জন্মাল আমার—সেই থেকেই জীবনটা আমার নষ্ট হয়ে গেল...এখন অবিশ্যি বৈষ্ণব কবিতা চাপা পড়ে গেছে; মাঝে-মাঝে ডন ভাল লাগে, মাঝে-মাঝে হুইটম্যান, এ্যালেন, পো, কিংবা শেক্সপিয়ার-এর সনেট—কিন্তু এই সব করেই সাংসারিক জীবনটা খোয়া গেল আমার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হলেও ভাল হত, কিন্তু পাশ করলাম ইংরেজি লিটারেচারে এমএ। এখন এ বয়সেও আমার জুতো সেলাই শিখতে ইচ্ছা করে...'

আমরা চারজন উপন্যাসে চরিত্র বলছে, 'ট্রামের কন্ডাক্টর যে হতে চাই না তা নয়; জুতা বুরুশ হতেও আপত্তি নেই, রিকশা টানতে রাজী আছি। আমরা যে অনেকদিন পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিতে পড়েছিলাম, এমএ পাশ করেছি, আমাদের কেউ কেউ যে প্রাইজ পেয়েছি—এ সমস্তই আমরা নির্বিঘ্নে গিলে ফেলতে রাজি আছি—জুতা বুরুশ করে দু পয়সা কামাতে আমারা তিনজন সব সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের একটা বিপদ রয়েছে এই যে, অল্প বয়স থেকেই অত্যন্ত অশুভ ক্ষণে গভীর অভিজ্ঞতার গল্প ও জীবনের ভাব প্রতিভা প্রকাশ করেছে ভালো ভাষায় যে সব লেখা—সেগুলোকে ভালোবেসেছিলাম; আমরাও অনুভব করেছি যে আমরা যা দেখেছি জেনেছি, তা রাস্তার লোকের কাছে রাস্তার লোকের মত ব্যক্ত না করে এমন ভাবে বলব যে, তার ভেতর সত্যের স্ব-ভাষিকতা আরো বেশী থাকবার জন্যই তা বেশী সুন্দর হচ্ছে বলে মনে হবে। (এবং) লেখাকে আমরা খুব গভীর কাজ বলে মনে করেছি, জুতা বুরুশ করা বা রিকশা টানার চেয়ে এ হীন নয়—বেশী পরিশ্রম ও সাধনা সাপেক্ষ, পৃথিবীর অনেকেই এ কথা স্বীকার করতে চায় না—কিন্তু আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। এই হচ্ছে আমাদের বিপদ।'

জীবনানন্দের একটা গল্পের নামও রয়েছে 'আর্টের অত্যাচার'। সেই গল্পের চরিত্র ভাবছে, 'বোর্ডিং-এর রুমে একা থেকে সে ভেবেছে কবি না হয়ে টেনিস খালোয়াড় হলে জীবনটা কত মুখর হত তার। কোনো চিন্তা তাকে বাধা দিত না। কোন শব্দের রাশি এসে হৃদয়ে আঘাত করে বসত না। আমাদের সাজাও, আমাদের সাজাও, আমরা নগ্ন কুৎসিত হয়ে পড়ে আছি, তুমি সাজাতে জান, তোমাকে আমরা চিনি। তুমি শৃঙ্খলার ওস্তাদ, তুমি আমাদের তুলে ধরো—তোমার হাতে আমরা সুন্দর হব। নিখিলের চোখে জল আসত না বরং সে টেনিসের র‍্যাকেট ছিঁড়ে গেলে একটু অসোয়াস্তি পেত, র‍্যাকেট মেরামত করে কত খুশি হত সে। ওই খোলোয়াড় দুটির মত কাল সারারাত ভরে চিৎকার করতে পারত সে। জীবনের না জানি কোন অনাবিষ্কৃত আস্বাদন। সে কবি। জীবনকে সে নাকি বোঝে। বোঝে বটে কিন্তু আস্বাদন করতে পারে কোথায়!...অথচ এই ছেলে দুটোর আমোদ তো নিতান্ত সামান্য। তবু তারা কবি নয়, আর্টিষ্ট নয়, পৃথিবীর অসংখ্য সামান্য আনন্দে তাদের

BanglaBook.org

জীবন কি নিশ্চিন্ত, তাদের বিচ্ছেদ আছে বটে, মৃত্যু আছে মানুষের সমস্ত দুঃখ তাদেরও সহ্য হয় কিন্তু তবুও এ অত্যাচার তারা জানে না। নিখিল ভাবে, লক্ষ লক্ষ লোকের থেকে বেছে নিয়ে এই যে চিন্তার পর চিন্তা অজস্র উৎশৃংখল শব্দের পর শব্দ সঙ্গে করে নিয়ে এসে দিনের পর দিন তার বুকে এই যে আঘাত করতে থাকে, নিজের এই রূপ হতে চায়—কী গভীর অত্যাচার এই।...এরা জানে না শব্দের অত্যাচার কাকে বলে, হাজার হাজার শব্দের ভিতর থেকে একটিকে বেছে নিতে রাতের পর রাত কেটে গিয়েছে না?...আর্ট মানুষকে না দেয় সুখ না দেয় সোনা। আর্ট যার জন্য সমস্ত সাধারণ উদ্দেশ্য ও আস্বাদের থেকে সে বহুদিন আগেই সরে এসেছে যাকে বুঝতে ধরতে বিশ্বাস করতে গিয়ে সকলের সহানুভূতি হারিয়ে বসেছে নিখিল। আজ সব খুইয়ে দিয়েছে সব। আর্ট আজ নিখিলকে একটা পয়সার মত পুরষ্কার দিল না, এ রুমে বসে যদি যে শুকিয়ে ঘষটে মরে যায় তার মরা শরীরটাকে লাথি দিয়ে যদি তারা অপমান করে, নর্দমায় ফেলে দেয়, যদি তাকে কুকুরের মত বিচার করে তাহলে আর্টের কড়ে আঙ্গুলে গিয়েও সে সব লাগবে না।'

আর্টের ওই অত্যাচারে কাবু হয়ে জীবনানন্দ তখন কলকাতার পথে পথে একটা হারিয়ে যাওয়া হাঁসছানার মতো ঘুরছেন। ইতিমধ্যে বিয়ের পর দিল্লির চাকরি হারাবার পর এক এক করে পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু কোনো দিকে কোনো সুরাহা হলো না তাঁর। জীবিকা, সংসার আর লেখালেখি এই তিনটার কোনো সমীকরণই মিলছে না তখন তাঁর জীবনে। জীবনানন্দ আপাদমস্তক আশ্রয়হীন তখন। একটা আশ্রয় খুঁজছেন তিনি, মনের আশ্রয়, যেখানে সব জাগতিক হিসাব-নিকাশের বাইরে গিয়ে প্রাণ মেলে দেওয়া যাবে। মা-বাবা তাঁর মঙ্গল কামনা করছেন জানেন কিন্তু তাঁদের কাছে সেই প্রাণের আরাম পাবার পরিস্থিতি তো নেই তখন, সাংসারিক বিপাকে বিপন্ন বিরক্ত লাবণ্যর কাছে সেই আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা তো মিটে গেছে আগেই, যাকে ভালোবাসতেন সেই শোভনা এখন নাগালের অনেক অনেক বাইরে, সাহিত্য-পৃথিবীতেও তাঁর কোনো একান্ত বন্ধু নেই।

BanglaBook.org

কাকের তরুণ ডিম পিছলায়ে পড়ে

এক

নিরালম্ব এই কলকাতার জীবনে এ সময় হঠাৎ তাঁর মনের আশ্রয় হয়ে উঠল বাংলার প্রকৃতি। তিনি কলকাতার মেসের ওই কংক্রিটের নিরেট বেকার জীবন থেকে মনে মনে ছুটি নিয়ে হাজির হলেন তাঁর আজন্ম চেনা নিমপাখি, বঁইচি,

জলাঙ্গীর দেশে। তাঁর সেই বরিশালে। প্রকৃতির ভেতর তিনি যেন খুঁজে পেলেন বেঁচে উঠবার, বেঁচে থাকবার নতুন প্রেরণা। একটা ঘোরের ভেতর জীবনানন্দ এ সময় অনেকগুলো সনেট লিখে ফেললেন। সেসব সনেটে শুধু বাংলার প্রকৃতির অনুপুঙ্খ বর্ণনা আর সেই সঙ্গে বাংলার যুগ-যুগান্তের ইতিহাস। জীবনানন্দ সেই প্রকৃতিকে এমনভাবে অক্ষরে বন্দী করলেন, যেন তিনি তৈরি করছেন এক অক্ষরের মিউজিয়াম। লিখেছেন এমনভাবে, যেন কোনো দিন যদি কোনো এক অ্যাটম বোমার আঘাতে বাংলা নামের এই দেশ ধ্বংস হয়ে যায়, যদি বাংলা বলে কোনো দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে আর না থাকে, তাহলে কোনো এক অনাগত কালের মানুষ যেন এই কবিতাগুলো পড়তে পড়তে চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মতো দেখতে পায় এই দেশটাকে। জীবনের ওই নাজুক পর্বে বাংলার প্রকৃতিকে নতুন করে যেন আবিষ্কার করলেন জীবনানন্দ। লিখলেন একের পর এক নেশা ধরানো কবিতা :

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে—সবচেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে সবুজ ডাঙা ভ'রে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল;
সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল, অশ্বত্থ, বট, জারুল, হিজল;
সেখানে ভোরের মেঘে নাটার রঙের মতো জাগিছে অরুণ;
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে,—সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;
সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল,
সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ধানের গন্ধের মতো অস্ফুট, তরুণ;

সেখানে লেবুর শাখা নুয়ে থাকে অন্ধকারে ঘাসের উপর;
সুদর্শন উড়ে যায় ঘরে তার অন্ধকার সন্ধ্যার বাতাসে;
সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের 'পর—
শঙ্খমালা নাম তার : এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো বিশালাক্ষী দিয়েছিল বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

তাঁর মনে হয় এই বাংলার আমের পাতার ঘুমন্ত কাঁচপোকার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেই বুঝি মধুর শান্তি আসবে তাঁর জীবনে :

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে;
তখনো যৌবন প্রাণে লেগে আছে হয়তো বা—আমার তরুণ দিন
তখনো হয়নি শেষ—সেই ভালো—ঘুম আসে—বাংলার তৃণ

BanglaBook.org

আমার বুকের নিচে চোখ বুজে—বাংলার আমের পাতাতে
কাঁচপোকারা ঘুমায়েছে—আমিও ঘুমায়ে রবো তাহাদের সাথে,
ঘুমাব প্রাণের সাধে এই মাঠে—এই ঘাসে—কথাভাষাহীন
আমার প্রাণের গল্প ধীরে ধীরে মুছে যাবে—অনেক নবীন
নতুন উৎসব র'বে উজানের—জীবনের মধুর আঘাতে

আরও লিখলেন

পৃথিবীর পথে আমি বহুদিন বাস ক'রে হৃদয়ের নরম কাতর
অনেক নিভৃত কথা জানিয়াছি; পৃথিবীতে আমি বহুদিন
কাটায়েছি; বনে বনে ডালপালা উড়িতেছে—যেন পরী জিন
কথা কয়; ধূসর সন্ধ্যায় আমি ইহাদের শরীরের 'পর
খইয়ের ধানের মতো দেখিয়াছি ঝরে ঝর ঝর
দু'-ফোঁটা মাঘের বৃষ্টি,—শাদা ধুলো জলে ভিজে হয়েছে মলিন,
ম্লান গন্ধ মাঠে ক্ষেতে...গুবরে পোকার তুচ্ছ বুক থেকে ক্ষীণ
অস্পষ্ট করুণ শব্দ ডুবিতেছে অন্ধকারে নদীর ভিতর

এই সব দেখিয়াছি; দেখিয়াছি নদীটিরে—মজিতেছে ঢালু অন্ধকারে;
সাপমাসী উড়ে যায়, দাঁড়কাক অশ্বত্থের নীড়ের ভিতর
পাখনার শব্দ করে অবিরাম; কুয়াশায় একাকী মাঠের ঐ ধারে
কে যেন দাঁড়ায়ে আছে : আরো দূরে দু'একটা স্তব্ধ খোড়ো ঘর
প'ড়ে আছে; খাগড়ার বনে ব্যাং ডাকে কেন—থামিতে কি পারে;
(কাকের তরুণ ডিম পিছলায়ে প'ড়ে যায় শ্যাওড়ার ঝাড়ে।)

নদীর পাড়ে অন্ধকার, জিন-পরির গায়ে বৃষ্টি নামছে, উড়ে যাচ্ছে সাপমাসি, নদীর পাড়ে অন্ধকারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাঙ ডাকছে, বাসা থেকে কাকের ডিম ধীরগতিতে পড়ে যাচ্ছে শ্যাওড়ার ঝারে, এমনি এক আধিভৌতিক জগতে তখন জীবনানন্দ ডুব দিয়েছেন। তাঁর এসব কবিতা নেহাত প্রকৃতির বর্ণনা নয় যেন, এ এক ডুবতে বসা মানুষের বেঁচে উঠবার আকুতি, তার আদিম ভালোবাসার মেনিফেস্টো। লক্ষ্য করবার, প্রকৃতি আর প্রাণিকুলের সঙ্গে পৃথিবী ভাগাভাগি করে বসবাস করার যে দাবি উঠেছে পরিবেশবাদীদের কাছ থেকে আজকাল, সে দাবি নিভৃতে তুলে গেছেন জীবনানন্দ বহুকাল আগেই। শুধু মানুষকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়বার বিরোধিতা করেছেন তিনি। তেমনি নিজ দেশের প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন জাত্যভিমান। জীবনানন্দ বলেছেন, 'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও/ আমি এই বাংলার পাড়ে রয়ে যাব,

BanglaBook.org

দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে...' অন্য পৃথিবীর দিকে যাদের চোখ তাদের প্রতি তাঁর কোনো অভিযোগ নেই, তিনি শুধু নিজের সিদ্ধান্তের কথা বলছেন। তিনি বলছেন না 'সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি' বলছেন তাঁর দেশ 'সবচেয়ে সুন্দর করুণ'।

দুই

একজন পাঠকের কাছে চিঠিতে জীবনানন্দ এই কথাটাই লিখেছেন একসময়, বলেছেন যে জীবনের নানা বিড়ম্বনার ভেতর যখন তিনি একধরনের রুদ্ধশ্বাস সময় কাটাচ্ছিলেন, তখন আবহমান বাংলা আর বাঙালির এই জীবন, প্রকৃতি, ইতিহাসের ভেতর ডুব দিয়ে তিনি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন। অক্ষরের ভেতর দিয়ে এভাবে একেবারে বাংলার নাড়ির ভেতর ঢুকে তিনি শ্বাস নিচ্ছিলেন তখন। সেই চিঠিতে জীবনানন্দ জানিয়েছেন যে ধারাবাহিকভাবে লিখিত এই কবিতাগুলো 'প্রত্যেকে আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপর পক্ষে সার্বিক বোধে এক শরীরী, গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ প্রসূতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর...' বাংলাকে নিয়ে লেখা এই কবিতাগুলোও জীবনানন্দ ছাপাননি কোথাও। আরও অনেক লেখার মতো সযত্নে রেখে দিয়েছেন তাঁর সেই কালো ট্রাঙ্কে। তবে সনেটগুলো নিয়ে একটা বই বের করবার কথা ভেবেছিলেন তিনি, নামও ঠিক করে রেখেছিলেন 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা'। কেন এমন নাম দিতে চেয়েছিলেন তিনি? সে কি এই কারণে যে নগরায়ণের চাপে বাংলার সেই মৃদু প্রকৃতি আপিলে তখন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আছে? জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর সেই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হলো কলকাতার বিখ্যাত প্রকাশনা সিগনেট প্রেসের উদ্যোগে। তবে জীবনানন্দ প্রস্তাবিত নাম গেল বদলে। সিগনেট প্রেসের মালিক দীলিপ কুমার বললেন 'বাংলার ত্রস্ত নীলিমা' নামটা বড় ভারী। তিনি বইটার নাম দিলেন *রূপসী বাংলা*। ঘটনা শেষে এই দাঁড়াল যে বৃহত্তর পাঠকের কাছে জীবনানন্দ একদিন পরিচিত হলেন রূপসী বাংলার কবি হিসেবেই।

জীবনানন্দের জানবার কথা নয় যে যখন তিনি এই পৃথিবীতে নেই, তখন তাঁর চেনা বাংলার নীলিমা অনেকগুলো দিন, মাস বাস্তবিকই ভীষণ ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। ত্রস্ত হয়েছিল অন্য এক কারণে। কারণ, তাঁর সেই প্রিয় বাংলার মাটি, নদী, আকাশে তখন শেল, মর্টার, মেশিনগানের তাণ্ডব। একটা ব্যাপক যুদ্ধ বেধেছিল এখানে। নিভৃতচারী এই কবির নাম তখন উচ্চারিত হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। জীবনানন্দ জানবার সুযোগ পাননি যে বরিশালসহ পূর্ব বাংলার রণাঙ্গনে স্টেনগান হাতে মুক্তিযোদ্ধারা তখন গেয়েছেন, 'বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের

BanglaBook.org

বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপের যে তার নেইকো শেষ, বাংলাদেশ।' যুদ্ধ মানে তো শুধু অস্ত্রের দাপট নয়, যুদ্ধ মানে দেশের জন্য মায়াও। তাঁর কবিতা দেশের জন্য সেই মায়া জাগিয়েছিল সবার মনে। তারপর একটা রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের শেষে একদিন সেই কাঁঠাল পাতা ঝরার দেশে ফুটে উঠেছে নতুন এক দেশ, বাংলাদেশ।

আকাশের ওপারে সহসা নতুন আকাশ

এক

মানুষ, সমাজ ছাড়িয়ে যখন তিনি প্রকৃতির ভেতর আশ্রয় খুঁজছেন, যখন বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করবার একটা পথ পেয়েছেন, তখনই পাশাপাশি পেলেন এক সুসংবাদ। যে বছর বিয়ে করলেন, সেই ১৯৩০-এ হারিয়েছিলেন তাঁর দিল্লির চাকরি। তারপর দীর্ঘ পাঁচটা মর্মান্তিক বছর কাটিয়ে অবশেষে একটা নিয়মিত চাকরি পেলেন তিনি ১৯৩৫-এ। দীর্ঘ উতরাইয়ের পর যেন পেলেন একটা চড়াইয়ের পথ। চাকরিটা পেলেন অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ইংরাজির লেকচারার ছিলেন তাঁরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী মন্মথ ঘোষ। তিনি দিল্লির একটা কলেজে চাকরি পেয়ে চলে গেলে তাঁর পদটা শূন্য হয়, মন্মথ নিজে এই চাকরিটা যাতে জীবনানন্দের হয়, তার জন্য জোর তদবির করলেন কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। জীবনানন্দের বাবা, দাদাও বরিশালের মান্য ব্যক্তি, পরিচিতি আছে তাঁদের। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জীবনানন্দের অনুকূলে গেল এবং ব্রজমোহন কলেজে লেকচারার পদে নিয়োগ পেলেন তিনি। জীবনানন্দ ফিরে এলেন তাঁর প্রিয় শহর বরিশালে, যেখানে তাঁর প্রিয় নদী ধানসিড়ি, সেই সবচেয়ে সুন্দর করুণডাঙায়।

গুমোট এতগুলো বছর কাটাবার পর একটা সুবাতাস বইল তাঁর জীবনে। নিজ শহরে একটা সম্মানীয় চাকরি অবশেষে মিলেছে, এতে তাঁর বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন সবার মনে স্বস্তি। লাবণ্যও চাঙা হয়ে উঠলেন। নতুন রূপে দেখা গেল তাঁকে। লাবণ্য আবার পড়াশোনা করতে চাইলেন। উৎসাহ দিলেন জীবনানন্দ। লাবণ্য ভর্তি হলেন ব্রজমোহন কলেজেই বিএতে। জীবনানন্দও অনেক দিন পর আবার ফিরে এলেন তাঁর পুরোনো রুটিনে। নিপাট পাঞ্জাবি, ধুতি, পাম্প শু আর কাঁধে একটা চাদর ঝুলিয়ে কলেজে যান, ক্লাস নেন। এখানে দিল্লির রামযশ কলেজের মতো উদ্ধত, বেপরোয়া ছাত্ররা নেই, তারা ইংরাজি বা

BanglaBook.org

হিন্দিতে নয় কথা বলে তাঁর প্রিয় বাংলায়। পেয়ে গেলেন তাঁর কবিতার অনুরাগী কিছু ছাত্র। ক্লাসে তাঁর ছাত্র শামসুদ্দীন আবুল কালাম, যিনি নিজেও পরবর্তী সময়ে হয়ে উঠবেন সফল সাহিত্যিক, কথা বলেন জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে। জানতে চান, 'স্যার, এই যে আপনার লাইন, "আগুন বাতাস জল ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে হয়ে... এতবার ব্যবহৃত কেন?"' নিজের কবিতা নিয়ে ছাত্রের সঙ্গে আলাপে আনন্দ হয় জীবনানন্দের, বেশ উৎসাহের সাথে বলেন, 'এ তো ধরো বহু ব্যবহারের একঘেয়েমি, মনোটনি এসব বোঝাতেই...'

দুই

অনেক দিন পর জীবনে খানিকটা স্বস্তি আসাতে তাঁকে দেখা গেল বেশ আমোদে মেজাজেও। এ সময়ে একদিন বরিশালে বেড়াতে এলেন অচিন্ত্যকুমার। অচিন্ত্য তখন পিরোজপুরের মুনসেফ। অচিন্ত্যকে পেয়ে অনেক দিন পর তুমুল আড্ডা দিলেন জীবনানন্দ। খোশমেজাজে আড্ডা দিতে দিতে অনেক দিন পর সিগারেট টানলেন অচিন্ত্যের সঙ্গে। মন ভালো থাকলে একসময় এমন সিগারেটে টান দিতেন তিনি। ঠাট্টা-তামাশার মুডেও দেখা গেল তাঁকে। আনন্দের মুডে থাকলে তিনি কথা বলতেন বরিশালের কথ্য ভাষায়।

একদিন কুসুমকুমারীর বাবা জীবনানন্দের দাদু চন্দ্রনাথ দাশ হঠাৎ এসে পড়েছেন বরিশালের বাড়িতে। এসে পুকুরঘাটে গিয়ে গোসল করলেন চন্দ্রনাথ। কিন্তু লুঙ্গি আনতে ভুলে গেছেন। কী আর করা। পুকুরঘাট থেকে লাবণ্যকে ডাকতে লাগলেন, 'বউমা, তোমার একটা শাড়ি দাও তো।' লাবণ্য তাঁর একটা শাড়ি এনে দিলেন চন্দ্রনাথকে। চন্দ্রনাথ সেটাকেই লুঙ্গির মতো পরলেন। চন্দ্রনাথকে ওই বিচিত্র পোশাকে দেখে মুচকি হাসতে হাসতে জীবনানন্দ বরিশালি টানে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শাড়ির পাড় পছন্দ হইছে চন্দরনাথর? চুল আঁচড়নের কাঁকই পাইছ? তোমারে আর কি দেওন যায় কও?'

চন্দ্রনাথ নিজে কবি, হাসির গান লিখে কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি একদিকে জীবনানন্দকে আর অন্যদিকে লাবণ্যকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন :

বাজার হুদা কিনা আইন্যা ঢাইলা দিছি পায়
তোমার লগে কেমতে পারুম হইয়া উঠছে দায়।
আরশি দিছি, কাঁকই দিছি, চুল বাঁধনের ফিতা দিছি,
বালিয়াড়ি চুড়ি দিছি, আর কি দেওন যায়?
বুড়া বুড়া কইয়া কেবল, খ্যাপাইয়া ক্যান কর পাগল?
বিয়া যহন করছ অহন ফ্যালবা কেমতে কইয়া দাও আমায়।

তাঁদের বরিশালের বাড়িতে কাজ করতেন দরিদ্র খ্রিষ্টান বৃদ্ধা ঝি সুন্দরমালা।

BanglaBook.org

সুন্দরমালার জন্য জীবনানন্দের বাবা বাড়ির পাশে একটা ছোট ঘর তুলে দিয়েছিলেন। সুন্দরমালার দাঁত সব পড়ে গিয়েছিল, হাঁটতেনও কুঁজো হয়ে। প্রতি রোববার সুন্দরমালা পাশের অক্সফোর্ড মিশন গির্জায় যেতেন প্রার্থনা করতে। সেখানে এক তরুণ পাদরি ফাদার হ্যাভোক নতুন বাংলা শিখে তাঁকে প্রায়ই বলতেন, 'প্রভু যিশু বলসেন সকোলকে প্রেম করটে। টাই হামিও টোমাকে প্রেম করি। সুন্ডরমালা সট্টিই হামি টোমাকে প্রেম করি।'

সুন্দরমালা এ কথা সবাইকে গল্প করলে, পাড়ার কিছু ছেলে তাকে বোঝায় যে ফাদার হ্যাভোক আসলে তাঁকে ভালোবাসে, সে যদি রাজি হয় তাহলে তাঁকে বিয়েও করবে।

জীবনানন্দ একদিন পেয়ে বসলেন তাঁকে, 'সুন্দরমালা হুনলাম ফাদার হ্যাভোক তোমার লাইগ্যা দাঁত বাঁধাইতে দেছে। ফোকলা দাঁতে তো আর বিয়ে বয়ন যায় না? তা তোমার হেই নকল দাঁতের খবর কি?'

সুন্দরমালা হেসে বলেন, 'হ্যাবোইগ্যারে মরন দহায় পাইছে। দেহা করনের লেইগ্যা যত চ্যাষ্টাই করি না ক্যান, হেডায় কি দেহা দেয়? না হামনে আহে, ক্যাবল আড়ালে আবডালে রয়। রও হেডারে একবার পাইয়া লই। হ্যার মতিগতি ভাল কইরাই বুইঝ্যা লইমু। বিয়া করনের ফিকির দেহায়—কাজের কালে ঢন ঢন। বড় ফাদাররে কইয়া দেহাইমু নে মজাডা?'

নিজ শহরে, নিজ ভাষার, নিজ পরিমণ্ডলে যেন নতুন একটা জীবন পেয়েছেন তখন জীবনানন্দ। কলকাতার দুর্বিষহ দিনগুলো ভুলে থাকতে চাইছেন তিনি।

BanglaBook.org

তিন

ঠিক এ সময়টাতে কলকাতা থেকে একটা চিঠি পেলেন জীবনানন্দ। লিখেছেন তাঁরই একান্ত অনুরাগী বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে চলে এসেছেন কলকাতায়। চিঠিতে আরও একটা সুসংবাদ। তিনি জানিয়েছেন, *প্রগতি* পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার পর কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে মিলে তাঁরা এবার নতুন একটা পত্রিকা বের করছেন *কবিতা* নামে। এ পত্রিকায় শুধুই কবিতা ছাপা হবে। বুদ্ধদেব লিখলেন *প্রগতি* পত্রিকার মতোই *কবিতা* পত্রিকার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে তাঁর জন্য।

জীবনানন্দ যেসব পত্রিকায় কবিতা লিখছিলেন, আগে সেগুলো সব ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস লিখলেও গত পাঁচ বছরে লিখেছেন একটামাত্র কবিতা 'ক্যাম্পে', যা নিয়ে ঘটে গেছে বিতর্ক। বুদ্ধদেবের এই আহ্বানে আবার তিনি মনের ভেতর খুঁজে পেলেন কবিতার উত্তাপ। অনেক দিন পর জীবনে একটু সুস্থিরতা এসেছে তাঁর, তছনছ হয়ে যাওয়া জীবনটাকে আবার একটু গুছিয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছেন। আবার

পুরোদমে ফিরে আসতে চাইলেন সাহিত্যের পৃথিবীতে। নতুন উদ্যোগে হাত খুলে আবার কবিতা লিখতে শুরু করলেন জীবনানন্দ। এবার তাঁর মনে ক্লান্তি নয়, অন্ধকার নয়, গ্লানি নয় জেগে উঠল প্রেম। এ সময়ে যে কবিতাগুলো লিখতে শুরু করলেন, তার প্রধান থিম হলো প্রেম। তাঁর হারিয়ে যাওয়া প্রেম, হারিয়ে যাওয়া প্রেমিক। এসব কবিতায় দেখা যায় একটা আহত প্রেমের বোধ বরাবর যেন তাড়া করে ফিরছে তাঁকে। শোভনা যে তাঁর মন থেকে কখনোই মুছে যাননি, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে আগেই। তাঁর এই আহত প্রেমের নতুন কবিতাগুলোর নেপথ্যে যে শোভনা আছে, তা ভেবে নেওয়া যায় সংগত কারণেই। বাস্তব জীবনে সেই শোভনা, বেবী, বিওয়াই, অথবা ওয়াই ইতিমধ্যে স্বামী সংসার নিয়ে আছেন দূরের এক শহরে। জীবনানন্দের এই সময়ের কবিতায় প্রেমাস্পদকে না পাওয়ার গাঢ় বেদনা :

আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি!
আবার বছর কুড়ি পরে—
হয়তো ধানের ছড়ার পাশে
কার্তিকের মাসে—
তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে—তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে

অথবা নাইকো ধান ক্ষেতে আর;
ব্যস্ততা নাইকো আর,
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল!

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—
তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার!

লিখলেন

বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রানের অন্ধকারে

BanglaBook.org

ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মত প্রাণে।

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার!
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মত—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার!
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

প্রেমিকাকে হারিয়ে ফেলার এই বেদনা আশ্চর্য মেদুরতায় ফিরে ফিরে আসে তাঁর সে সময়ের কবিতায় :

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

কে সেই রাঙা রাজকন্যা, আমরা তা আঁচ করতে পারি। প্রেমিকার সঙ্গে তাঁর অন্য পুরুষের সঙ্গ দেখে ঈর্ষান্বিত তিনি। কোনো এক সুরঞ্জনাকে উদ্দেশ করে তিনি বলছেন :

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে!

BanglaBook.org

শেষ এই লাইনটার নাটকীয়তা অদ্বিতীয়। একবার জিজ্ঞাসা করছেন ওই যুবকের সঙ্গে তোমার কী কথা? যুবককে 'আপনি' করে বলছেন। তারপর একটা ড্যাশ। যেন একটু থেমে নিচ্ছেন। এরপর ভদ্রতার লেবাস ছেড়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি 'আপনি' থেকে নেমে এসেছেন 'তুমি'তে। জিজ্ঞাসা করছেন, 'তার সাথে কি কথা তোমার?' 'তাহার' থেকে হয়ে গেছে 'তার'। সুরঞ্জনাকে নিয়ে সেই কবিতাটা এরপর শেষ হয় এক হাহাকারের ভেতর :

আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

বলা বাহুল্য, তাঁর এসব আশ্চর্য প্রেমের কবিতা উপভোগের জন্য তাঁর ব্যক্তিজীবনের এসব সূত্র অবশ্যই অনিবার্য নয়। বরাবরের মতোই ব্যক্তিগত অনুভব, অভিজ্ঞতাকে তিনি স্থাপন করেন বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে। যেমন এই কবিতায় প্রেমকে তিনি স্থাপন করেছেন আরও বৃহত্তর দার্শনিক বৃত্তে, প্রেমের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন মৃত্যুকে। লিখেছেন :

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি;
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে;

তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশে রূপালী শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখনায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশে খইক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে

BanglaBook.org

সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।
হয়তো গুলির শব্দ :
আমাদের তির্যক গতিস্রোত,
আমাদের পাখায় পিসটনের উল্লাস,
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ার গান!

হয়তো গুলির শব্দ আবার :
আমাদের স্তব্ধতা
আমাদের শান্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না;
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;
আমি যদি বনহংস হতাম,
বনহংসী হতে যদি তুমি;
কোন এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

স্মরণযোগ্য যে গত পাঁচ বছরে জীবনানন্দ টুকরো টুকরোভাবে অগণিতবার মৃত্যুবরণ করেছেন, অগণিতবার মুখোমুখি হয়েছেন টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা আর অন্ধকারের।

BanglaBook.org

অম্লান স্বাস্থ্যে হজম করা

এক

কথা উঠল জীবনানন্দের বনহংসের এই কবিতার সাথে মিল আছে ইয়েটসের কবিতার, 'The White birds/ I would that we were/ my beloved, white birds on the foam of the sea... .' তাঁর 'হায় চিল' কবিতার সঙ্গেও মিল পাওয়া গেছে ইয়েটসের 'O Curlew, cry no no more in the air/ Because your crying brings to my mind/ Passion dimmed eyes...

এ ছাড়া তাঁর আরও কিছু কবিতার সঙ্গে মিল পাওয়া গেছে ইয়েটসের, অ্যালেন পোর কবিতার। জীবনানন্দ এসব মিলের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। তবে কবিতার মৌলিকত্ব নিয়ে তাঁর ছিল নিজস্ব ভাবনা। এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,

'লরেন্স বা এজরা পাইন্ডের উদ্ধৃত করে কবিতা ছাপিয়ে (বা ইয়েটসকে স্মরণ করে কবিতা লিখে, যেমন আমি দু-একটা কবিতা করেছি) আধুনিক বাংলা কবিতার বৈভব দেখাতে যাওয়াটাকে আমি বাঁকা জিনিস মনে করি। কিন্তু সে মৌলিকতা তেমন নেই বলে লজ্জিত হবারও বিশেষ কারণ নেই। কারণ এমন কোন বড় ইংরেজ কবির নামই আমি মনে করতে পারি না যারা ইটালীর নিকট, এলিজাবেথানদের নিকট, পূর্বজ ইংরেজ কবিদের কাছে ষ্টাইল ও ভাববৈচিত্র্যের জন্য ঋণী নন। কিন্তু সেসব অম্লান স্বাস্থ্যে হজম করে নিতে পারছেন, আমাদের ভেতর কেউ কেউ পেরেছেন হয়তো। কারু কারু জিনিস উত্তীর্ণ হচ্ছে।'

অম্লান স্বাস্থ্যে অন্যকে হজম করতে পারা, এই হচ্ছে আসল কথা তাঁর কাছে।

ভূমেন্দ্র গুহ একবার বাসে যেতে যেতে এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি এ বিষয়ে ভাবি না। এ বিষয়ে পড়াশোনার কথাটা এসে পড়ে। তুমি পড় কেন, তোমার কোনও কিছু পড়াটা তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের যে একটি বস্তুপিণ্ড আছে, অথবা তোমার বেঁচে থাকার বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তুপিণ্ড তৈরি হয়ে ওঠে, তাকে এক রকম ভাবে আহত করে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার অভিজ্ঞতাগুলো বিশ্লিষ্ট হয়, চরিত্র পায়, লিখতে জানলে তুমি লেখ, আঁকতে জানলে আঁক, সে নবনির্মিত অভিজ্ঞতার কথা লেখ বা আঁক। এটা একটা ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যাপার। তা ছাড়া যেসব সাহচর্য তোমাকে ঘিরে থাকে, তারা তোমার চারিত্রও কোন কোনভাবে কাচে ছাঁটে, তুমি যে সমাজটায় থাক তার কথ্য ভাষার টানটাও তোমার জিভে এসে পড়ে।'

এমনকি অনুবাদের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সেই হজম করা সূত্রের পক্ষে। তাঁর নিজের কবিতা যখন অন্যরা অনুবাদ করেছে, তখন বিরক্ত হয়েছেন এর আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টায়। একবার দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁর কিছু কবিতার অনুবাদ হয়েছিল, জীবনানন্দ অসন্তুষ্ট ছিলেন সেই অনুবাদে। দেবীপ্রসাদকে লিখেছিলেন, "'বনলতা সেন' কবিতার এক জায়গায় raising her bird's nest eyes আছে, 'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে' ও এত বেশি literal translation না করে কিছুটা ভাবানুবাদ করতে পারা যায় না কি? বাংলায় আমি তো নীড় নয় নীড়ত্বের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম।"

দুই

পৃথিবীর নানা সাহিত্য, তত্ত্ব নিজের মতো হজম করে জীবনানন্দ অব্যাহত রাখছেন কবিতা লেখা। ব্যক্তিজীবনে একটা আপাতস্থিরতা এসেছে তখন তাঁর। কিন্তু গত পাঁচটা বছর জীবনানন্দের জীবনের গাঢ় বেদনার অভিজ্ঞতা হয়েছে। নীলিমা এবং পাতাল উভয়কেই গভীরভাবে দেখেছেন তিনি। এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তাঁর রক্তাক্ত বোধন হয়েছে। মানুষকে, জীবনকে, সাহিত্যকে নতুন আলোতে দেখতে

BanglaBook.org

শুরু করেছেন তিনি। আনন্দ আর বেদনাকে, জীবন আর মৃত্যুকে আকাশে ছড়িয়ে থাকা দুটো আড়াআড়ি তলোয়ারের মতো দেখতে শুরু করেছেন তিনি। ব্যক্তিজীবনের ভেতর দেখতে শুরু করেছেন মহাকালকে। সহজ বাক্যে অথচ গভীর ব্যঞ্জনায়, মুক্ত ছন্দে, অভিনব উপমায় নতুন ধরনের কবিতা নিয়ে তখন হাজির হতে শুরু করেছেন তিনি। এ সময় লেখা তাঁর 'হাওয়ার রাত' কবিতাটা লক্ষ করা যাক :

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনও বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো
উড়ছে সে!
কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।

(মশারির মতো এমন একটা আটপৌরে বস্তুকে কবিতায় এর আগে কেউ এমন অভিনবভাবে উপস্থাপন করেননি। তাকে স্থাপন করেননি এমন মহাকাশের প্রেক্ষিতে। বালুকণা থেকে তিনি যেন যাত্রা করছেন মহাশূন্যের দিকে)

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল
ফাঁক ছিল না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা
চোখের মতো ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা।
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ।
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিলো।

(অভিনব সব উপমায় রাতের আকাশের এ এক অভূতপূর্ব বিবরণ)

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে

BanglaBook.org

করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?

(জীবন আর মৃত্যুকে পাশাপাশি দাঁড় করাচ্ছেন তিনি। সিস্টন চ্যাপেলের ছাদে যেমন মাইকেলেঞ্জেলো জীবন্ত করে তুলেছিলেন হাজার বছর আগের বাইবেলীয় গল্প, আকাশকে ক্যানভাস বানিয়ে জীবনানন্দ যেন তেমন এক ছবি আঁকছেন আমাদের সামনে)

আড়ষ্ট—অভিভূত হয়ে গেছি আছি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল!
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে, শাঁই শাঁই করে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো!

(এ বর্ণনায় ঘোর লাগে। অবাক হয়ে লক্ষ করতে হয় কী করে জানালার বাতাস তাঁর কলমের জাদুর ছোঁয়ায় হয়ে পড়ে ভীতসন্ত্রস্ত হরিণ)

হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেনীর সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব
রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়!

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়া সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
একটা দুরন্ত শকুনের মতো!

(জীবনের নীল মত্ততায় তাঁর হৃদয় হয়ে যাচ্ছে উড়ন্ত শকুন। শকুন কেন? শকুন তো মৃতভোজী। জীবন-মৃত্যু, আলো-অন্ধকার, পুলক আর বীভৎসতার দ্বৈত জীবনের ভেতর ঢুকেছেন তখন তিনি)

BanglaBook.org

যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়

এক

নতুন হাওয়া লাগা জীবনানন্দের এসব কবিতা পরম উৎসাহে তখন ছাপিয়ে যাচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর নতুন পত্রিকা *কবিতায়*। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বিশেষ না হলেও নিয়মিত চিঠিতে যোগাযোগ আছে তাঁদের। একপর্যায়ে বুদ্ধদেব বসু লিখলেন, 'আপনার প্রথম বই বেরিয়েছে তো বহু বছর হয়ে গেল, এবার আরেকটি নতুন বই করুন।' নয় বছর আগে জীবনানন্দ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর *ঝরা পালক*। এর মধ্যে তাঁর জীবনের ওপর অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে। মনে স্বস্তি ছিল না। অনেক দিন পর কিছুটা সুস্থির হয়ে আবার কবিতা লিখতে শুরু করেছেন তিনি। বুদ্ধদেবের উৎসাহ তাঁকে প্রেরণা দিল। জীবনানন্দ তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বইটা প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন। লেখাগুলো প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে প্রকাশনার যাবতীয় কাজকর্ম কলকাতায় বসে করলেন বুদ্ধদেব। আবারও নিজেরই খরচে প্রকাশিত হলো তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই *ধূসর পাণ্ডুলিপি*। জীবনানন্দ বইটা উৎসর্গ করলেন বুদ্ধদেব বসুকে। ভূমিকায় লিখলেন, 'আমার প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৩৪ সালে (১৯২৭)। কিন্তু সে বইখানা অনেকদিন আমার নিজের চোখের আড়ালেও হারিয়ে গেছে। আমার মনে হয় সে তার প্রাপ্য মূল্যই পেয়েছে। ১৩৩৬-এ আর একখানা কবিতার বই বার করবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছিলো। কিন্তু নিজ মনে কবিতা লিখে এবং কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করে সে ইচ্ছাকে আমি শিশুর মত ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। শিশুকে অসময়ে এবং বার বার ঘুম পাড়িয়ে রাখতে জননীর যে রকম কষ্ট হয়, সেই রকম কেমন একটা উদ্বেগ—খুব স্পষ্টও নয়, খুব নিরুত্তেজও নয়—এ ক'বছর ধরে বোধ করে এসেছি আমি। আজ নবছর পর আমার দ্বিতীয় কবিতার বই বার হলো। এর নাম *ধূসর পাণ্ডুলিপি* এর পরিচয় দিচ্ছে।...

জীবনানন্দের প্রথম বই *ঝরা পালক* অনেকের তো বটেই, তাঁর নিজের চোখের আড়ালেও যে চলে গেছে, সেটা তিনি মানছেন এবং এ-ও মানছেন যে সেটাই ওই কবিতার বইয়ের প্রাপ্য মূল্য। তারপরও তিনি নতুন বই প্রকাশ নিয়ে তাড়াহুড়ো করেননি। নতুন কবিতা লিখেছেন কিন্তু সেগুলোকে সন্তানের মতোই ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। তা সত্ত্বেও কবিতাগুলো একটা বই আকারে প্রকাশ হোক, এমন একটা চাপা উদ্বেগ মেশানো ইচ্ছা তাঁর ছিল। জীবনের নতুন প্রেক্ষাপটে তাঁর মনে হলো এবার সেসব কবিতার ঘুম ভাঙানো যায়। ফলে বেরোল তাঁর দ্বিতীয় বই। মাঝখানে কেটে গেছে বিক্ষুব্ধ নয়টা বছর। তাঁর এই নতুন বইয়ের কবিতাগুলো *ঝরা পালক*-এর কবিতাগুলোর চেয়ে ভিন্ন এক

BanglaBook.org

পৃথিবীর। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*তে নতুন জন্ম ঘটল জীবনানন্দের। সত্যি বলতে নতুন জন্ম ঘটল বাংলা কবিতারও। যদিও সে ঐতিহাসিক জন্ম খুব নিভৃতে, নীরবে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর *কবিতা* পত্রিকায় ঘোষণা করলেন *ধূসর পাণ্ডুলিপি*র জয়যাত্রা, 'আমাদের বাঙলাদেশের পাঠক সাধারণের মধ্যে জীবনানন্দ যদি অজ্ঞাতেই থাকেন সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। তবে গুণী যারা কাব্য সম্ভোগের প্রকৃত অধিকারী যারা তাদের মধ্যে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* প্রকাশের পর তিনি স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন এ আশা জোর করেই করা যায়।...কবিতা যদি আমাদের কাছে ইয়ারকির বিষয় না হয়ে গভীর অনুশীলনের বিষয় হয়, তবে এ কথা আমাদের মানতেই হবে যে এই কবি এমন একটি সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন, যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়...'

ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ টের পাননি যে দস্তয়ভস্কি যেমন একবার বলেছিলেন আমরা সব গোগলের ওভারকোটের পকেট থেকে বেরিয়েছি, ঠিক তেমনি বাংলা কবিতার অনেকগুলো প্রজন্ম বের হবে এই *ধূসর পাণ্ডুলিপি*র গর্ভ থেকেই।

দুই

জীবনানন্দ তাঁর প্রথম বই *ঝরা পালক* পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সেই বই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নেতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন। জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের সেই মতকে নাকচ করে দিয়েছিলেন যদিও। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কবিতায় নান্দনিক প্রশান্তি থাকতে হবে, জীবনানন্দ তা মানেননি। প্রশান্তি আর অশান্তির যুগলবন্দীতে কী করে কবিতা হয়ে ওঠে, তারই চেষ্টা চালিয়ে গেছেন জীবনানন্দ। সে চেষ্টার ফল তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপি*। এ বইটাও জীবনানন্দ পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথকে। এবারের চিঠিতে আরও খানিকটা বিনয় আর অনেকটা স্তুতি মিলিয়ে বইটা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য জানতে চাইলেন। লিখলেন :

'সর্বানন্দ ভবন
বরিশাল
৫-৩-৩৬
শ্রীচরণেষু,

আপনি আধুনিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী। আপনি মহামানব। আপনার সাহিত্যসৃষ্টি ও জীবন পৃথিবীর ইতিহাসে এক গভীর বিস্ময় ও গরিমার জিনিষ। জার্মান সাহিত্যে গ্যাটে, ইংরাজি সাহিত্যে শেকসপীয়র যে স্থান আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা। এ যুগের বাঙালীর ও বিশেষ করে বাঙালী যুবকের সবচেয়ে বেশী গৌরব ও আনন্দ এই যে আপনার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও জীবনের নিত্যনতুন দীপ্তি তার সম্মুখে রয়ে গেছে।

BanglaBook.org

আমি একজন বাঙালী যুবক, মাঝে মাঝে কবিতা লিখি। অনেকবার দেখেছি আপনাকে, তারপর ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গেছি। আমার নিজের জীবনের তুচ্ছতা ও আপনার বিরাট প্রদীপ্তি সব সময়ই মাঝখানে কেমন একটি ব্যবধান রেখে গেছে—আমি তা লংঘন করতে পারিনি। আজ যদি সেন্ট পল কিম্বা খৃষ্ট অথবা গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে ফিরে আসেন আবার, তাহলে ভিড়ে চাপা পড়ে তাদের সঙ্গে দেখা করে আসবো হয়তো কিন্তু তারপর তারা আমাকে ভীড়ের মানুষ বলে বুঝে নেবেন হয়তো।

প্রায় নয় বছর আগে আমি আমার প্রথম কবিতার বই একখানা আপনাকে পাঠিয়েছিলুম। সেই বই পেয়ে আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, চিঠিগুলো আমার মূল্যবাদ সম্পদের মধ্যে একটি। তখন আমি কোলকাতার কোন কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ছিলুম। তারপর বাংলাদেশ এবং এদেশের নানা কলেজ ঘুরে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনা করছি।

প্রায় আট দশ বছর আগের রচিত কবিতা কুড়িয়ে এবার আর একখানা বই বার করলুম। এই বইখানা আপনাকে উৎসর্গ করতে পারিনি। এই একটি দুঃখ এবং লজ্জা আমার রয়ে গেলো। যতদূর শীঘ্র সম্ভব এই অপরাধ থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করে নেব। আমার এই বই— এই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আপনাকে পাঠালাম একখানা। মাঝে মাঝে ছাপার ভুল আছে—আরো ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। কিন্তু তবু আমার মনে হয় বইয়ের কবিতাগুলোর একটা নিজস্ব soul রয়েছে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু চিরন্তন, কিন্তু প্রকাশের বৈশিষ্ট্য বিশেষ বিশেষ রূপের জন্ম দেয়, কোন কোন রূপ যেমন রবীন্দ্র কাব্য, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলীর কবিতা অথবা শেক্সপীয়র-এর রচনা অনবদ্য হয়ে থাকে। সে যা হোক, নিজের কবিতা বা অন্য কোন কবিতা সমালোচনা নিয়ে আজ আমি উপস্থিত হতে চাই না। কালিদাস তার মেঘদূতে বলেছিলেন শ্রেষ্ঠ জনের কাছে দাবী জানাতে হয়, তারা মানুষের আন্তরিক সম্মান রক্ষা করেন। আমিও আজ একট মস্ত বড় দাবী নিয়ে আপনার কাছে হাজির হয়েছি; আপনি যদি একটু সময় করে এই বইটা পড়ে দেখেন— ও তারপর বিশদভাবে আমাকে একখানা চিঠি লেখেন তাহলে আমি খুব উপকৃত বোধ করবো। বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার জন্য অনুরোধ করছি বলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আগেই বলেছি আমার আজকের দাবীটা খুব মস্তবড় এবং সবচেয়ে মহৎ জনের কাছে।

আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

জীবনানন্দ'

BanglaBook.org

বোঝা যায়, জীবনানন্দ সত্যিই খুব আন্তরিকভাবে চাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ একটু বিশদভাবে বইটা নিয়ে লিখুন। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি যে নেহাত ভিড়ের মানুষ, তা কবুল করে নিয়েছেন শুরুতেই, রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বকে বড় গলাতেই বলেছেন। তারপরও তাঁর মনে হয়েছে এই *ধূসর পাণ্ডুলিপি* বইটার একটা নিজস্ব আত্মা আছে। অনেক আশা করে বসে ছিলেন বিশ্ববরেণ্য এই মানুষের একটা বিশদ মূল্যায়নের। কিন্তু বৃথা আশা তাঁর। এবারও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে জীবনানন্দ পেলেন এক সাদামাটা চিঠি। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন

'কল্যাণীয়েষু,

তোমার কবিতা পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।

ইতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৪৩'

বিস্তৃত আলোচনা তো দূরের কথা, নেহাত এক লাইনের একটা চিঠি লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ আর কোনো বিতর্কে যাননি। প্রশংসা হিসেবে এইটুকু বলছেন যে তাঁর লেখায় তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে। জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে তাঁর এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে খুব মৌলিক এবং মোক্ষম। কিন্তু জীবনানন্দ তো আরও বড় দাবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, সে দাবির এই উত্তর খুবই অকিঞ্চিৎকর। রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা কবিতার পথ থেকে বাংলা কবিতাই যে একটা বড় বাঁক নেবে, এই *ধূসর পাণ্ডুলিপি* বইটার ভেতর দিয়ে সেটা রবীন্দ্রনাথ ঠিক টের পাননি বোঝা যায়। তিনি আঁচ করেননি কী করে এই বইটার মাধ্যমে ঘটে যাবে বাংলা কবিতার পালাবদল। শুধু 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে'—এ কথা বলে *ধূসর পাণ্ডুলিপি*কে বইয়ের আলমারিতে তুলে রাখলে চলে না। *ঝরা পালক*-এর মতো *ধূসর পাণ্ডুলিপি* বইটাও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি।

অবশ্য চিঠিতে জীবনানন্দের চাপা অহংও লক্ষ করা যায়। লোকে যখন নিজের বই রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করতে পারলে বর্তে যায়, সেখানে তিনি বেশ ঘোষণা দিয়েই জানিয়ে দিচ্ছেন যে এই বইটা তিনি তাঁকে উৎসর্গ করেননি। সে জন্য ক্ষমা চাইছেন এবং বলেছেন তাঁকে তিনি ভবিষ্যতে একটা বই উৎসর্গ করবেন। ভবিষ্যতে অনেকগুলো বই জীবনানন্দ লিখেছেন, তবে রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেননি একটাও।

তিন

সমকালীন প্রজন্মের মতামত পাবার জন্য জীবনানন্দ তাঁর প্রথম বই *ঝরা পালক* পাঠিয়েছিলেন প্রতিভাবান সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদকে আর এবার *ধূসর পাণ্ডুলিপি*

BanglaBook.org

পাঠালেন পরের প্রজন্মের নামজাদা লেখক প্রমথ চৌধুরীকে। বরিশাল থেকে প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি লিখলেন জীবনানন্দ :

'শ্রীচরণেষু,

আমি কয়েকদিন হল বরিশালে ফিরে এসেছি। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কয়েকদিন আগে আপনার Bright Street এর বাসায় গিয়েছিলাম ও আমার নতুন প্রকাশিত বই "ধূসর পাণ্ডুলিপি" একখানা আপনাকে দিয়ে এসেছিলাম— আপনার মনে আছে হয়তো।...

তৃপ্তি দিক অতৃপ্তি দিক—আমার কাব্যে কোন গুণ থাকুক বা অনেক দোষ থাকুক, "ধূসর পাণ্ডুলিপি" পড়ে আমার সম্পর্কে আপনার যা মনে হয়েছে সে সম্বন্ধে "বিচিত্রা"য় একটি বড় প্রবন্ধ লিখলে আমি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করবো। আমার "ধূসর পাণ্ডুলিপি" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক অনেক হৃদয়গ্রাহী মতামত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তবু সে সব সমালোচনা নয়। সেই "সবুজপত্রের" দিন থেকে জানি বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় সমালোচক হচ্ছেন আপনি। "ধূসর পাণ্ডুলিপি" সম্বন্ধে আপনার সমালোচনা সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হবে। যত শীঘ্র সম্ভব বিচিত্রায় আপনার প্রবন্ধ দেখতে পাব ও তৎপূর্বে আপনার চিঠি পাব এই আশা নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।

আপনার সর্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনীয়। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানবেন।

ইতি

প্রণত, জীবনানন্দ'

BanglaBook.org

প্রমথ চৌধুরী তাঁর বালিগঞ্জের ব্রাইট স্ট্রিটের বাসা থেকে উত্তর দিলেন

'কল্যাণীয়েসু,

...আমি আপনার কবিতার বই সম্বন্ধে আজও কিছু লিখে উঠতে পারিনি তার কারণ প্রথমত আমার শরীর এখন ভালো নেই। উপরন্তু এখানে এখন ভয়ঙ্কর গরম। গ্রীষ্ম আমাকে চিরদিনই কাতর করে, এখন আরো বেশী করছে। একটু বৃষ্টি পড়লেই লেখায় হাত দেব।...

ইতি

শ্রী প্রমথ চৌধুরী'

অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে বড় একটি আলোচনার আশায় বসে ছিলেন জীবনানন্দ। কিন্তু না, প্রমথ চৌধুরী *ধূসর পাণ্ডুলিপি* নিয়ে আর লেখেননি। রবীন্দ্রনাথ এক লাইনের একটা মন্তব্য করলেন আর প্রমথ চৌধুরী গরমে কাতর হয়ে রইলেন। বৃষ্টিও আর পড়ল না, তিনি তাঁর লেখাও আর লিখতে পারলেন না।

কবিতার পৃথিবীতে তিনি নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতর হতে লাগলেন। তাঁর কবিতার প্রথম অনুরাগী মাকে পাঠক হিসেবে হারিয়েছেন অনেক আগেই। তারপর পেয়েছিলেন অচিন্ত্যকে। তাঁর নতুন ধারার কবিতার ব্যাপারে অচিন্ত্যও হারিয়ে ফেলেছেন উৎসাহ। সেই সময়ের সাহিত্যের প্রধান মানুষ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেননি তিনি, পরবর্তীকালের সাহিত্য-দুনিয়ার মহারথী প্রমথ চৌধুরী, ধূর্জটিপ্রসাদ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। সজনীকান্ত তো শুধু অপছন্দ নয়, আক্রমণ করেই বেড়াচ্ছেন।

পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন

এক

জীবনানন্দ বহু আগেই টের পেয়ে গেছেন যে আর্টিস্ট এক অবৈধ, অস্বাভাবিক মানুষ। শিল্পীর নিঃসঙ্গ যাত্রার জীবন তিনি মনে মনে গ্রহণ করে নিয়েছেন। সাহিত্যের কীর্তিমানেরা তাঁকে যতই উপেক্ষা করুন, জীবনানন্দের চিন্তা-দুশ্চিন্তা ওই লেখাকে ঘিরেই। হাল তিনি ছাড়বেন না। গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, 'তুমি নিজেই নিজের প্রদীপ হও', সেই মন্ত্র নিয়ে জীবনানন্দ নিজের তাগিদেই কবিতা লিখে যাবেন, সেটা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছেন। তাঁর পক্ষের মিছিলে যাত্রী একজনই—বুদ্ধদেব বসু। গল্প-উপন্যাস যা গোপনে লিখেছিলেন, সেগুলো ট্রাঙ্কবন্দী করে রেখেছেন। আবার তিনি মনোযোগী হলেন কবিতায়। আরও গভীর পরিশ্রমী কবিতা লিখতে শুরু করলেন। এক-একটা কবিতা লিখে অগণিতবার কাটাকুটি করতে লাগলেন। ভাস্করেরা যেমন এক খণ্ড পাথর নিয়ে তার থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু ছেঁটে ফেলে পাথরের ভেতর থেকে তুলে আনে লুকিয়ে থাকা ভাস্কর্যকে, তাঁর সেই সময়ের কবিতার খসড়ার দিকে তাকালে মনে হয় তিনি যেন শব্দ খুঁড়ে খুঁড়ে ভেতর থেকে বের করে আনছেন কবিতা। এই সময়ই বহুবার কেটে, ঘষে, মেজে তৈরি করলেন তাঁর বহুল আলোচিত কবিতা 'বনলতা সেন'

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;

BanglaBook.org

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতি দূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর;
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

পৃথিবী নানা দিগন্ত হাজার বছর ধরে চষে বেড়ানো এক পথিক, নাটোরের এক নারী, পাখির নীড় যেমন তার আশ্রয়, সে নারীর চোখ হয়ে দাঁড়ায় সে পথিকের আশ্রয়, জোনাকিরা যেমন শুধু তাদের প্রেমের কালেই জ্বলে-নেভে, তেমনি এক শব্দহীন রাতে পৃথিবীকে এক পাশে সরিয়ে রেখে সে পথিক বসে সেই নারীর সামনে। সেই নারী তাকে দুদণ্ড শান্তি দেয়। ঠিক এমন প্রেমের কবিতা বাংলার পাঠক পড়েনি এর আগে।

BanglaBook.org

দুই

এই কবিতা ছাপা হবার পর আবার সরব হয়ে ওঠেন সজনীকান্ত। তাঁর *শনিবারের চিঠিতে* লিখলেন, 'এই প্রতিভাবান কবিদের আর একটি কৌশল কবিতা লিখিতে লিখিতে অকস্মাৎ অকারণ এক একজন ভদ্রলোকের মেয়ের নাম করিয়া আমাদিগকে উৎসুক ও উৎসাহিত করিয়া তোলা। "ইকনমিক্স" লিখিতে লিখিতে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু অকারণে "রানী"কে টানিয়া আনিয়াছেন। "জাতক" এ শ্রী জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্র "সুরমা" নামীয়া একটি ভদ্রমহিলাকে অত্যন্ত লজ্জা দিয়াছেন এবং "বসন্তের গান"-এ শ্রী সমর সেন "মালতী রায়" নামক কোন কামিনীর "নরম শরীর" লইয়া যাহা করিবার নয় তাহাই করিয়াছেন। ইহার সূত্রপাত হইয়াছে নাটোরের "বনলতা সেন"কে লইয়া।...

জীবনানন্দ নিয়মিত *শনিবারের চিঠি* পত্রিকাটি পড়তেন। সজনীকান্তের কটাক্ষগুলোকে তিনি একরকম উপভোগই করতেন। লেখক বাণী রায় একবার বলেছিলেন, সজনীকান্ত যে অবিরাম তাঁকে নিয়ে এমন লিখে যাচ্ছেন তাতে তাঁর বরং একরকম পাবলিসিটিই হচ্ছে।

তিন

বাস্তব কোনো চরিত্রের আদলে 'বনলতা সেন' কবিতাটি সৃষ্ট কি না, এ নিয়ে কৌতূহল আছে পাঠক-পাঠিকার। সে প্রশ্ন অবশ্য অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। শুধু জানা যাচ্ছে, জীবনানন্দ অশোকমিত্রকে বলেছিলেন, 'বনলতা সেন' নামে রাজশাহীর জেলে আটক এক রাজবন্দীর খবর পত্রিকায় পড়ে নামটির ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিলেন তিনি। ওই পর্যন্তই। তবে সম্প্রতি 'বনলতা সেন' কবিতার এক কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছেন আকবর আলি খান। তিনি লিখেছেন বাংলাদেশের সরকারি আমলা হিসেবে রাজশাহীর নাটোরে চাকরি করতে গিয়ে ব্রিটিশ আমলের নথিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে তিনি আবিষ্কার করেছেন যে নাটোর একসময় বারবনিতাদের বড় কেন্দ্র ছিল। আকবর আলি খানের ধারণা, বনলতা সেন বস্তুত এক গণিকা চরিত্র। তিনি প্রস্তাব করছেন, বুদ্ধের 'অনন্ত যাত্রা'র সঙ্গে 'হাজার বছর ধরে পথ হাঁটিতেছি'র একটা সম্পর্ক আছে এবং সেই যাত্রায় স্খলন এবং পাপের সূত্র আছে। কবিতায় উল্লেখিত মগধের অধিপতি বিম্বিসার আর মৌর্য সম্রাট অশোক দুজনেই বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু দুজনের জীবন ঘিরে পাপের প্রসঙ্গ আছে। অশোক ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছেন। বিম্বিসারকে তাঁর ছেলে হত্যা করে। কবিতায় যে বিদর্ভ নগরীর কথা বলা হচ্ছে মহাভারত অনুযায়ী বিদর্ভ অসামান্য রূপসী দায়মন্তের বাবার বাড়ি। কামার্ত দেবতা কলি কী করে দায়মন্তের সংসার ধ্বংস করে তার কাহিনি আছে মহাভারতে। বিদর্ভ তাই পাপের স্মৃতিবিজড়িত। কবিতায় বিদিশা নগরীর কথাও আছে। কালিদাসের মেঘদূতে বিদিশা নগরের কাহিনি আছে, যেখানে একে দেখানো হয়েছে পাপাচারের কেন্দ্র হিসেবে। সেই সঙ্গে যে শ্রাবস্তী নগরীর কথা বলা হচ্ছে, সেখানে বুদ্ধ তাঁর জীবনের শেষ ২৫ বছর কাটিয়েছেন। কথিত আছে, সেখানে কামাতুর নারীরা বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গের চেষ্টা করে। কিঙ্ক এবং সুন্দরী নামের দুই ভ্রষ্টা নারী এমনকি বুদ্ধের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগও তোলে। আকবর আলি বলছেন, কবিতার শুরুর যে আবহ তা পাপ, কাম ইত্যাদি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এক জগৎ। তিনি প্রশ্ন তুলছেন নাটোর কি সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তেমনি এক জগৎ, যেখানে বনলতা সেন অপরূপ রূপসী এক বিদগ্ধ গণিকা? আর কে না জানে গণিকারাই পুরুষকে দুদণ্ড শান্তি দিয়ে থাকে। কবিতায় দেখা যায়, বনলতার সাথে কবির দেখা হয় শুধু অন্ধকারে। এতে সন্দেহ আরও দানা বাঁধে। কবি যে জিজ্ঞেস করছেন

BanglaBook.org

'এতদিন কোথায় ছিলেন?', তার নানা রকম অর্থ হতে পারে। হতে পারে এই নারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল আগে তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা কিংবা হতে পারে এই বিদুষী গণিকার মনে হয়েছে এই কবির মতো একজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁকে আর এ পথে আসতে হতো না ইত্যাদি। বনলতা সেনকে নিয়ে এযাবৎকালের আলোচনায় এ নিঃসন্দেহে এক নতুন মাত্রা।

চার

বনলতাকে গণিকা হিসেবে দেখার এই প্রস্তাব বেশ অদ্ভুত, তবে ভাবনা উদ্রেককারী। দেখেছি জীবনানন্দের গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, ডায়েরিতে গণিকাদের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে। গণিকাদের জীবন বিষয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ পুরোনো, তিনি 'পতিতা' নামে কবিতা লিখেছেন, তাঁর ডায়েরিতে দিল্লির গণিকালয়ে যাবার অভিজ্ঞতার কথা আছে, কলকাতায় বেকার জীবন কাটানোর সময় লেখা ডায়েরিতেও আছে গণিকাদের প্রসঙ্গ। *কারুবাসনা* উপন্যাসের চরিত্রকে তাঁর মা বলছেন, 'খুক্কির আবার পাঁচড়া হচ্ছে দেখলাম।'

'হ্যাঁ।'

'সমস্ত হাত-পা, বুক-পিঠ, খুজলিতে ভরে গিয়েছে।'

'দেখেছি।'

'এ তো বড় ভাল কথা নয়।'

'নাঃ ঘুরে-ঘুরে হচ্ছে।'

'কিন্তু বারবার এ রকম পাঁচড়া হয় কেন? এই আড়াই বছরের মধ্যে তিন বার হল?'

মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন।

'কলকাতায় তুমি চোদ্দ বছর ধরে আনাগোনা করছ, কখনো কোনো প্রলোভনে পড়োনি তো?'

'শরীরে কোনো রোগ আছে তোমার?'

'আছে বলে তো জানি না।'

তাঁর 'আস্বাদের জন্ম' গল্পে স্বামী-স্ত্রীর আলাপ হচ্ছে, 'স্ত্রী বলে, কেন সন্তান মরে, আমার অপরাধে না তোমার অপরাধে একদিন তার প্রমাণ হয়ে যাবে। বিধাতা আমাকে অপরাধিনী করবেন না নিশ্চয়ই।'

সোমনাথ একটু হেসে, 'মনে করুন তা আমার অপরাধেই।'

বিভা—'আমি জানি। কলকাতায় তুমি অনেক সন্দেহজনক জীবন কাটিয়েছ।'

'ভালোবাসার সাধ' গল্পেও আছে স্বীকারোক্তি : '...ছেলেমেয়েদের বিয়ে করাবারও উপায় নাই আমার। আমার চল্লিশ বছরের জীবনের আর একটা পাপের কথা আপনার

BanglaBook.org

কাছে বলব দাদা। স্ত্রীর মৃত্যুর তিন চার মাস পরে আমি একবার কলকাতায় গিয়েছিলুম। মনের অবস্থা ভালো ছিলো না তখন। কলকাতা থেকে একটা গোপন রোগ নিয়ে আমি ফিরেছি। তারপর বিয়ে করার কোন পথ নেই আমার।'

সফলতা নিষ্ফলতা উপন্যাসে গণিকা প্রসঙ্গ আছে সরাসরি। উপন্যাসের চরিত্র বানেশ্বর বেশ্যাপাড়া 'টেরিটিবাজারে' যায়। তার বন্ধু নিখিল জিজ্ঞাসা করছে, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছুঁড়িদের কাছে?

'ছুঁড়ি অ্যাংলো ইন্ডিয়ানই ভালো।

ডবকা?

স্লিম।

থাইসিস হয়নি তো?

গিয়ে দেখলেই পারেন।

কত করে নেয়?

ট্রেড-ডিপ্রেশনের জন্য দাম কমে গেছে—আপনি একদিন যাবেন?

ভাবছি।

অনেক প্রফেসররাও যায়।

ডি ইকন যেত?

যার টাকা আছে—যে কোলকাতায় আছে—ছেলে মানুষ করবার সময় আর যার নাই—সেই যায়।

তা হলে তো অনেক খদ্দের।'

BanglaBook.org

মোট কথা, বেশ্যাগমন, গোপন রোগ ইত্যাদি প্রসঙ্গ জীবনানন্দের লেখায় এসেছে। এর সঙ্গে বনলতা সেনের কী যোগ, তা নিয়ে তর্ক হতেই পারে। বিশেষ করে ব্যক্তি জীবনানন্দের যে প্রচলিত ইমেজ, বনলতা সেন নামটিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া যে রোমান্টিকতা, তার সঙ্গে এই গণিকা ব্যাপারকে মেলানো অনেকের কাছেই একটু বেমানান, অস্বস্তিকর। বনলতা সেন গণিকা কি না, সেটা একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন হতে পারে। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে এই কবিতাটির আবেদনের কোনো হেরফের হবার কারণ নেই। বনলতা সেনের পরিচয় যা-ই হোক, এ কবিতা বাংলা প্রেমের কবিতার ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ উদাহরণ হিসেবেই দাঁড়িয়ে গেছে। ক্লান্ত প্রাণ নিয়ে এক নারীর মুখোমুখি অন্ধকারে বসার যে আবহ, যে নারীর চুল অন্ধকার বিদিশার রাতের মতো, চোখ পাখির নীড়ের মতো, তা জনমানসকে প্রভাবিত করেছে ব্যাপকভাবে। বনলতা জীবনানন্দের চেয়েও জনপ্রিয়। জীবনানন্দের নামের চেয়ে লোকে বেশি জানে বনলতা সেনের নাম। বনলতা সেন হয়ে উঠেছে রীতিমতো জনসংস্কৃতির অংশ। হাজির হয়েছে বাংলা গানে, চলচ্চিত্রে, নাটকে।

রক্তাক্ত জ্যৈষ্ঠের রাতে এক ঢোঁড়া সাপ

এক

ব্রজমোহন কলেজের নিয়মিত চাকরির সুবাদে জীবনানন্দের সংসারে অর্থের টানাটানি কিছুটা ঘুচেছে তখন। ইতিমধ্যে জন্ম নিয়েছে জীবনানন্দের দ্বিতীয় সন্তান ছেলে সমরানন্দ। লাবণ্যও সংসারের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনা করে ব্রজমোহন কলেজ থেকে বিএ পাস করেছেন। সংসারে যে ঘোর অনিশ্চয়তা ছিল, সেটা অনেকটা কেটেছে।

কিন্তু জীবনানন্দ টের পান তাতে তাঁর করোটির ভেতরের সেই যে ভূতের মতন এক বোধ, তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সেই বোধ তখনো তাঁর সঙ্গে ঘুরছে। তিনি চলছেন সেই বোধও চলছে, তিনি থেমে যাচ্ছেন, থেমে যাচ্ছে সেই বোধও। এই যে একটা চাকরি পেয়েছেন, নিয়মিত বেতন পান, শুধু কুঁচো চিংড়ি খেয়ে থাকতে হয় না, তাতে কি তাঁর মনের সেই মুদ্রাদোষের কোনো বদল হয়েছে? না, তা হয়নি। এখনো হৃদয় তাঁর জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা বলে, এখনো সহজ লোকের মতো তিনি চলতে পারেন না, এখনো জীবনের নীল মত্ততার ভেতরও তাঁর মনে নামে অন্ধকার। তাঁর মন থেকে অস্থিরতা, ক্লান্তি যায় না। জীবনানন্দ বুঝলেন এ তাঁর এক অনিরাময়যোগ্য বোধ। এ বোধ তাঁর পিছু ছাড়বে না। তিনি আগেই বলেছেন এ বোধ স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয় অন্য কিছু। এত দিন পর আবার সেই বোধের দিকে ভালোভাবে তাকালেন তিনি, বুঝবার চেষ্টা করলেন, এবার যেন তিনি চিনতে পারলেন সেই বোধকে। আগে সেই বোধ ছিল অনামি, নেহাতই একটা 'বোধ' এবার নতুন এক কবিতা লিখে সেই বোধটার একটা নাম দিলেন জীবনানন্দ। একে বললেন 'বিপন্ন বিস্ময়'।

সেই বোধের পরিচয় দিতে গিয়ে এক অদ্ভুত লোকের গল্প শোনালেন জীবনানন্দ, 'আট বছর আগের একদিন' নামের সেই কবিতায়। এই কবিতায় যে লোকটার কথা বলছেন জীবনানন্দ, সে শুয়ে আছে এক লাশকাটা ঘরে। বরিশালে তাদের বগুড়া রোডের বাড়ির কাছে একটা মর্গ ছিল। সেই লাশকাটা ঘরের পাশ দিয়ে বহুবার হেঁটেছেন জীবনানন্দ। সেই লাশকাটা ঘরে টেবিলের ওপর শুয়ে থাকতে দেখেছেন মৃত মানুষকে। তেমনি এক মৃতের গল্প তিনি শোনালেন এই কবিতায়। লাশকাটা ঘর, এক অন্ধ পেঁচা, অশ্বত্থগাছ এমনি এক থমথমে পরিবেশে শুরু হলো সেই গল্প, যেন একটা খবর দিচ্ছেন সবাইকে সেভাবেই লিখলেন :

শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে

BanglaBook.org

যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'ল তার সাধ।

বধু শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!
রক্তফেনা-মাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মত ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনদিন জাগিবে না আর।

'কোনদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোন এক নিস্তব্ধতা এসে।

BanglaBook.org

তবুও তো প্যাঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন,
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা;
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকে দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি?
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলেনি কি : বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বোনোজলে ভেসে?
চমৎকার!—
ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার!'
জানায়নি প্যাঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'ল—
মর্গে কি হৃদয় জুড়ালো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে!
শোন
তবু এ মৃতের গল্প;—কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোন খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবনে কোনদিন কেঁপে ওঠে নাই;

BanglaBook.org

তাই
লাশ কাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি আহা,
থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পালটায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি
করে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দুজনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

BanglaBook.org

এই কবিতা ছাপা হলো বুদ্ধদেব বসুর *কবিতা* পত্রিকায় ১৯৩৭ সালে। বুদ্ধদেব জীবনানন্দের অক্ষরবৃত্তে লেখা ৮৬ লাইনের এই কবিতাকে বললেন তাঁর 'সবচেয়ে প্রাণতপ্ত এবং স্তরবহুল কবিতা'। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই কবিতা নিয়ে অব্যাহত আছে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ফয়জুল লতিফ চৌধুরী জীবনানন্দের এই একটা কবিতা নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, তা সংকলন করে প্রকাশ করেছেন আস্ত এক বই।

দুই

'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় যে মৃত মানুষ, সে বেশ অদ্ভুত। মানুষের তো নানা রকম সাধ হয়। এই মানুষের মরার সাধ হয়েছে। মরার সাধ হলো, কারণ সে এমন একটা ঘুম চায় যে ঘুম থেকে আর উঠতে হবে না। কারণ জেগে থাকা অনেক কষ্টের ব্যাপার, অনেক ভার বহন করতে হয় তাতে। স্মরণ করা যেতে পারে যে এই কবিতাটা যখন তিনি লিখছেন সেই ১৯৩৭ সালের ঠিক আট বছর আগে জীবনানন্দ সদ্য বিবাহিত, তাঁর বিছানাতেও তখন এক সদ্য জন্ম নেওয়া শিশু। তিনি তখন বেকার। তাঁর সেই বিপর্যস্ত সময়ের ডায়েরিতে মরণ ঘুমে চলে যাবার কথা লিখেছেন তিনি অনেকবার। কিন্তু আট বছর পরের সেই মানুষ কি একই মানুষ? জীবনানন্দের সেই আট বছর আগের সত্তার সঙ্গে আজকের সত্তার যেন মোকাবিলা হচ্ছে এই কবিতায়।

তাঁর এই কবিতার লোকটার মরবার সাধ হলো যখন চাঁদ ডুবে গেছে, রাত অন্ধকার হয়ে গেছে, চারদিক নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতা উটের গলার মতো। একটা প্রলম্বিত, দীর্ঘ সময় ধরে চলা নিস্তব্ধতাকে উটের গ্রীবার সাথে তুলনা করা যায় কে আর ভেবেছে জীবনানন্দের আগে? কিন্তু লোকটার যখন মরার সাধ হলো তখন তার স্ত্রী, সন্তান তার পাশেই শুয়ে ছিল। তবু সে লোক এক গাছা দড়ি হাতে গেল অশ্বত্থগাছের কাছে এবং সেখানে গিয়ে ঝুলে পড়ল। আত্মহত্যা করল সে। জীবনানন্দের আগে আত্মহত্যা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ কবিতা লিখেছেন বলে জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে নান্দনিক প্রশান্তির কথা বলেছেন, এ কাণ্ড তা থেকে বহু দূরের। তবে জীবনানন্দ যে আত্মহত্যার ঘটনা উপস্থিত করলেন, সেটা একটা ধাঁধার মতো। লোকটা যে কেন আত্মহত্যা করেছে, সে এক জটিল জট। জীবনানন্দ অবশ্য এক প্রশ্ন-উত্তর পর্বের খেলার মতো সেই ধাঁধার জট খুলেছেন একটু একটু করে।

কবিতার এই লোকটার সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের মিল আছে। রাজার ছেলে গৌতম একদিন রাজশকটে চড়ে প্রথমবারের মতো রাজপ্রাসাদের বাইরে বেরিয়েছেন। পথে দেখলেন এক লোক পথের ধারে শুয়ে ধুঁকছে। গৌতম জানতে চাইলেন কী হয়েছে লোকটির? রাজশকটের চালক তাঁকে বলল, এ লোক রোগগ্রস্ত, কোনো রোগ মানুষকে আক্রমণ করলে সে এমন শয্যাশায়ী হয়ে যায়। গৌতম অবাক হলেন। 'রোগ' কাকে বলে তিনি জানতেন না। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধ লোককে। গৌতম জানতে চাইলেন, এ লোক দেখতে এমন কেন? শকটের চালক তাঁকে বলল, এ হচ্ছে বার্ধক্য, বয়স হলে সবাই এমন ন্যুব্জ হয়ে যায়। আশ্চর্য হলেন গৌতম। এর আগে তিনি বার্ধক্য দেখেননি কখনো। আরও কিছুদূর গেলে তিনি দেখলেন কয়েকজন লোক একজন মানুষের লাশ নিয়ে যাচ্ছে। গৌতম জানতে চাইলেন, কী হয়েছে এ লোকের? শকট চালক বলল, এ লোকের

BanglaBook.org

মৃত্যু হয়েছে, পৃথিবীর সব লোকেরই মৃত্যু হবে। গৌতম এই সত্য জেনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মৃত্যু কাকে বলে জানতেন না তিনি। খুব বিপন্ন বোধ করলেন বুদ্ধ। রোগ, জরা, মৃত্যু এই তাহলে জীবনের পরিণাম? এই জীবনের জন্যই এত আয়োজন? সেদিন মাঝরাতেই তিনি তাঁর স্ত্রী-সন্তানকে ঘুমন্ত রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সংসার ত্যাগ করে গিয়ে বসলেন অশ্বত্থগাছের নিচে ধ্যান করতে, জানতে হবে কী মানে এই জীবনের। অভিধানে বলা আছে, অশ্বত্থ হচ্ছে সেই বৃক্ষ, যা 'বহুকাল অবিরোধে বাঁচিয়া থাকে'। অশ্বত্থগাছকে সংসার-বৃক্ষও বলা হয়, যা ইহলোকের প্রতীক। ভগবত গীতায় আছে, 'তারা অক্ষয় অশ্বত্থ তরুর কথা বলে'। এমন এক অক্ষয় গাছের নিচে দীর্ঘ ধ্যানের পর গৌতম পেলেন নতুন জীবন। ইহলৌকিক বৃক্ষের নিচে পেলেন পারলৌকিক বোধি। পেলেন নির্বাণের ধারণা, যার ভেতর দিয়ে জয় করা সম্ভব রোগ, জরা, মৃত্যুকে।

পরবর্তীকালে লেখা আরেক কবিতায় জীবনানন্দ সরাসরিই জানিয়েছিলেন বুদ্ধের প্রতি তাঁর আকুতির কথা :

কোথাও নতুন বুদ্ধের যেন জন্ম হয়
—এই ভেবে চলিতেছি
বহুদিন ধরে স্ফুরিতেছি মোরা
যেমন বনের পথে রক্তাক্ত জ্যৈষ্ঠের রাতে ফিরেছেন ঢোঁড়া
—কোথাও ব্যাঙের যেন স্বাদ পায়ে বলে।

BanglaBook.org

জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার এই লোক বুদ্ধের মতোই সাংসারিকতার ভেতর থেকেই নতুন জীবন লাভের জন্য গেছে অশ্বত্থগাছের কাছে। তার মরার সাধ জেগেছিল শুক্লা পঞ্চমীর রাতে। নিয়মমতো পরের দিন হচ্ছে ষষ্ঠী, যা দেবতা ষষ্ঠীর দিন। সনাতন ধর্মমতে ষষ্ঠী শিশুদের দেবতা। তিনি নবজাতককে সৃষ্টিও করেন, পালনও করেন। ব্যাপারটা তাৎপর্যময়, কারণ জীবনানন্দের কবিতার মানুষটার মরবার সাধ জাগে ওই ষষ্ঠীর দিনেই। মানুষটা এক নতুন জীবন সৃষ্টির জন্যই এক গাছা দড়ি হাতে গেছে অশ্বত্থের কাছে গৌতমের মতো।

কিন্তু এখানে জীবনানন্দ আবার এক নাটকের সৃষ্টি করছেন। যে লোকটাকে নিয়ে লিখছেন তাকেই আবার প্রশ্নবিদ্ধ করছেন। তাকে নানা রকম উদাহরণ দেখাচ্ছেন তিনি। বলছেন একটা থেঁতলে যাওয়া ব্যাঙও আরও দুই মুহূর্ত বাঁচবার জন্য আকুতি করে, দুষ্ট ছেলেরা যখন ফড়িং ধরে, তখন সেই ফড়িংরাও ছেলেদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ঘন ঘন পাখা নাড়ায়, মশারা কেমন দল বেঁধে গুনগুন করতে করতে উড়ে বেড়ায়, একটা প্যাঁচা যে আবার অন্ধ তারও ইঁদুর ধরবার

কত শখ। জীবনানন্দ ওই আত্মহত্যা করা লোকটাকে প্রশ্ন করছেন এই সব পোকামাকড়, ব্যাঙেরও বেঁচে থাকার কত স্পৃহা অথচ মানুষ হয়ে সে কিনা নিজেকে ঝুলিয়ে দিল গাছে? কীটপতঙ্গের ভেতর যে জীবনের স্পৃহা আছে, সেটা জীবনানন্দ অনেক দিন থেকেই লক্ষ করে আসছেন কিন্তু মানুষের ভেতর কেন সেই সীমাহীন স্পৃহা নেই, সেটা ভেবেছেন। এত দিনে জীবনানন্দের এই কবিতার লোকটা তার উত্তর পেয়েছে। সে বোধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সে জেনে গেছে যে কারণ 'যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা'।

জীবনানন্দ মানছেন তার কথা। কিন্তু আবারও তাকে প্রশ্ন করছেন। তুমি এক গাছা দড়ি হাতে গেলে ভালো কথা কিন্তু তখন ওই গাছ, জোনাকির ঝাঁক, চারপাশের যবের খেত এগুলো তোমাকে টানল না? তুমি বরং ওই মর্গে যাওয়াটাকেই ভালো মনে করলে? প্রশ্ন তিনি করছেন আবার লোকটার হয়ে উত্তরও তিনি দিয়ে দিচ্ছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে এই লোক স্ত্রীর সাথে বনিবনা না হওয়ার জন্য আত্মহত্যা করেনি, তার স্ত্রী তাকে মধু, মনন সবই দিয়েছে, টাকাপয়সার কোনো টানাটানির জন্যও সে আত্মহত্যা করেনি, এ হাড় হাভাতে লোক নয়। অর্থ, কীর্তি, সচ্ছলতা, নারীর হৃদয় সবই তার আছে। এরপর জীবনানন্দ কবিতায় 'তাই' কথাটা লাগিয়ে একটা ধাঁধা তৈরি করেছেন। সবকিছু আছে 'তাই' লোকটা আত্মহত্যা করেছে। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার লোকটা মরেছে ব্যর্থতায় নয়, জীবনকে স্পষ্টভাবে জেনেছে বলে।

তবে জীবনানন্দ এমন সীদ্ধান্তহীনতায় এ লোকের গল্প শেষ করছেন না। তাঁর বরং একটা নতুন আবিষ্কার আছে। তিনি বলছেন জাগতিক কিছু পাওয়া না-পাওয়ার বাইরেও আমাদের কারও কারও রক্তের ভেতর এমন একটা বোধ আছে, যা আমাদের ভেতরে থেকে ক্ষয় করতে শুরু করে, ক্লান্ত করতে শুরু করে। কী সেই বোধ? তিনি তার নাম দিলেন 'বিপন্ন বিস্ময়'। অনেক আগে থেকে যে বোধ তাঁকে তাড়া করে ফিরত, তার একটা চেহারা যেন তিনি পেলেন এই লোকের ভেতর। পৃথিবীর দিকে বিস্ময় ভরে তাকায় সেসব লোক কিন্তু এই বিস্ময় তাদের জীবনকে খুব কাবু করে। ফলে এ বিস্ময় বিপন্ন। অশ্বত্থগাছের নিচে বসে বুদ্ধ যেমন নির্বাণ আবিষ্কার করলেন, জীবনানন্দের কবিতার সেই লোকও আবিষ্কার করেছে 'বিপন্ন বিস্ময়'। বস্তুত জীবনানন্দই তার হয়ে আবিষ্কার করলেন। তাঁর মায়ের প্রভাতসংগীত, বাবার উপনিষদ, সেই আলী মামুদ, মোতির মা, ফকির, মনুরুদ্দীন মিলে যে মায়াবী পৃথিবীর পরিচয় তাঁকে দিয়েছিলেন, জীবনের পথে চলতে চলতে তিনি কি বুদ্ধের মতো টের পাননি জীবনের মনের কথা আসলে বেদনা? তবু জীবন তো বিস্ময়করই। 'বিপন্ন বিস্ময়' এই বোধোদয়েরই নাম। এই সেই বোধ, যা কিছু কিছু মানুষের মাথার চারপাশে ঘোরে।

BanglaBook.org

এই কবিতা যখন তিনি লিখছেন, তার আট বছর আগে একদিন তাঁরও এমন আত্মঘাতী হবার ইচ্ছা হয়েছে, তখন হয়তো তিনি নিজেকে ওই লোকের দলেরই মনে করতেন কিন্তু এখন করছেন না। জীবনানন্দ লোকটার আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের যৌক্তিক কারণগুলো এক এক করে তুলে আনছেন ঠিকই কিন্তু শেষে গিয়ে তিনি তার পক্ষ নিচ্ছেন না। সেই 'বিপন্ন বিস্ময়' নামেই এই বোধ তাড়িত হলে তাকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হবে, তা তিনি মানছেন না। ফলে আত্মহত্যা করা এই মানুষটাকে তিনি শেষে বরং ব্যঙ্গ করছেন। জীবনানন্দ তাকে বলছেন, তুমি ওই মর্গে গিয়ে পচে মরো, আমি বরং ওই অন্ধ পেঁচার কাছে যাই, যে কিনা অশ্বত্থ নামের ওই সংসার-বৃক্ষে বসে এখনো ইঁদুর খোঁজে। জীবনানন্দ ওই লোকটার মর্গে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে বুঝতে পারছেন কিন্তু মর্গে যাওয়াকে কোনো কাজের কাজ মনে করছেন না। জীবনানন্দ বরং ওই বুড়ো পেঁচাটার সঙ্গে মিলে জীবনের ভাঁড়ারে যা কিছু আছে সেগুলো সব উপভোগ করাকেই মোক্ষম কাজ বলে মনে করছেন। মৃত্যু দিয়ে কবিতা শুরু করলেও তার শেষ জীবনের জয়গানেই। আট বছর আগে তাঁর নিজের যে সত্তা মৃত্যুতাড়িত ছিল, সেই সত্তাকে যেন এক নতুন বোধোদয়ের প্রান্তে আনলেন তিনি।

BanglaBook.org

তিন

জন্ম-মৃত্যু, আনন্দ-বেদনার নাগরদোলা তৈরি করলেন তিনি এই কবিতায়। এই কবিতা তাঁর নিজের কবিজীবনেরও একটা মোড়। এরপর তাঁর কবিতার প্রধান সুর হয়ে উঠবে এই দ্বৈধতা। জীবনানন্দ যেন এই বোধিপ্রাপ্ত হয়েছেন যে দ্বৈধতাই মানুষের জীবনের এক অমোঘ সত্য। জরাথ্রুস্ট যেমন বলেছেন মানুষের আত্মা নিয়ন্ত্রণের জন্য শুভর আর অশুভের লড়াই চলছে নিরন্তর, চীনা দার্শনিক লওৎসুও যেমন ইন আর ইয়াং নামে মানুষের ভেতর সব সময় প্রবহমান আলো আর অন্ধকারের দুটা শক্তির কথা বলেছেন, জীবনানন্দ যেন তেমন একটা বোধেই পৌঁছেছেন। তিনি এরপর লিখেছেন, 'আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মত এই অন্ধকার...'

লিখেছেন :

...জানি না নাকি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ;—

আরও লিখেছেন :

একবার মৃত্যু লয়ে—একবার জীবনেরে লয়ে
ঘূর্ণির মতন বয়ে যে বাতাস ছেঁড়ে—তার মত গেছি বয়ে!

জীবনকে আলো-অন্ধকার, খারাপ-ভালো, আশা-নিরাশা আলাদা আলাদা থাকে না সাজিয়ে একই কাতারে দেখার বোধ জন্মেছে জীবনানন্দের। তিনি তাই লিখেছেন, 'অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ'।

চার

'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটা প্রকাশিত হবার পর এবার সজনীকান্ত আর কোনো ব্যঙ্গ নয়, ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি নিলেন। কৃষ্ণনগরের এক সাহিত্য সম্মেলনে সজনীকান্ত জীবনানন্দসহ আরও কয়েকজন নতুন কবিকে উদ্ধৃত করে বললেন, 'এই অস্বাভাবিক counterfeit বা জালিয়াতির অথবা চতুর ভান হইতে আধুনিক কবিরা মুক্তি লাভ না করিলে আধুনিক কাব্যের মুক্তি নাই...বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় কাব্যের নামে এই যে নিশ্চিত মৃত্যুর উপাসনা করিতেছেন এবং একটা ভ্রান্ত cult খাড়া করিয়া সেই তাণ্ডবে সকলকেই ঝাঁপ দিতে ডাকিতেছেন, তাহাতেই আশঙ্কান্বিত হইয়া আমি আজিকার এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলাম।'

শুধু সজনীকান্ত নন, এক নবীন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও জীবনানন্দকে কড়া আক্রমণ করলেন। তিনি জীবনানন্দের কবিতার মূল প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার সূত্র ধরে তিনি লিখলেন জীবনানন্দের ভেতর একধরনের আত্মঘাতী ক্লান্তি আছে, তিনি হতাশাগ্রস্ত, তাঁর কবিতার ভেতর কোনো আশাবাদ নেই। এর আগে 'ক্যাম্পে' কবিতা নিয়ে সজনীকান্তর সমালোচনার উত্তরে একটা লেখা লিখেছিলেন জীবনানন্দ, কিন্তু সেটা ছাপাননি। কিন্তু নীরেন্দ্রনাথের অভিযোগকে তিনি গুরুত্বের সাথে নিলেন। পত্রিকায় একটা নিবন্ধ লিখে এই অভিযোগের উত্তর দিলেন। তিনি লিখলেন, "আত্মঘাতী ক্লান্তি" আমার কবিতার প্রধান আবহাওয়া নয়, কোনদিনও ছিল বলে মনে পড়ে না। "আত্মঘাতী ক্লান্তি"র অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি লাশ কাটা ঘরের কবিতাটি বেছে বের করেছেন। ...কবিতাটি subjective নয় একটা dramatic representation মাত্র। কবিতাটি পড়লেই তা বোঝা যায় Hamlet বা Lear বা Machbeth এর "আত্মঘাতী ক্লান্তি"র সঙ্গে শেক্সপীয়রের যা সম্পর্ক, ও কবিতার ক্লান্তির সঙ্গে লেখকের সম্পর্কটুকুও সে রকম। কবিতাটিতে Subjective note শেষের দিকে ফুটেছে, কিন্তু সে তো লাশ কাটা ঘরের ক্লান্তির বাইরে—প্রকৃতির প্রাচুর্য ও ইতিহাসের প্রাণশক্তির সঙ্গে একাত্ম করে আনন্দিত করে রেখেছে কবিকে। তবু নিরেন বাবু লাশ কাটা ঘরের নায়ককে নায়কের স্রষ্টার সাথে ওতপ্রোত করে না জড়িয়ে কবিতাটি আস্বাদ করতে পারেন না মনে হয়। তিনি কী শেক্সপীয়রকে Mechbeth Bardolph Dogberry বা Golbs মনে করেন?

'আত্মঘাতী ক্লান্তি বা আজকের যুগের যে কোন রকম ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে

BanglaBook.org

হলে শুধু "আশাবাদী মনোভাব" কবচের মতন যে কোন জ্ঞান বিজ্ঞানালয় থেকে কিনে আনলে চলবে না। সে মনোভাব আশাবাদী হতে পারে, কিন্তু তা আরোপিত ও আড়ষ্ট—স্বাভাবিক ও সার্বজনীন নয়। "প্রচুর হয়েছে শস্য, কেটে গেছে মরণের ভয়" বালভাষিত কিন্তু কবিতা নয়, শস্য প্রচুর হলেই "মরণের ভয়" কেটে যায় না—আজকের এই জটিল শতাব্দীতে শিশুকে এ কথা কে বোঝাবে? নীরেন বাবু হয়তো মনে করেন এ রকম কতগুলো লাইন লিখতে পারলেই কবিতা হয়, আশাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং আত্মঘাতী ক্লান্তির থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উদয় হয়। কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি এত সোজা নয়।

'আধুনিক কবিতায় যে "আমি"র ব্যবহার করা হয়—যেমন "ইতিহাসযানে" একটু আধটু করেছি—সে "আমি" যে কবির নিজের ব্যক্তিগত সত্তা মোটেও নয়, কবিমানসের কাছে সমাজ ও কালের রূপ যেভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভূ সত্তা—আধুনিক কাব্য পড়বার সময় অনেক সমালোচক তা মনে রাখেন না...

একসময় জীবনানন্দের কবিতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে দুর্বোধ্য হিসেবে, এরপর অশ্লীল হিসেবে। এবার জীবনানন্দ বিষয়ে উঠল নতুন অভিযোগ, তিনি নিরাশাবাদী, প্রগতিবিরোধী।

BanglaBook.org

অন্ধকার এবং স্তব্ধতায় একটা মোম

এক

এ সময় আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটা বই সম্পাদনা করলেন *আধুনিক বাংলা কবিতা* নামে। তাঁরা কবি নন কিন্তু বিদগ্ধ মানুষ হিসেবে পরিচিত। তাঁদের সে বইয়ে তাঁরা আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-কে। এই দুই কবিকে তাঁরা উপস্থাপন করলেন সবচেয়ে সমাজ-সচেতন এবং প্রগতিপন্থী হিসেবে। সেই সংকলনে অতিরিক্ত হিসেবে জীবনানন্দের কয়েকটি কবিতা অবশ্য যুক্ত করলেন তাঁরা। আবারও এর প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন বুদ্ধদেব বসু। এক প্রবন্ধে লিখলেন, 'আমার পক্ষে সবচেয়ে বেদনার কারণ জীবনানন্দ, যার ধূসর পাণ্ডুলিপির পরও আরো কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা বেরিয়ে গেছে ততদিনে, অথচ যিনি স্থান পেয়েছিলেন অতি সংকীর্ণ: আমি বহু তর্ক করে অন্যদের বোঝাতে পারিনি যে জীবনানন্দ শুধু "বর্ণনাধর্মী" লিপিকার নন, অতি গভীর ভাবনাঋদ্ধ এক কবি, আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।'

দুই

অকবিদের এসব কবিতা নিয়ে আলোচনায়, কবিতার বই সম্পাদনায় বিরক্ত হয়েই বুঝি এই সময় জীবনানন্দ লেখেন :

'বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে; ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা;
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক, দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

কবিতার হাঙরভরা সাগরে তাঁর মা তো তাঁকে নামিয়ে দিয়েছেন বহু আগেই। জীবনানন্দ জানেন সেই সাগরে সাঁতার কাটবার বিপদ এবং রোমহর্ষ। এই কবিতাটা থেকে বোঝা যায়, জীবনানন্দের স্তিমিত মনে ক্রমশ রাগ জন্ম নিচ্ছে।

তিন

এ সময় রবীন্দ্রনাথও *বাংলা কাব্য পরিচয়* নামে বাংলা কবিতার একটা সংকলন প্রকাশ করলেন। সেখানে জীবনানন্দের একটা কবিতা অন্তর্ভুক্ত করলেন তিনি। বুদ্ধদেবের *কবিতা* পত্রিকায় এই কবিতাটা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে'। 'মৃত্যুর আগে' নামের এই সেই কবিতা :

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;

এটা একটা দীর্ঘ কবিতা। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটা অন্তর্ভুক্ত করলেন ঠিকই কিন্তু তাকে নিজের মতো কেটেছেঁটে ছোট করে নিলেন। এ ব্যাপারটা নিয়েও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানালেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর *কবিতা* পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখে এভাবে কবির অনুমতি ছাড়া কবিতাকে কাটাছেঁড়া করায় রবীন্দ্রনাথের কড়া

BanglaBook.org

সমালোচনা করলেন বুদ্ধদেব। তিনি লিখলেন একজন কবির কবিতা এভাবে নিজের মর্জিমতো কেটেছেঁটে ছাপানোর চাইতে সেটা বরং পুরোপুরি বাদ দেওয়াই উচিত ছিল। বুদ্ধদেব লিখলেন, 'সাহিত্য ক্ষেত্রে কেউ কারো কৃপাপ্রার্থী নন। দয়া গ্রহণের চাইতে স্পষ্ট উপেক্ষার বর্জন অনেক সম্মানের।'

প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের অবহেলার মুখে বুদ্ধদেব একাই লড়াই করে যেতে লাগলেন জীবনানন্দের পক্ষে। তিনি তাঁর *কবিতা* পত্রিকায় লিখলেন, '...সত্যি বলতে আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনি (জীবনানন্দ) বোধ হয় সবচেয়ে সক্রিয়। তার কল্পনা সর্বদাই নব নব রূপের সন্ধানী, তার রচনাভঙ্গী গভীরতর পরিণতির দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু এতদিনেও আমাদের সাহিত্যের বাজারে তার খ্যাতির রোল ওঠেনি। আমাদের সুধীশ্রেণীও তার কাব্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত, এমন মনে হয় না।...জীবনানন্দকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি বলে বিবেচনা করি এবং *ধূসর পাণ্ডুলিপি* তার প্রথম পরিণত গ্রন্থ।...আমাদের দেশে কোন ক্ষেত্রেই কোনরকম ষ্টান্ডার্ড নেই, সাহিত্যে একেবারেই নেই। প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হয় অ-সাহিত্যিক কারণে। আমাদের মূল্যজ্ঞানহীন সমাজকে মাঝে মাঝে নাড়া দেয়াই দরকার, মাঝে মাঝে জোর করেই বলা দরকার। এদেশে মাতৃভাষার সাহিত্যকে যারা শ্রদ্ধা করে ভালোবাসেন (যদি আজকালকার দিনে এমন কেউ থাকেন) তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপি* নিজের গরজেই পড়বেন, কারণ এই বইয়ের পাতা খুললে তারা একজনের পরিচয় পাবেন যিনি প্রকৃতই কবি এবং প্রকৃতই নতুন...।'

BanglaBook.org

চার

ওই এক বুদ্ধদেব বসু তখন কেবল জীবনানন্দের পতাকা উড়িয়ে আসছেন। অন্য লেখক-কবিদের সবাই কোনো না কোনো তাঁবুর ভেতর আছেন কিন্তু জীবনানন্দের মাথার ওপর কোনো আচ্ছাদন নেই। তিনি খালি মাঠেই দাঁড়িয়ে আছেন একাকী। তাঁকে যে তাই থাকতে হবে তিনি তা বুঝে গেছেন। একসময় যেচে মানুষের কাছ থেকে তাঁর কবিতার মূল্যায়ন চেয়েছেন। এখন আর চান না। তাঁর কবিতা নিয়ে নানা সমালোচনার মুখে বেশ অনেকটা রাগ, ক্ষোভ, অভিমান নিয়েই সিদ্ধান্ত নিলেন কবিতা বলতে তিনি কী বোঝেন, সেটা লিখে জানাবেন। *কবিতা* পত্রিকায় এরপর তিনি একটা প্রবন্ধ লিখলেন, যার প্রারম্ভিক লাইন এরপর হয়ে উঠবে প্রবাদ। তিনি লিখলেন, 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য বিকীরণ তাদের

সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না, যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতর অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্যপ্রাপ্ত হয়; নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করার অবসর পায়।...আমি বলি না যে কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যাখচিত অভিব্যক্ত সৌন্দর্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাককল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহতে দিতে চায় আভা তা হলে কবিতা সৃষ্ট হয় না—পদ্য লিখিত হয় মাত্র—ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্য রকম, কোনো প্রাকনির্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট দানা বেঁধে থাকে না কবির মনে—কিম্বা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ, কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা-উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন, কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে, বুঝতে পারে যে তারা সঙ্গতির ভিতর রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না, কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়...'

এরপর তিনি তাঁর নিজের কবিতা লেখার মুহূর্তের বর্ণনা দেন, '...আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ড বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়—একটি পৃথিবীর অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয় এবং ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতর সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানারকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশী করে; কিন্তু যাদের প্রতিভা ক্ষণস্থায়ী পাঠকের মন কোনো আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তি বোধ করে শুধু এবং বৃথাই কাব্যশরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়...যে পর্যন্ত জনসাধারণের হৃদয় নতুন দিগবলয় অধিকার না করবে সে পর্যন্ত কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর কবির স্থূল উদ্বোধন ছাড়া বাজারে-বন্দরে এবং মানবসমাজ ও সভ্যতার সমগ্রতার ভিতর কোনো প্রথম শ্রেণীর কাব্যের প্রবেশ থাকবে না...

চারদিকের অনাত্মীয় অবহেলার মুখে কী আর করতে পারেন তিনি? অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটা মোমের মতন জ্বলে ওঠে প্রথম শ্রেণির কবিতা জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া? জীবনানন্দ তখন সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছেন। লেখা তাঁর কাছে জীবন ধারণেরই অপর নাম।

BanglaBook.org

খোঁপার ভিতরে চুলে, নরকের কালো মেঘ

এক

গত শতাব্দীর ত্রিশ দশকে বাস্তবিকই পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবার উপক্রম হয়েছে। আঘাত নেমে আসছে মানুষ আর চরাচরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জের ধরে ইউরোপের ঔপনিবেশিক দেশগুলোর ভেতর শুরু হয়েছে ঘোর টানাপোড়েন। শুরু হয়েছে সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব। তার প্রভাব পড়ছে পৃথিবীর নানা দেশে। পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। হিটলার যে বছর জার্মানিতে ক্ষমতায় এল, সেই ১৯৩৩ সালে লেখা তাঁর গল্প 'সঙ্গ নিঃসঙ্গ'তে দেখা যাচ্ছে, সেই বরিশালে বসে জীবনানন্দ হিটলারের গতিবিধি খেয়াল করে যাচ্ছেন। সেই গল্পের এক চরিত্র বলছে, 'সমস্ত সকাল চুরুট জ্বালাইয়া, জানালার কাছে চেয়ারটা টানিয়া লইয়া, একবার আমি আমের ডালপালার ভিতর হলুদ বউ কথা কও পাখিটির দিকে তাকাইয়া দেখিতাম—বহুক্ষণ অন্যমনস্কতার পর লাইনে নাজিদের কাণ্ডকারখারা, হিটলারের বিচিত্রতা, মস্কো ট্রায়াল, লুয়াংসির কাছে জাপানীদের অমানুষিক যুদ্ধ—এইসব দূরদূরান্ত, দিগন্তের এবং নিকটের ঘরের নানারকম চিত্তাকর্ষক সংবাদ ও অসংলগ্ন মন্তব্য লইয়া সমস্ত সকালবেলাটা জমিয়া উঠিত মন্দ না।'

জীবনানন্দ নিয়মিত *স্টেটসম্যান* পত্রিকাটা পড়তেন। তিনি তখন দেখছেন জার্মানে হিটলারের উত্থান, ইতালিতে মুসোলিনির। রেডিও, পত্রিকা, জাহাজ, বিমান চলাচলের মাধ্যমে পৃথিবীর দেশগুলো পরস্পরের নিকটবর্তী হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে বিশ্বায়নের উপাদান। এতে নানা দেশের ভেতর পারস্পরিক সম্পর্কগুলো চাপের ভেতর পড়ছে। পরস্পরের লাভ-ক্ষতির হিসাব হচ্ছে। সমঝোতার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু বিশেষ লাভ হচ্ছে না। বরং বাড়ছে পরস্পরের বৈরিতা। তাতে বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে। পৃথিবী যেন আরও একটি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সন্তানদের পেনসিল কাটতে কাটতে তখন তিনি নিজের দাম্পত্য নয়, সাহিত্য প্রতিষ্ঠা নয়, শঙ্কিত হয়ে উঠছেন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রেম নয়, প্রকৃতি নয়, তাঁর মনজুড়ে তখন পৃথিবীব্যাপী এক আসন্ন সংঘর্ষের শঙ্কা। এই সময়টাতেই ১৯৩৮-এ 'পৃথিবী ও সময়' নামে একটা প্রবন্ধ লেখেন জীবনানন্দ।, আজকের বিশ্বায়নের ডামাডোলের বহু আগে উচ্চারণ করলেন অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী, 'পৃথিবীর জাতিদের পরস্পরের ভিতর মৈত্রী স্থাপনের যে চেষ্টা কিছুদিন থেকে চলে আসছে—যার ফলে বিভিন্ন জাতীয়তা পৃথক সভ্যতা ও সংস্কৃতি মেনে নিয়েও এক অচ্ছিন্ন মানবসমাজের আশ্রয়ে মানুষ ও জাতি অন্তর্লীন অথচ স্বাধীন হয়ে থাকবার সুযোগ পেতে পারে—আনন্দে ও শান্তিতে—সে প্রয়াস যতটা

BanglaBook.org

কূটনৈতিক ততটা বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পারেনি এবং যেটুকু বা সংস্কারমুক্ত সত্যার্থী হতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয় তার চেয়ে ঢের কম অনুপাতে আন্তরিক হতে পেরেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পৃথিবী আজকের চেয়ে বড় ছিলো—মানে দীর্ঘতর ছিলো। যানশিল্পের যে অভাবনীয় দ্রুতগতির ফলে দেশে দেশে দূরত্ব বিচিত্রভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে—এক জাতি আরেক সুদূর জাতিরও হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিকট প্রতিবেশী, প্রাকসামরিক পৃথিবীতে এটা সম্ভব ছিল না, এ জিনিস কষ্টকল্পনার ব্যাপার ছিল প্রায়।... তাছাড়া দেশে দ্বীপে এই নিকট যোগাযোগের ফলেই সুদূরগত জাতিকেও প্রায় মুখচেনা পড়শির মতো দেখবার বুঝবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে—মানসিক দূরত্বের ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে, দৃষ্টিরীতির বৈষম্যের মানে ও মর্মার্থ গ্রহণ করতে পারা ক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠছে। এই সবেরই সঙ্গত সুফল আশা করতে পারা যেত, সকলেই যখন কাছে, যে যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কেউ দূরে নয় বিচ্ছিন্ন নয়, তখন সকল জাতিকে নিয়ে যার যার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জাতিস্বকীয়তা সত্ত্বেও শান্তির ও মৈত্রীর হেতুভূমিতে এক অবিচ্ছিন্ন মানবপরিমণ্ডল গঠন করবার ইচ্ছা ও আয়োজন অসঙ্গত মনে করা যেতে পারত কি? কিন্তু সৎ দার্শনিকের মনের নিভৃতে যে বিধানই চলতে থাকুক না কেন—মানবমৈত্রীর পরিবর্তে জাতিবিদ্বেষ, দেশে দেশে সংঘর্ষ নিরবচ্ছিন্ন রক্তান্ধকার আধুনিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা অশুদ্ধ ভাবনা ও বিমিশ্র বাসনার শূন্যতা ও নিষ্ফলতায় আড়ষ্ট করে রাখছে। পরের জিনিসে লোভ, নিঃসহায়কে নিংড়ানো, শোকাবহ স্বৈরাচার, বারবার যুদ্ধ, মন্বন্তর ও কালোবাজারের অন্ধ বিমূঢ়তা সৃষ্টি করে চলেছে।'

BanglaBook.org

দুই

প্রবন্ধে যে কথা বলেছেন, সে কথা আবার বলেন কবিতাতেও :

পরস্পরের থেকে দূরে থেকে, ছিন্ন হয়ে; বিরোধিতা করেছে
সকলের আগে নিজে—অথবা নিজের দেশ—নিজের নেশন
সবের উপরে সত্য মনে করে জ্ঞানপাপে অস্পষ্ট আবেগ...

এই সময়টাতেই জাপান আক্রমণ করল চীনের সাংহাই। জীবনানন্দ 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' কবিতায় লিখলেন :

পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দেখে; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রূপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরীতকী শাখাদের নিচে যেন হীরার স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস;
নৃমুণ্ডের আবছাড়া—নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ—মধুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরের মতো :
পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন;
খোঁপার ভিতরে চুলে : নরকের নবজাত মেঘ
পায়ের ভঙ্গির নীচে হঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

এই কবিতা নিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা হয়েছে তবে হংকং, সাংহাই, নরকের কালো মেঘ, পিপুল গাছে বসে থাকা একা পেঁচা ইত্যাদি যে একটি অশুভ সময়ের প্রেক্ষাপট এবং জাপানের বোমাবর্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটা বোঝা যায়। এর কিছুকাল পরই তাঁর আশঙ্কা সত্য প্রমাণ করে হিটলার আক্রমণ করেন পোল্যান্ড। শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধ ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠলে জীবনানন্দ ভারাক্রান্ত মনে লেখেন

ইতিহাস অর্ধসত্য কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়;
তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে, মানুষের মন
জানে জীবনের মানে, সকলের ভালো করে জীবনযাপন।
কিন্তু সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল,
মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।

BanglaBook.org

তিন

যুদ্ধ ধীরে ধীরে ইউরোপ ছাড়িয়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ছড়াতে শুরু করে। একপর্যায়ে তার ছোঁয়া লাগে বাংলায়। বাংলার আকাশে দেখা দেয় যুদ্ধবিমান, মাটিতে আর্মি কনভয়, পথে সৈন্য, চলে নিষ্প্রদীপ মহড়া। চারদিকের বাস্তবিক জীবনে এই সব নতুন অনুষঙ্গ দেখা দিতে থাকে তাঁর কবিতাতেও

জীবনানন্দ লেখেন, আকাশকে নিরালম্ব করে বোমারু বিমান উড়ে যায়...

লেখেন :

এছাড়া দিনের কোন সুর
নেই,
বসন্তের অন্য সাড়া নেই
প্লেন আছে অগণন প্লেন
অগন্য এয়োরোড্রাম
রয়ে গেছে...

আরও লেখেন :

লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী

মাঝে মাঝে
এম্বুলেন্স গাড়ির ভিতরে
রণক্লান্ত নাবিকেরা ঘরে
ফিরে আসে...

BanglaBook.org

যুদ্ধ বাড়ছে, হিটলার আর নরওয়েজিয়ান সেনানায়ক কুইসলিংয়ে আঁতাত হলে জীবনানন্দ লিখলেন :

কুইসলিং বানাল কি নিজ নাম—হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল...

যুদ্ধ তখন ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে :
পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ;
পুবদিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা;
আফ্রিকার প্রেতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা;

একবার অশ্লীল, অতঃপর পাগল, অবশেষে মাতাল

এক

এ সময় সাহিত্যিকদের ভেতর গঠিত হলো 'ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। শুরু হলো প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের নতুন আন্দোলন। তাঁরা ঘোষণা করলেন, 'আশাবাদী সাহিত্য' রচনা করতে হবে। তাঁদের ইশতেহারে বললেন, 'আমরা চাই সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলুক আর যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আমরা করেছি তাকে এগিয়ে আনুন...।' ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন সমাজতন্ত্রকে। অর্থাৎ প্রগতিশীল লেখককে হতে হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের পক্ষের মানুষ। রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে পৃথিবীর রাজনীতি তখন দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদিকে পুঁজিবাদ আর অন্যদিকে সমাজতন্ত্র। তৃতীয় বিশ্বের নানা প্রান্তের তরুণ লেখকদের মনে তখন বৈষম্যহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। মার্ক্সবাদী নন্দনতত্ত্বের আলোকে সাহিত্যে তখন 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের' জোয়ার। সাহিত্যিকদের ভেতর বিভাজন। যাঁরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে তাঁরা প্রগতিশীল, যাঁরা পক্ষে নন তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল। জীবনানন্দ যতই তাঁর চোখ পৃথিবীর উত্থান পতনের দিকে রাখুন না কেন, যতই তিনি রাজনীতি, সমাজকে তাঁর কবিতা মূল উপজীব্য করুন না কেন, নতুন প্রগতিশীল লেখকেরা তাঁকে তাঁদের দলে ভেড়াতে রাজি নন। তাঁরা মনে করেন তাঁর কবিতায় ভবিষ্যৎ সমাজের আশার কথা নেই, নেই সাম্যবাদী স্বপ্নের কথা। প্রগতিশীল সাহিত্যের অগ্রগামী লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক লেখায় লিখলেন :

'দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে দুটি দশক জুড়ে দেশের মানুষ কী দেখেছে? পৃথিবীর দুই গোলার্ধে দু পা রেখে বিরাট এক ভূখণ্ডের শৃঙ্খলমুক্ত মানুষ উঠে দাঁড়ায়। তার ট্রাক্টরের চাকায় মাঠের বুকে নেচে নেচে ফসলের সোনালী স্বপ্ন। তার এক হাতে সুখ, অন্য হাতে শান্তি। ঘরে ঘরে দেয় প্রাচুর্য। মূল্যবান বহুবর্ণ সজ্জায় জীবনকে সাজায়। দুনিয়া জোড়া দুঃশাসনের হাতে তুলে দেয় সে মৃত্যুর শমন। আর আকাশে মাথা তুলে বন্ধন জর্জরিত সমস্ত মানুষকে ডেকে বলে, ওঠো, জাগো। জয়ের আশ্বাস নিয়ে দেশে দেশে শৃঙ্খলিত মানুষ জেগে ওঠে। আসমুদ্রহিমাচলে জেগে ওঠে সংগ্রামের আগুন। জাতীয় মুক্তি এক বিশাল অর্থ পায়-জনতা দাবী করে সমৃদ্ধ জীবন...ইতিহাসের এই একই যুগপর্বে কী দেখান "বনলতা সেনের" কবি জীবনানন্দ দাশ?..."হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি"...জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় তারস্বরে জানিয়ে দেন সময়ের গণ্ডি দিয়ে বাঁধা নন তিনি। তাঁর কাছে "হাজার বছর শুধু খেলা করে"। সময়কে হাজার বছরের একেকটা গ্রন্থি দিয়ে যিনি

BanglaBook.org

মাপেন, দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী দুটি শীর্ণ দশক মহাসমুদ্রে বুদ্বুদের মতো তার কাছে মিলিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী?...প্রাচীনকালের গৌড়ীয় শুঁড়িখানায় থাকত এক রকমের চিহ্ন, সেই চিহ্ন দেখে ভেতরে ঢুকতেন পান রসিকেরা। জীবনানন্দের কবিতার দুর্বোধ্য সংকেত অনেকটা সেই চিহ্নের মত। ভেতরে ঢুকলে নেশাগ্রস্ত হওয়া যায়। তখন বেলের খোলায় পৃথিবীকে মনে হয় তালগোল পাকানো এক অসম্বদ্ধ প্রলাপ, প্রেম যেন হারানো অতীতের ছায়াচ্ছন্ন স্মৃতি, আক্রান্ত মানুষের শেষ আশ্রয় প্রকৃতির নির্জন গুহা।...'

বিপ্লবী সাহিত্য রচনার উত্তুঙ্গ উত্তেজনায় সুভাষের কাছে জীবনানন্দের কবিতাকে মনে হলো শুঁড়িখানার মাতলামি। এর আগে জীবনানন্দ তকমা পেয়েছেন পাগলের, এবার পেলেন মাতালের। এর আগে জীবনানন্দ তিরস্কৃত হয়েছেন রক্ষণশীল সাহিত্যের ধারক সজনীকান্ত প্রমুখের কাছ থেকে, তিরস্কৃত হয়েছেন আধুনিকতাবাদী সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখদের কাছ থেকে, এবার তিরস্কৃত হতে শুরু করলেন প্রগতিবাদীদের কাছ থেকে। সে সময় বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত প্রধান তিনটা ধারারই শত্রু হয়ে উঠলেন তিনি।

দুই

ঢাল দিয়ে চারদিক থেকে ছুটে আসার তির আর কত ঠেকাবেন জীবনানন্দ? তিনি ক্লান্তিবোধ করতে লাগলেন। যত অভিযোগই আসুক তিনি তো গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে কবিতা শুধু আশাবাদের উদ্‌যাপন নয়, ফরমায়েশ করে কবিতা লেখা হয় না, আশা-নিরাশার দোলাচলে চলা সত্তার গভীরতম দ্বন্দ্বকে ধারণ করতে চাওয়াই কবিতার আরাধ্য। তিনি আবার তাঁর কবিতার পক্ষে কলম ধরলেন। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের এক প্রকাশনায়, 'কেন লিখি' এই শিরোনামে একটা লেখা লিখলেন জীবনানন্দ, আবারও বললেন, 'কবিতা কি, কি তার কাজ—কি করে কবিতা গ্রহণ করতে হবে—এসব জিজ্ঞাসা সম্পর্কে কবি ও পাঠকের ধারণা ক্রমশ আরো পরিচ্ছন্ন না হলে উভয় পক্ষই অস্বস্তি বোধ করবেন। আমার এবং যাদের আমি জীবনের পরিজন মনে করি তাদের অস্বস্তি বিলোপ করে দিতে না পেরে, জ্ঞানময় করবার প্রয়াস পাই এই কথাটি প্রচার করে যে জীবন নিয়েই কবিতা যদি ভাবা যায় যে কবিতা মানুষের আধুনিক জীবনকে নিরন্তর ভবিষ্যতের শ্রেয়তর সামাজিক জীবনে পরিণত করে চলেছে তা হলে সে ধারণা ঠিক হবে না। কবিতার ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসে বুঝে নিতে পারা যায় যে কবিতা মানুষের কল্যাণ মানসকে অপরোক্ষভাবে চরিতার্থ করবার সুযোগ না দিয়ে বরং স্বর্গ এবং আঘাটা সবেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকটে পরিস্ফুট করে...কবিতার ওপর বাস্তবিক কোনো ভার নেই। কারু নির্দেশ পালন করবার রীতি

BanglaBook.org

নেই কবিমানসের ভিতর কিম্বা তার সৃষ্ট কবিতায়। অথচ সৎ কবিতা খোলাখুলিভাবে নয় কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দ সমগ্রতার উৎকর্ষে শোষিত মানবজীবনের কবিতা, সেই জীবনের বিপ্লবের ও তৎপরবর্তী শ্রেষ্ঠতর সময়ের কবিতা।'

কবিতা যদি যথার্থ সৎ হয়, তবে তা এমনিতেই একাধারে বিপ্লব এবং বিপ্লব পরবর্তীকালেরও কবিতা, এমনই মনে করেন জীবনানন্দ। সেই সময়ের পৃথিবীজুড়ে বিপ্লবী সাহিত্যের যে উত্তেজনা তাকে তিনি অস্বীকার করতে চান না কিন্তু জীবনানন্দ চোখ রাখতে চান কালের বিস্তৃত প্রান্তে। তাই যেকোনো সমসাময়িক উত্তেজনার ব্যাপারে তিনি থাকতে চান সতর্ক।

তিন

যে রুশ বিপ্লব প্রগতিশীল লেখকদের মূল অনুপ্রেরণা, জীবনানন্দ সে ব্যাপারেও তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণের কথা জানান তাঁর 'যুক্তি, জিজ্ঞাসা ও বাঙালী' নামে লেখা এক প্রবন্ধে, ...ক্রমে ক্রমে রুশ বিপ্লবের সাড়া (ফরাসি বিপ্লবকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ থেকে শুরু করে ইউরোপের সাদামাটা গদ্যপ্রাণ লোকও যে আশা বিশ্বাসের চোখে দেখেছিল ঠিক সে রকম নয় অবশ্য, ঘটনাটা হয়ে যাবার খানিকটা পরে কিছুটা অস্পষ্টভাবে ভারতীয় সমাজের কোনো কোনো স্তরে রুশ বিপ্লবের মর্ম এসে পৌঁছাতে পেরেছিল), সমাজতন্ত্রবাদ (লেনিন ও ট্রটস্কির রাশিয়ার) ও মার্ক্সবাদে তখনকার বাঙালী মনের অনেকখানি অসংগতি কেটে গেল, মনে হয়েছিল রামমোহন ও তার জিজ্ঞাসা যুক্তি কাজ, বিদ্যাসাগর মশায়ের কাজ ও যুক্তি যা দিয়ে গেছে তার পরের বিশেষ ধাপ হিসেবে এই সব বিপ্লবের পূর্ব ও উত্তর সিদ্ধান্ত, নতুন চৈতন্য ও বিশ্লেষণের খুব দরকার ছিল। কিন্তু রুশ বিপ্লবের ফলে বাংলায় (ও ভারতবর্ষে) বলশেভিক, সোভিয়েত প্রভাব সাময়িক ও অনেক স্থলে প্রশস্থ ভাবে দেখা দিলেও সে পথে চলার মতো তেমন কোন যোগ্য চিন্তা বা কাজকর্ম দেখা গেল না...মার্ক্সবাদের সত্য মিথ্যা ভেদ করে জিজ্ঞাসার একান্ত মূল্যের ওপর সে দর্শনে যে জোর দেওয়া হয়েছে তার প্রভাবও শিথিল হয়ে পড়েছে বাঙ্গালীর চিন্তা জীবনে—খুব সম্ভব কয়েকজন পণ্ডিত অপণ্ডিতের তর্কবিতর্কের ভিতরই মার্ক্সবাদ বাংলায় (ও ভারতবর্ষে) আজ খানিকটা সূক্ষ্মভাবে স্থিত, আমাদের দেশে এর সামাজিক ব্যবহারের চেষ্টাচিহ্ন রয়েছে কিন্তু বেশি নয়। জীবন ও সমাজের (বা কোন কিছুরই) কোন শাশ্বতী সুধী বা শাশ্বত মীমাংসা আছে বলে মনে হয় না।'

বাংলায় মার্ক্সবাদী আন্দোলনের পরিণতির যে চালচিত্র তিনি দেখেছেন, তা আশ্চর্যজনকভাবে সাম্প্রতিকও। তাঁর কালে যাঁরা সমাজতন্ত্রের আদর্শকেই জীবনের শাশ্বত মীমাংসা ভেবে নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন, তাঁরা আজকের পৃথিবীতে ফিরে এলে

BanglaBook.org

জীবনানন্দকে হয়তো ধন্যবাদই দিতেন তাঁদের আগাম সতর্ক করার জন্য। শাশ্বত মীমাংসার সরল বিশ্বাস তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন অনেক আগেই। প্রগতিশীল সাহিত্যের নামে যে এক ডামাডোল শুরু হয়েছিল তখন, তার একটা মজার গল্প শুনিয়েছেন জীবনানন্দের ছাত্র শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'আমরা তখন লেখায় হাত মকশো করছি। কবিতা গল্প প্রবন্ধ কত কী। আর মুখে "প্রগতি সাহিত্যের বাণী"র খই ফুটছে। এই সময় কলেজে একদিন তার সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় এক প্রগতিশীল ছাত্র "কবি" হঠাৎ কথার মাঝখানেই তাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি জনগণের কবিতা লেখেন না কেন?" তার সাহস দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

'জীবনানন্দ বাবু এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েকবার তার এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি এ প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের ভেতর আছো বুঝি?"

'সে বলল, "হ্যাঁ অবশ্যই। আমরা এই সমাজব্যবস্থাকে বদলাতে চাই, কায়েম করতে চাই শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। সেখানে কবি এবং সাহিত্যিকেরাও আমাদের সঙ্গে আসবেন তাদের বুর্জুয়া, পেটি বুর্জুয়া শ্রেণী পরিত্যাগ করে—মার্ক্সবাদ যে নতুন পথ দেখিয়েছে..." কথার মাঝখানেই জীবনানন্দ বাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "তুমি কার্ল মার্ক্স পড়েছো? ডস ক্যাপিটাল?"

ছাত্র কবিটি থতমত খেয়ে বলল, "না।"

'জীবনানন্দ বাবু একটুকাল তার দিয়ে তাকিয়ে থেকে হাসি গোপনের চেষ্টা করেও অকস্মাৎ উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন। হঠাৎ সে হাসি। এমন আচম্বিতে বেরিয়ে আসা—যে অবাক হয়ে দেখতে হয় তাকে। সঙ্গে হাসা যায় না।

'ছাত্রটি ভ্যাবাচেকা খেয়ে পালিয়ে বাঁচল।...'

যেকোনো ব্যাপারেই অতি বিশ্বাস আর অতি অবিশ্বাস দুটাই পরিহার করতে চেয়েছেন জীবনানন্দ। ফলে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী উভয় পক্ষেরই আক্রমণের শিকার হয়েছেন তিনি।

BanglaBook.org

মহীনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায়

এক

ব্যক্তিজীবনে যুদ্ধ করতে করতে, প্রতিকূল সময়ের সমুদ্র পাড়ি দিতে দিতে জীবনানন্দ যখন খানিকটা কূলে উঠেছেন, তখন দেখলেন বাইরের পৃথিবী ক্রমশ

তছনছ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর এক জীবনে দুই-দুইটা বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির ভেতর পড়েছেন তিনি। সমকাল, মহাকাল তাঁকে সব সময় ভাবিয়েছে। একদিকে নিজের জীবনের চড়াই-উতরাই, অন্যদিকে পৃথিবী, দেশের চড়াই-উতরাইয়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে জীবনানন্দ আরও মনোযোগ দিলেন 'সময়' ধারণাটার ওপর। তিনি 'সময়' নিয়ে দার্শনিক প্রশ্নগুলো দিয়ে তাড়িত হলেন। জীবনানন্দ হাজার বছর ধরে পথ হাঁটার কথা আগেই বলেছেন। সেই পথ হাঁটাকে, সেই সমকাল মহাকালকে এক বিন্দুতে দেখতে পারার ব্যাপারটাকে এক অদ্ভুত কবিতায় তখন তুলে আনলেন জীবনানন্দ। কবিতার নাম 'ঘোড়া'। ছাপা হলো *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় ১৯৪০-এ

আমরা যাইনি ম'রে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়
মহীনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনো ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডায়নামোর 'পরে।

আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়;
বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে;
চায়ের পেয়ালা ক'টা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে

হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশে পাইস-রেওয়াতে
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এইসব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

BanglaBook.org

সজনীকান্তের কলম আবার সরব হয়ে উঠল। সজনীকান্ত লিখলেন, '"পার্ট"কে "হোল"-এর মর্যাদা দেওয়া অথবা অস্ফুট প্রাণকে গোটা প্রাণীর সম্মান দেওয়ার রেওয়াজ আজকাল বড় বেশি দেখা যাইতেছে... চতুরঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশ (জীবানন্দ নহে) "ঘোড়া" কবিতায় এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। ঘোড়ার ডিমে তা দিলে ঘোড়া হইতে পারে, ইহা মানিয়া লইয়াই আমরা বলিব, "ঘোড়ার ডিম"কে ঘোড়া বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে।

জীবনানন্দের বিরূপ সমালোচনাকারীদের প্রতিনিধি হয়ে সজনীকান্ত তো লাগাতার তাঁর কলম সক্রিয়ই রেখেছেন। তাঁর পক্ষে এযাবৎ কলম ধরেছেন শুধু বুদ্ধদেব বসু। কিন্তু দেখা গেল এবার মাঠে তাঁর পক্ষে নেমেছেন আরেক লেখক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। *নিরুক্ত* নামে একটা পত্রিকা সম্পাদনা করেন তিনি তখন। সঞ্জয়

জীবনানন্দের এই কবিতাটার ভূয়সী প্রশংসা করলেন, লিখলেন, জীবনানন্দের 'ঘোড়া' কবিতাটা বাংলায় 'সুররিয়ালিস্ট' কবিতার প্রথম সফল উদাহরণ।

দুই

এই কবিতা যখন লিখছেন জীবনানন্দ, তার বেশ আগেই ইউরোপে শুরু হয়েছে সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন। ফরাসি লেখক আঁদ্রে ব্রেতো ঘোষণা করেছেন সুররিয়ালিজমের মেনিফেস্টো। তাঁরা দাবি করছেন, জীবনে বাস্তব যেমন সত্য, স্বপ্নও তেমন সত্য। শিল্প-সাহিত্যে তাই বাস্তব আর স্বপ্নকে একাকার করে দিতে হবে। অতিমাত্রায় বাস্তববাদিতা, যুক্তিবাদিতার বিরোধিতা করেন তাঁরা। তাঁদের কবিতায়, চিত্রকলায় দেখা দেয় অদ্ভুত ইমেজ, অযৌক্তিক উপমা। স্থিতিস্থাপক সময়কে ধরতে সুররিয়ালিস্ট চিত্রকর সালভাদর ডালি আঁকলেন গাছ থেকে গলে গলে পড়া ঘড়ি। জীবনানন্দ সরাসরি কোনো দেশীয় বা ইউরোপীয় আন্দোলনে শরিক হননি। তবে বিশ্বসাহিত্যের নানা ধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছে বরাবরই। এই কবিতাতেও আছে সুররিয়ালিজমের উপাদান। আছে বাস্তব আর স্বপ্নকে মিলিয়ে দেখা আর সময়কে এক মহাকালের ব্যাপ্তিতে স্থাপন করার চেষ্টা।

অন্যান্য অনেক কবিতার মতোই জীবনানন্দের এই কবিতাটা আপাতভাবে সহজ চেনা শব্দ, বাক্য দিয়ে লেখা অথচ তারপরও কেমন যেন অধরা রয়ে যায়। কবিতা থেকে একটা সাধারণ ব্যাপার বোঝা যায় যে জ্যোৎস্না রাতে জনৈক মহীনের কতগুলো ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে প্রান্তরে। এই দৃশ্যটির ভেতর কেমন একটি মাদকতা আছে। এই দৃশ্যের নেশায় পড়েই বুঝি কলকাতার কিছু ছেলে জীবনানন্দ মারা যাবারও বহু বছর পর সত্তর দশকে এসে 'মহীনের ঘোড়াগুলো' নামে তৈরি করে ফেলে এক গানের ব্যান্ড। বাংলা গানে নিয়ে আসে এক নতুন মাত্রা।

জীবনানন্দ তাঁর এক পাঠককে লেখা চিঠিতে একবার লিখেছিলেন, '...মহাবিশ্বের ইশারা থেকে উৎসারিত সময় চেতনা, "কনসাসনেস অব টাইম অ্যাজ এ ইউনিভার্সাল" তা আমার কাছে একটি সঙ্গতি সাধক অপরিহার্য সত্যের মত। কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ জিনিসটা আমি গ্রহণ না করে পারিনি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে।...

আইনস্টাইনের সময়ের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বিষয়েও জীবনানন্দ ভালোভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন একটা সীমিত কালে, সেটা ব্যক্তিকাল, কিন্তু আমরা সবাই আবার মানবজাতির অংশ। ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু হলেও মানবপ্রজাতির মৃত্যু হয় না, প্রত্যেক মানুষ তাই একটা

BanglaBook.org

মানবকালেরও অংশ। আবার মানবজাতিও অনন্তকাল এই পৃথিবীতে নেই। মানবের জন্ম হবার আগেও ছিল মহাবিশ্ব, ফলে সব মানুষ আবার সেই মহাকালেরও অংশ। মানুষ মাত্রই তাই বিচরণ করে ব্যক্তিকাল, মানবকাল আর মহাকালের ভেতর। সময়ের এসব পর্বকে বোঝাতে জীবনানন্দ জন্ম দিয়েছেন 'সময়গ্রন্থি' বলে একটা শব্দের। 'ঘোড়া' কবিতার মূল ভাবনা এই সময় নিয়েই।

তিন

এ কবিতায় আমরা দেখছি কতগুলো ঘোড়া কার্তিক মাসের জ্যোৎস্নায় ঘাস খাচ্ছে, পাশ থেকে আস্তাবলের গন্ধ আসছে, সেখানে কলে ঘোড়ার জন্য খড় কাটা হচ্ছে, কবি একটি পাইস রেস্তোরাঁতে বসে এসব দেখছেন। রেস্তোরাঁর টেবিলে কতগুলো চায়ের কাপ দেখা যাচ্ছে, কাপগুলো সাদাই হবে। তখন চিনামাটির সাদা কাপই পাওয়া যেত। কাপগুলো সম্ভবত উল্টানো। ওই উল্টানো সাদা কাপগুলোকে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে থাকা সাদা বিড়ালের বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে কবির। রেস্তোরাঁয় পাশে একটি ঘেয়ো কুকুর বসে আছে। বাইরে বেশ হাওয়া বইছে, 'এক ভীড় রাত্রির হাওয়া'। সেই হাওয়ায় সেই সব ঘোড়াগুলোকে ছুঁয়ে একসময় নিভিয়ে দিল আস্তাবলের প্যারাফিন লণ্ঠন।

এই হচ্ছে ঘটনা। কিন্তু এখানে কিছু শব্দ যোগ করে এবং কিছু অভূতপূর্ব বাক্য তৈরি করে জীবনানন্দ জন্ম দিয়েছেন রহস্যের, কবিতাকে নিয়ে গেছেন অন্য এক স্তরে। যে ঘোড়াগুলো জ্যোৎস্নায় ঘাস খাচ্ছে তারা মহীন বলে জনৈক লোকের হলেও জীবনানন্দের মনে হচ্ছে ঘোড়াগুলো যেন প্রস্তরযুগের। সেই প্রস্তরযুগের ঘোড়াগুলো যেমন ঘাসের লোভে পৃথিবীতে চড়ে বেড়াত, সেই ঘোড়াগুলোই যেন এখন চড়ছে। সেই ব্যক্তি ঘোড়াগুলো নয় হয়তো কিন্তু এই ঘোড়াগুলোর ভেতর সেই একই 'ঘোড়াত্ব'। যদিও এখনকার পৃথিবী প্রস্তরযুগের মতো নয়, অন্য রকম, এখানে ডাইনামো আছে, প্যারাফিন লাইট আছে, ইস্পাতের কল আছে। কিন্তু কবি যেন সেই প্রস্তরযুগের বা নিওলিথ যুগের ঘোড়াগুলোকেই দেখছেন আজকের পাইস হোটেলে বসে, যেখানে আস্তাবলের গন্ধ আছে, একটি ঘেয়ো কুকুর আছে, আছে কিছু চায়ের কাপ। তারপর যে বাতাস ঘোড়াদের ছুঁয়ে শেষে নিভিয়ে দিল প্যারাফিন লণ্ঠন। সে একই বাতাস তো বইত প্রস্তরযুগেও, এ তো সেই প্রাচীন সময়েরই 'প্রশান্তির ফুঁ'। কবি তো সেই প্রস্তরযুগের মানুষ নন, প্রস্তরযুগের ঘোড়া যাঁরা দেখেছেন, সেই বাতাস যার গায়ে মেখেছেন তাঁরা তো মারা গেছেন। অথচ কবি আধুনিক যুগে বসে দেখছেন নিওলিথ যুগের দৃশ্য। এই হচ্ছে ধাঁধা। এই ধাঁধা দিয়েই জীবনানন্দ কবিতাটি শুরু করেছেন 'আমরা যাইনি মরে আজো—তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়'।

BanglaBook.org

এ যেন সেই 'কনসাসনেস অব টাইম অ্যাজ এ ইউনিভার্সাল'। বর্তমানের ভেতর অতীতকে দেখা। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যাওয়া। প্রস্তরযুগ আর ডায়নামোর যুগকে একাকার করে ফেলা। নিজেকে একটি অনন্তকালের ভেতর দেখা। এই হচ্ছে 'সময়গ্রন্থি'। এ দৃশ্য কবি একা দেখলেও জীবনানন্দ লিখলেন, 'আমরা'। তিনি সবাইকেই এই 'সময়গ্রন্থির' দর্শকের দলে যুক্ত করছেন। স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন যে আমরা সবাই আসলে যে দৃশ্য দেখছি, তা বস্তুত দীর্ঘ সময়ের ধারাবাহিকতারই অংশ। আমরা মরিনি, তবু যে দৃশ্য আমরা দেখি, তা ওই 'ইউনিভার্সাল টাইমেরই' অংশ।

চার

এ সময় আরও যে কবিতাগুলো জীবনানন্দ লিখতে শুরু করলেন তা সহজ শব্দ, বাক্যে রচিত হলেও হাজির করে সব জটিল দার্শনিক ধাঁধা। এ সময়ের একটা কবিতা :

বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে নিভে যায়—তবু
ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হ'য়ে গেছে ·
হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে;
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার মৌলিক হয়েছে;
সচ্ছল কঙ্কাল হ'য়ে গেছে তারপর;
বিলোচন গিয়েছিলো বিবাহ-ব্যাপারে;
প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে;
সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল।
সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওঙ্কার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়।
এ বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরনময়!
যুগে যুগে মানুষের অধ্যবসায়
অপরের সুযোগের মতো মনে হয়।...

এই নতুন ধারার কবিতাগুলো লিখে জীবনানন্দ এবার পড়লেন নতুন বিপদে। সজনীকান্তের মতো প্রবীণ সমালোচকদের সঙ্গে এবার তাঁর সমালোচনায় যুক্ত হলেন নতুন অনেক আলোচকও। এ সময় আধুনিক বাংলা কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখলেন, 'জীবনানন্দ দাশের সাম্প্রতিক কবিতায় শব্দবিহ্বলতা ও ভাষা বিহ্বলতা উভয়ই চরমে গিয়া পৌঁছেছে। তার ভাবাবেগ কিন্তু একান্তই গূঢ় ও ব্যক্তিগত, এদিকে শব্দচেতনা অনেক সময় প্রায় অস্বস্তিকর...

BanglaBook.org

সত্যেন্দ্রনাথ রায় নামের আরেক আলোচক লিখলেন, 'জীবনানন্দ দাশ এমন এক একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন যাকে বলা যেতে পারে অতিব্যক্তিবাদের অপঘাত মৃত্যুর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত...'

কিন্তু মাঠে এখন শুধু বুদ্ধদেব নন, তাঁর পক্ষে আছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর *নিরুক্ত* পত্রিকায় লিখলেন, 'যে ভাব প্রকাশ প্রচলিত ভাষায় কুলিয়ে উঠে না তার জন্য ভাষা হাতড়ে দুর্বোধ্য হবার মানে আছে—জীবনানন্দ দাশের পরীক্ষার স্থান তাই বাংলা কবিতাকে করে দিতে বাধ্য...'

পৃথিবীর ভাঙাগড়া শেষ করে

এক

যে রবীন্দ্র ঐতিহ্য থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা সব নবীন কবির, সেই রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন এই সময়, ১৯৪১ সালে। বাংলা সাহিত্যকে পুষ্টি দিয়ে বিশ্বদরবারে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। ছিলেন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। সমান্তরালে জীবনানন্দের জীবন নেহাতই নিষ্প্রভ। তাঁর আন্তর্জাতিক পরিচিতি শূন্যের কোঠায়। অথচ নিভৃতে কবিতার যে সুড়ঙ্গ জীবনানন্দ কেটেছেন, সেটাই হয়েছে বাংলা কবিতার পরবর্তী গন্তব্য। পরবর্তী প্রজন্মের কবির কাছে রবীন্দ্রনাথ নন, জীবনানন্দ হয়েছেন নতুন দিশারি। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়াটা অবশ্য খানিকটা জটিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে কখনো বিরূপ মন্তব্য করেছেন, কখনো করেছেন এক লাইনের কিছু প্রশস্তি, কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় যে বাংলা কবিতার বাঁকবদলের ইঙ্গিত আছে, সে আভাস তিনি পাননি। টের পাননি তাঁর মৃত্যুর পর বাংলা কবিতার শূন্যস্থান পূরণ করবেন এই জীবনানন্দই। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যেভাবেই দেখুন, জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য বরাবর মর্যাদার সঙ্গেই দেখেছেন। নিজের বাসর রাতে রবীন্দ্রনাথের গানই শুনতে চেয়েছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন গোটা পাঁচেক, নিবন্ধ লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে কবিতা :

> ...যখন তুমি আমাদের দেশে সৃষ্টি শেষ ক'রে ফেলে
> প্রকৃতির আগুনের উৎস থেকে উঠে একদিন
> নিঃস্বার্থ আগুনে ফিরে গেলে,
> পতঞ্জলি, প্লেটো, মনু, ওরিজেন, হোমরের মতো
> দাঁড়ায়ে রয়েছো তুমি একটি পৃথিবীর ভাঙা-গড়া শেষ ক'রে দিয়ে, কবি,—

BanglaBook.org

দুই

পরের বছরে জীবনানন্দের সংসারে এক বিপর্যয় নেমে এল। হঠাৎ মারা গেলেন জীবনানন্দের বাবা সত্যানন্দ দাশ। ১৯৪২-এর নভেম্বর মাসে। জীবনানন্দ ছাড়া তাঁর মা কুসুমকুমারীর দিনলিপিও উদ্ধার করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন ভূমেন্দ্র গুহ। জীবনানন্দের বাবার মৃত্যুক্ষণটাকে পাওয়া যায় তাঁর মা কুসুমকুমারীর দিনলিপিতে। কুসুমকুমারী ডায়েরিতে কবিতা লিখেছেন সেই মৃত্যু নিয়ে। নিজের মনের সঙ্গে তিনি কবিতার ভাষাতেই কথা বলেন। কুসুমকুমারী লিখছেন, '৯ :৩০টায় প্রদীপ নিভিল। ভগবান ভগবান ভগবান—এ কি করিলে? সজ্ঞানে কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। ভাল মন্দের মধ্যে মন্দটুকু বুঝিলাম না। এই কি চির বিদায়?

আমার চিত্তটুকু ভরেছিল যে অমৃত রসে
তারে তুমি রিক্ত করে দিয়ে গেলে চক্ষের নিমিষে।
চলে গেলে, কোন কথা নাহি গেলে বলে
এত প্রীতি, এত স্মৃতি, সবই কি ভুলিলে?
ভাবি মনে, কি কারণে কি যে ঘটে যায়
চোখের পলক ফেলি করি হায় হায়!!

নভেম্বর নভেম্বর!
রেখেছ আমার লাগি একি ঘন ঘোর—?'

BanglaBook.org

বাবার মৃত্যু জীবনানন্দকে এক নতুন বাস্তবতায় দাঁড় করিয়ে দিল। জীবনানন্দের বাবা ছিলেন করিতকর্মা মানুষ। স্বল্প আয়ের সংসারকে মূলত তিনিই সামলেছেন। বাস্তব জীবনের নানা বিষয়ে জীবনানন্দ নির্ভর করেছেন তাঁরই ওপর। জীবনানন্দের চাকরি, কাজের নানা ব্যবস্থায় তিনি সহায়তা দিয়েছেন। সংসারের বড় ছেলে জীবনানন্দ। বাবার মৃত্যুতে সংসারের নানা দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর ওপর। কিন্তু সংসারে তো নেহাতই আনাড়ি জীবনানন্দ। নিজের ভারই বইতে পারেন না, এত বড় সংসারের ভার বইবেন কী করে?

তিন

তাঁর বাবার মৃত্যুর ঠিক পরের বছরই বরিশালসহ সারা বাংলায় ঘটল স্মরণাতীতকালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। পৃথিবীজুড়ে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে চলেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বৈঠক শুরু করেছেন হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনী কী ধরনের যুদ্ধকৌশল নেবে

তাই নিয়ে। ব্রিটেন বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের যুদ্ধবাজেট। এ সময় ভারতের উৎপন্ন খাবার, শস্য ইংরেজরা মজুত করতে থাকে সৈন্যদের জন্য। তার মারাত্মক প্রভাব পড়ে ভারতে, বিশেষ করে বাংলায়। সেই সূত্র ধরেই ঘটে এই দুর্ভিক্ষ, সেই পঞ্চাশের মন্বন্তর। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে পথে ঘাটে মারা যায় লাখ লাখ মানুষ। সরাসরি না হলেও দুর্ভিক্ষ ছুঁয়ে যায় তাঁদের পরিবারকেও। কুসুমকুমারীর *দিনলিপি*র ১৯৪৩-এর জুন মাসে একটা পাতায় লেখা, 'যে দিন কাল ঘনাইয়া আসিতেছে—দারিদ্র্যর ক্রন্দন ও মরণ, মধ্যবিত্তের হাহাকার। কি হবে পরিণাম। খাওয়া আরো কমাইতে হইবে। যেটুকুতে জীবনধারণ হয় তাহাই যথেষ্ট। কাহারও সাহায্য করিতে পারি না, বিধাতা, সহায় হও।'

চিত্রকর জয়নুল আবেদিন সেই দুর্ভিক্ষ নিয়ে তখন আঁকছেন কিংবদন্তিতুল্য ছবি। এই দুর্ভিক্ষ যে প্রাকৃতিক নয়, মানুষের তৈরি, সে কারসাজি নিয়ে বহুকাল পর গবেষণায় দেখালেন অমর্ত্য সেন, নোবেল পেলেন তিনি।

জীবনানন্দের কবিতাতে ধরা পড়ল সেই সমকাল, লিখলেন :

...নগরীর রাজপথে মোড়ে মোড়ে চিহ্ন পড়ে আছে;
একটি মৃতের দেহ অপরের শবকে জড়ায়ে
তবু আতঙ্কে হিম—হয়তো দ্বিতীয় কোন মরণের কাছে...

লিখলেন

...স্বতই বিমর্ষ হ'য়ে ভদ্রসাধারণ
চেয়ে দ্যাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।

BanglaBook.org

তাঁর মনের অভ্যন্তরীণ দোলাচল ক্রমশ ভীষণভাবে যুক্ত হচ্ছে বাইরের পৃথিবীর ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে। তাঁর জীবনজিজ্ঞাসাকে তা বদলে দেবে অচিরেই।

চার

এই মন্বন্তর, মৃত্যু, বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটেই প্রকাশিত হয় জীবনানন্দের তৃতীয় কবিতার বই *বনলতা সেন*। কবিতা দিয়েই জীবনের, সময়ের শ্বাপদসংকুল পথ

কেটে কেটে তাঁকে এগিয়ে যেতে হবে সে কথা জীবনানন্দ মনের নিভৃতে জেনে নিয়েছেন অনেক আগেই। এই প্রকাশেও মূল উদ্যোগ বুদ্ধদেব বসুর। বুদ্ধদেব তখন কলকাতায়, জীবনানন্দ বরিশালে। তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ বিশেষ হয় না, চিঠিপত্রেই চলে তাঁদের যোগাযোগ। অব্যাহত থাকে অদেখা এক বন্ধুত্ব। বুদ্ধদেব তাঁর কবিতাভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি' নামে ১৬ পাতার কবিতার একটা সিরিজ বের করতেন। সেই সিরিজের বই হিসেবেই প্রকাশিত হলো জীবনানন্দের এই বই, তাঁর বহুল আলোচিত সেই কবিতাকে শিরোনাম করে। বরাবরের মতো জীবনানন্দের মাথায় আবার ছাতা ধরলেন বুদ্ধদেব, লিখলেন, 'আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন এবং গেল দশ বছরে যে সব আন্দোলনের ভাঙ্গাগড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে তাতেও কোন অংশগ্রহণ করেননি...আমাদের সকলের মধ্যেই সেই যে একজন চিরকালের কবিকে মাঝে মাঝে দেখতে পাই যার দেশ নেই, কাল নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই, মানুষের সমস্ত সুখ দুঃখ সভ্যতার সমস্ত উত্থান পতন পার হয়ে যার সুর আজকের মতো কোনো এক বসন্ত প্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে ঘা দেয়, আর মুহূর্তে উচ্চনিনাদি প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র অতীত ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়—সেই নামহারা ক্ষণস্থায়ীকে কিছু সময়ের জন্য যেন কাছে পেলুম *বনলতা সেন* বইটিতে।'

BanglaBook.org

বাইরের টান, ভেতরের চাপ

এক

এ সময় কলকাতা থেকে একটা চিঠি পেলেন জীবনানন্দ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। লিখেছেন তিনি বিশেষভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। জীবনানন্দ এমনিতেই বান্ধবহীন মানুষ। সঞ্জয় তাঁর পক্ষের নতুন যোদ্ধা। জীবনানন্দের নতুন ধারার কবিতাকে সবচেয়ে সোচ্চারভাবে স্বাগত জানাচ্ছেন তখন সঞ্জয়। জীবনানন্দেরও আগ্রহ হলো তাঁর সঙ্গে দেখা করার। জানালেন কলকাতায় গেলেই জানাবেন তাঁকে। কিছুকাল পরেই সুযোগ ঘটল সে সাক্ষাতের। গ্রীষ্মের ছুটিতে জীবনানন্দ বরিশাল থেকে কলকাতা গেলেন তাঁর ছোট ভাই অশোকানন্দের বাড়িতে। অশোকানন্দ ইতিমধ্যে বিয়ে করেছেন বোন সুচরিতার বান্ধবী উপেন্দ্রকিশোর রায়ের নাতনি নলিনীকে। জীবনানন্দ সঞ্জয়কে চিঠি লিখে জানালেন তাঁর কলকাতা যাবার কথা, অশোকের ঠিকানা দিলেন। সেই ঠিকানা

ধরে একদিন সঞ্জয় ভট্টাচার্য অশোকানন্দের বাড়িতে হাজির হলেন তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে। বাড়ির সামনেই ছিলেন জীবনানন্দ। সঞ্জয় তাঁর দিকে খুব একটা নজর দেননি। একপর্যায়ে বললেন, 'আমরা জীবনানন্দ দাশকে খুঁজছি।' জীবনানন্দ ছোটখাটো, শ্যামলা, খানিকটা স্থূল অনাকর্ষণীয় মানুষ। সঞ্জয় দেখেননি তাঁকে আগে, জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে যে চেহারার কথা ভেবেছিলেন তার সঙ্গে ঠিক মেলেনি।

সঞ্জয়ের প্রশ্নে জীবনানন্দ বললেন, 'আমিই জীবনানন্দ দাশ।'

জীবনানন্দকে দেখে যে সঞ্জয় হতাশ হয়েছিলেন, সে কথা পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বলেছেন তিনি। বলেছেন, 'যে জীবনানন্দের কবিতা আমরা পড়েছি উনি সে লোক হতে পারেন না।'

প্রেমেন্দ্র বলেছেন, ওই হচ্ছে জীবনানন্দ। কবিতা লিখবার সময় ওর চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়।

অশোকানন্দের বাসায় জীবনানন্দ আর সঞ্জয় অনেক আলাপ করলেন সেবার। সঞ্জয় বললেন 'আপনার কবিতাকে আমি অনুসরণ করছি বহুকাল। আমি মনে করি আপনার কবিতা একটা নতুন গভীর স্তরে এসে পৌঁছেছে, পরিণতির দিকে এগোচ্ছে।'

জীবনানন্দ: 'কিন্তু অনেকেই তো পছন্দ করছেন না কবিতাগুলো। একটু জটিল হয়ে যাচ্ছে বোধ হয়।

সঞ্জয় 'অনেকের কথা বাদ দিন। আমি তো একটা লেখায় লিখেছি যে জীবনের নতুন বস্তবতা, কবিতার নতুন ভাষা দাবি করে।'

জীবনানন্দ: 'আপনার আলোচনা তো চমৎকার হয়েছে। আমার জন্য অনুপ্রেরণার।'

সঞ্জয় বললেন, 'আমি আসলে আপনার সাথে দেখা করতে এসেছি মূলত যে কথাটা বলতে সেটা হচ্ছে যে আমরা আপনার একটা কবিতার বই প্রকাশ করতে চাই। আমাদের একটা প্রকাশনা আছে "পূর্বাশা" নামে, সেখান থেকেই প্রকাশ করব।'

এ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে জীবনানন্দ খুব খুশি হলেন। এযাবৎ সব বই-ই তিনি প্রকাশ করেছেন নিজের খরচে, এবার প্রথমবারের মতো একটা প্রকাশনা সংস্থা নিজ দায়িত্বে প্রকাশ করতে চাচ্ছে তাঁর বই, এ তো তাঁর জন্য খুবই আনন্দের। জীবনানন্দ রাজি হলেন এবং বরিশাল ফিরে গিয়ে এ নিয়ে চিঠিতে আরও আলাপ করবেন জানালেন।

BanglaBook.org

দুই

ইতিমধ্যে বরিশালে সর্বানন্দ ভবনের পরিবেশটা বদলে গেছে। জীবনানন্দের বাবা মারা গেছেন বছরখানেক হলো। একমাত্র ভাই বিয়ে করে কলকাতায় স্থায়ী হয়েছেন। তাঁর বোন সুচরিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে যোগ দিয়েছেন কলকাতার কাছে তমলুকে সান্ত্বনাময়ী গার্লস স্কুলের শিক্ষক হিসেবে। তিনিও কলকাতাতেই থেকে যাবেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কুসুমকুমারী প্রায়ই কলকাতায় গিয়ে কখনো ছেলের বাড়িতে কখনো মেয়ের কাছে থাকেন। তাঁর অন্যান্য কাকা, জ্যাঠারাও চলে গেছেন কলকাতাসহ বিভিন্ন শহরে। বাড়িতে আছেন লাবণ্য। পরিবারের অন্য সদস্যদের উপস্থিতিতে তাঁর একরকম ঢাল ছিল কিন্তু এই নতুন পরিস্থিতিতে তিনি বর্মবিহীনভাবে লাবণ্যর মুখোমুখি। লাবণ্যর সঙ্গে তাঁর মানসিক যোগাযোগ সামান্যই।

এ ছাড়া দশ বছর শিক্ষকতা করবার পর শিক্ষকতার প্রতি একধরনের অনীহাও জেগেছে তাঁর তখন। সব প্রতিষ্ঠানের মতোই ব্রজমোহন কলেজেও আছে নানা দলাদলি, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। তিনি সেগুলোর ভেতর জড়াননি। আর সেসবে জীবনানন্দ মোটেও পারদর্শীও নন, ফলে নানাভাবেই কোণঠাসা থেকেছেন কলেজে। তিনি চুপচাপ কলেজে এসে ক্লাস নিয়ে যেতেন, কারও সাতে-পাঁচে বিশেষ থাকতেন না। দেখা গেছে তাঁর সহকর্মীরা কৌশলে আইএ, বিএ ক্লাসের যেসব বিষয় সবচেয়ে কঠিন এবং নীরস, সেগুলো পড়াতে দিয়েছেন তাঁকে, অন্যরা নিয়েছেন সহজ ক্লাসগুলো। জীবনানন্দ তাঁর মগ্নতা থেকে বেরিয়ে এসব নিয়ে কোনো ঝামেলা তৈরি করেননি। তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

তাঁর সহকর্মীরা জানতেন যে জীবনানন্দের কবিতা কলকাতার পত্রিকায় ছাপা হয়, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। তাঁরা জীবনানন্দের কবিতার বিষয়ে যত না আগ্রহী ছিলেন, তার চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন তাঁর কবিতা নিয়ে কী ধরনের বিরূপ লেখালেখি হচ্ছে তা নিয়ে। বিশেষ করে, *শনিবারের চিঠি* পত্রিকায় জীবনানন্দকে নিয়ে সজনীকান্ত যেসব লেখা লিখছেন, সেগুলো কেউ কেউ আগ্রহ নিয়েই পড়তেন। তাঁর ইংরাজি বিভাগেরই শিক্ষক নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনানন্দকে ডাকতেন 'ঘাইহরিণী' বলে। তাঁর পেছনে বরাবর লেগে থাকতেন কলেজের আরেক শিক্ষক হেরম্ব চক্রবর্তী। *শনিবারের চিঠি*তে জীবনানন্দকে নিয়ে কিছু লেখা হলেই সেটা টিচার্স রুমে বেশ বড় বড় গলায় সবাইকে পড়ে শোনাতেন কলেজের হেরম্ব বাবু। একবার জীবনানন্দকে উদ্দেশ করে তিনি একটা কবিতা লিখলেন, 'নীল জলের শিঙিমাছ' নামে। জীবনানন্দের উপস্থিতিতেই হেরম্ব বাবু টিচার্স রুমে পড়লেন সেই ব্যঙ্গ কবিতা। জীবনানন্দ চুপচাপ বসে শুনলেন, তারপর একসময় বেরিয়ে গেলেন টিচার্স রুম থেকে। জীবনানন্দকে অপদস্থ করে একধরনের মজা যেন পেতেন হেরম্ব বাবু।

BanglaBook.org

একদিন বরিশালের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অবনীমোহন কুশারী জীবনানন্দকে নিমন্ত্রণ করলেন বজরায় নদীভ্রমণে। তিনি গেলেন। বজরায় গিয়ে দেখলেন সেখানে হেরম্ব বাবুও আছেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আগের পরিচিত। তাঁরা বজরা নিয়ে আগুনমুখা নদী দিয়ে টিকিকাটা গ্রাম পার হয়ে চললেন মাথাভাঙ্গার দিকে। কিন্তু বজরায় উঠবার পর জীবনানন্দ টের পেলেন তাঁকে ডাকা হয়েছে আসলে অপমান করবার জন্য। হেরম্ব আর অবনী মিলে সারা পথ জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলেন। তাঁকে বজরায় আটকে ক্রমাগত অপমান করে একধরনের নির্মম আনন্দ যেন পাচ্ছিলেন তাঁরা। জীবনানন্দ ঠিক কীভাবে ব্যাপারটা মোকাবিলা করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষে বজরা গলাচিপা ঘাটে পৌছালে তিনি নেমে গেলেন এবং একাই আলাদাভাবে অন্য স্টিমারে বরিশাল ফিরলেন।

ছাত্রদের ভেতর তিনি তেমন জনপ্রিয় ছিলেন না। শামসুদ্দীন আবুল কালাম, নরেশ গুহ প্রমুখের মতো দু-একজন ভক্ত ছাত্র ছিল তাঁর, যাঁদের নিজেদের সাধনাও সাহিত্য, যাঁরা ছিলেন তাঁর কবিতার গভীর পাঠক। কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা তাঁর ক্লাস বিশেষ পছন্দ করত না। খুব উদ্দীপনার সঙ্গে যে তিনি ক্লাসগুলো নিতেন তা নয়, নিতেন নেহাত কর্তব্যের খাতিরে। শিক্ষকতার ভেতর তাঁর তখন একটি ক্লান্তি এসে গিয়েছিল যেন। শামসুদ্দীন আবুল কালাম লিখছেন, একদিন ক্লাসে 'জেমস জিনসের' দ্য ডাইয়িং সান পড়াচ্ছিলেন। ছেলেরা পেছনে হাই তুলছিল। তিনি একপর্যায়ে ছাত্রদের বললেন 'ইউনিভার্স শব্দটার মানে বোঝো?' তারপর বললেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর আকাশে হাত উঠিয়ে গোল করে দেখাতে লাগলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাকে বলে, তারপর খুব জোরে জোরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত বেখাপ্পা হাসি হাসতে লাগলেন।

এই সময়ে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে শিক্ষকতা ব্যাপারটা আসলে তিনি আর মোটেও উপভোগ করছেন না, আসলে কখনোই তিনি করেননি। তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'শিক্ষকতা আমার কখনোই ভালো লাগেনি।...এখনো অধ্যাপনা করতে হচ্ছে। কিন্তু মনে হয় এ পথে আর বেশীদিন থাকা ভালো না। যে জিনিস যাদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সবই অসারতার নামান্তর নয় কি?'

আর শিক্ষকতার পেশাটাকেও মর্মান্তিক মনে হয়েছে তাঁর, বিশেষ করে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিয়ে প্রবল ক্ষোভ ছিল তাঁর। শিক্ষা বিষয়ে এক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'অনেক বেসরকারী কলেজের শিক্ষকেরা মোটামুটি গভর্নমেন্ট অফিসের লোয়ার ডিভিশনের কেরানীদের মত মাইনে পায় কিম্বা তার চেয়েও কম—...আমি কেরানীদের সঙ্গে প্রফেসরদের তুলনা করলাম

BanglaBook.org

এই জন্য যে আমাদের দেশে অনেকেরই এমন একটি ধারণা আছে তথাকথিত ভদ্রসাধারণের ভেতর কেরানীরাই সবচেয়ে বেশী আর্থিক অবিচার সহ্য করে আসছে...নিজের কাজে তৃপ্ত প্রাইভেট কলেজের প্রফেসররা আজকাল ডোডোর মত দুর্লভ হয়ে পড়েছে।...'

আরও লিখেছেন : 'দেড়শো একশো পঁয়ত্রিশ টাকা তো একজন মুটেও পায় আজকাল। ম্যাট্রিক, আইএ বিএ পাশ, ফেল, হুঁশিয়ার ছেলেরা কলকাতায় দুচার বছর ঘুরে একটু জমিয়ে নিতে পারলে তিনশো চারশো টাকায় সংসার অবলীলায় চালিয়ে নেয়। কিন্তু ও রকম সব আবছায়ার পথে প্রফেসর যাবেন না বলে তাঁকে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে বুঝ দেবার রকমটা সমাজের কোন শুভানুধ্যায়ীর কাছেই খুব Straight বলে মনে হবে না।'

তাঁর *জলপাইহাটি* উপন্যাসের এক জায়গায় লিখছেন, 'পে কমিশনের টাকা পেয়ে গভর্নমেন্টের জোয়ান পেয়াদারা ম্যাগনোলিয়া খাচ্ছে, একজিবিশনে যাচ্ছে, মেয়েমানুষকে চোরাবাজারের মাল পৌঁছিয়ে দিচ্ছে, স্ত্রীকে শেয়ালদার বাজারের মাছ তরকারী, লাইফ ইন্স্যুরেন্স করছে, সেভিংস ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলছে। বেশ ভালো কাজ করছে—কিন্তু...কিন্তু...ঘর নেই, চাল নেই, কাপড়ের পেছনের দিক ছিঁড়ে গেছে মাস্টারদের, তাদের স্ত্রীদের, এরা বেসরকারীজীবী বলেই এদের জন্যে কোনো কমিশন নেই—এরকম হতভাগা দেশে কোনো স্কুল কলেজ না থাকাই ভালো। সব পুলিশে যাক, সেপাই হয়ে যাক।'

জলপাইহাটি উপন্যাসে মূল চরিত্র নিশীথও কলেজের অধ্যাপক। অধ্যাপকের জীবন নিয়ে এই তাঁর মূল্যায়ন, 'কলেজের কাজটাকে মজুরির কথা বাদ দিয়ে, এমনি কাজ বা রুচি-রচনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে, কোনোদিনই ভাল লাগেনি তার। সঙ্গে-সঙ্গে লাইব্রেরিতে নতুন কিছু-কিছু বই, প্রকৃতিতে এসে পড়ত রৌদ্রের ফোয়ারা, নীল উজ্জ্বল চক্রবাল, আকাশে হরিয়াল, ফিঙে, বক, বড়-বড় সুন্দরী ওয়াক পাখি, কলেজের ময়দান পেরিয়ে বন, শনের হোগলার ক্ষেত, অপরিমেয় কাশ হঠাৎ এক-আধটি নিখুঁত মুখসৌষ্ঠব, স্ত্রীলোকেরই, আরো দূরে বুনো হাঁসের জলা মাঠ, স্নাইপ, সকালের উড়িসুড়ি নিস্তব্ধতা তখন ভাল লাগত নিশীথের। ভাল লাগত বটে, কিন্তু কলেজের, বিশেষত মফস্বল কলেজের অধ্যাপকের পক্ষে বনের বেড়াল, ভাম, ভোঁদড়, সজারুর চরায়-চরায় ঘুরে বেড়ানো, বালিহাঁস মরাল, ওয়াক পাখিদের ওড়াউড়ি আসা-যাওয়া ভালবাসা দেখবার জন্য হাঁটুজল ভেঙে, সারাটা দিন ডুবজল গলাজলের দিকে ভেসে যাওয়া, সমস্তটা শরৎরৌদ্রের-শালিধানের-বরোজের উড়ু-উড়ু পান বনের ঝরঝরে দিনটাকে রাতের নক্ষত্র নির্ঝরে এসে নিস্তন করে রাখা, এসব কাজ মোটেও সম্মানজনক নয়, এসব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে অধঃপতিত বিবেচিত হবে সে, কারুরই

BanglaBook.org

সায় পাবে না। এসব কাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু ওরা বলে অধ্যাপকের কাজ আলাদা, রুচি ভিন্ন, দায়িত্ব আর এক রকম। অধ্যাপক যে মানুষ নয় তা তো নয়। কিন্তু ছাঁকা মানুষ, পরিশ্রুত জলের মত, কুঁজো, কলসি কিংবা ওয়াটার কুলারের ভিতর। কী হবে ওরকম জল হয়ে। নিশীথ হতে চাচ্ছিল নির্ঝরের জল, কিংবা জল, সময়সীমার অব্যক্ত থেকে নিঃসৃত সাগরের। কলেজের কাজ ছেড়ে দেবে সে...'

তিন

তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মতো জীবনানন্দও তখন চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন। বরিশাল ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবেন কি না, তাও ভাবছেন। বিশেষ করে, সাম্প্রতিক কালে কলকাতা ঘুরে তাঁর ভেতর নানা রকম নতুন জীবনের আশার সঞ্চার হয়েছে। অশোকানন্দের স্ত্রী নলিনীকে চিঠিতে লিখলেন, 'এবার সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে খুবই আনন্দ লাভ করেছি। কলকাতায় গিয়ে নানা রকম অভিজ্ঞতা লাভ হল, সাহিত্যিক, ব্যবসায়িক ইত্যাদি নানারূপ নতুন সম্ভাবনার ইশারা পাওয়া গেল। এর আগে মাঝে মাঝে আমি ২-৩ দিনের জন্য কলকাতায় যেতাম কিন্তু নানা দিক দিয়ে কলকাতায় সামাজিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য ব্যাপারে যে এরকম সজীব পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ্য করার সুযোগ পাইনি।'

সেবার বিশেষ করে সঞ্জয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি বেশ চাঙা হয়ে উঠেছিলেন। জীবনানন্দের মনে হলো সঞ্জয় তাঁর কবিতার পরিবর্তনটাকে যেভাবে বুঝতে পারছেন আর কেউ তা পারছেন না। ব্যবসায়িক সম্ভাবনা বলতে সঞ্জয় যে তাঁর কবিতার বই প্রকাশ করতে আগ্রহ দেখিয়েছেন, সেটার কথাই বলেছেন তিনি। সেবার কলকাতায় গিয়ে সঞ্জয় ছাড়া আরও আড্ডা হয়েছে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গেও। এসব অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর মনে হয়েছে কলকাতায় সামাজিক, সাহিত্যিক ব্যাপারে একটা সজীব পরিবর্তন হয়েছে যেন। কলকাতা তাঁকে যেন একটু একটু আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। এর কাছাকাছি সময়ে একবার বুদ্ধদেবকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'কোলকাতার অলিগলি মানুষের শ্বাসরোধ করে বটে কিন্তু কলকাতার ব্যবহারিক জীবনে কর্মবহুলতার ঢের প্রয়োজন, কলকাতার এই স্বচ্ছন্দ পটভূমির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা চলে না আর...'

সেবার পূজার ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে ভাইয়ের স্ত্রী নলিনীর বান্ধবী লেখিকা বাণী রায়ের সঙ্গে অনেক আড্ডা হয়েছিল তাঁর। বাণী রায়ের 'লুক্রিশিয়া' কবিতাটা খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। কলকাতার কাছে বাণী রায়ের নিরিবিলি বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলেছিলেন, 'আপনার বাড়িটায় যদি থাকতে পারতাম তবে কি ভালোভাবেই না লিখতে পারতাম। লিখবার অবকাশ বা

BanglaBook.org

নির্জনতা পাই না। উপন্যাস লিখব ভাবছি। কত কি লিখবার আছে। আপনার ঘরটা যদি পেতাম...'

জীবনানন্দের ব্যাপারে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বাণী রায় লিখেছেন, সে সময় শহরের প্রাণকেন্দ্রে তিনি থাকার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন, বরিশালের সংস্কৃতিবিহীন নির্জনতা তাঁর আর ভালো লাগছিল না। বাণী রায় মনে করেন, অনেক লোকের মাঝে নিঃসঙ্গ থাকতে পছন্দ করতেন তিনি। জীবনানন্দ জানতেন জনতা চমৎকার আড়াল তৈরি করতে পারে। মফস্বল শহরে ব্যক্তির আড়াল থাকে না।

এ কথা ঠিক যে বরিশাল জীবনানন্দের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা, তবু তিনি সে সময় বরিশালে যেন ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পঠনপাঠন, তাঁর সাহিত্য আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে কোনো সঙ্গ পাবার সম্ভাবনা তিনি বরিশালে দেখছিলেন না। কলকাতায় গিয়ে সঞ্জয়, বাণী, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব এঁদের সাথে আড্ডা দিয়ে বরিশালে ফিরে এসে এই পরিমণ্ডলকে মনে হয়েছে আরও সংকীর্ণ। জীবনানন্দ একটা আপাদমস্তক সাহিত্যিক জীবনই খুঁজছিলেন। মানুষ যখন অন্য স্থানে অভিবাসনের প্রক্রিয়া শুরু করে, তখন সেই নতুন স্থান তাঁকে নানা কারণে টানে। সেই মুহূর্তে কলকাতার অনেক ব্যাপার তাঁকে টানছিল। পাশাপাশি অভিবাসনের জন্য যে জায়গায় মানুষ আছে, সেখানকার নানা ব্যাপার তাঁকে ভেতর থেকেও ঠেলতে থাকে। বরিশালের অনেক কিছুই তখন তাঁকে ভেতর থেকে ঠেলছে। ঠিক কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না তখন জীবনানন্দ।

BanglaBook.org

চারিদিকে সার্কাসের ব্যথিত সিংহের হুংকার

এক

এ সময় সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উদ্যোগে 'পূর্বাশা' প্রকাশনা থেকে বের হলো জীবনানন্দের নতুন কবিতার বই মহাপৃথিবী। সঞ্জয়কে সহায়তা করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সেটা ১৯৪৪ সাল। কৃতজ্ঞতায় বইটা জীবনানন্দ উৎসর্গ করলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রকে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখলেন : 'মহাপৃথিবীতে আছে জীবনানন্দের জীবনের প্রৌঢ় পরিণতির কবিতা। কি সেই প্রৌঢ় পরিণতি? ইতিমধ্যে তিনি যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ দেখেছেন, নিজের জীবনে প্রেম অপ্রেম দেখেছেন, চাকরীর জীবন, বেকারত্বের জীবন দেখেছেন, নিজের লেখালেখির জোয়ার দেখেছেন, দেখেছেন খরাও, উপেক্ষা, অবহেলা দেখেছেন, আবার স্বাদ পেয়েছেন বিচ্ছিন্ন বন্ধুত্বেরও, দেখেছেন

মৃত্যু। সব কিছু মিলিয়ে সেই প্রৌঢ়ত্বে জীবনের উদ্যম যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি, ঠিক বুঝতে পারছেন না এর পরের গন্তব্য কি? জীবনের কেন্দ্রে যে বেদনা এ বিশ্বাস আরো জোরদার হয়েছে তার।'

অভিজ্ঞতার এই চড়াই-উতরাই পেরিয়ে জীবনানন্দের মনে তখন অনেক প্রশ্ন, আর্তি

ঝাউফলে ঘাস ভ'রে—এখানে ঝাউয়ের নিচে শুয়ে আছি ঘাসের উপরে;
কাশ আর চোরকাঁটা ছেড়ে দিয়ে ফড়িং চলিয়া গেছে ঘরে।
সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন পথে কোন ঘরে যাবো!
কোথায় উদ্যম নাই, কোথায় আবেগ নাই,—চিন্তা স্বপ্ন ভুলে গিয়ে
শান্তি আমি পাবো?
রাতের নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন পথে যাবো?

রাতের নক্ষত্রের পর তিনি সিন্ধু সারসকে জানাচ্ছেন তাঁর সিদ্ধান্ত :

জানো কি অনেক যুগ চ'লে গেছে? ম'রে গেছে অনেক নক্ষত্র?
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জানো না কি? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি;
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান?

বিশ্বসংসার নিয়ে একটা গভীর হতাশার ইঙ্গিত সেসব কবিতায় :

এদিকে কোকিল ডাকছে—পউষের মধ্যরাতে;
কোনো একদিন বসন্ত আসবে ব'লে?
কোনো একদিন বসন্ত ছিলো, তারই পিপাসিত প্রচার?
তুমি স্থবির কোকিল নও? কত কোকিলকে স্থবির হ'য়ে যেতে দেখেছি,
তারা কিশোর নয়,
কিশোরী নয় আর;
কোকিলের গান ব্যবহৃত হ'য়ে গেছে।

সিংহ হুংকার ক'রে উঠছে :

সার্কাসের ব্যথিত সিংহ,
স্থবির সিংহ এক—আফিমের সিংহ—অন্ধ—অন্ধকার।

BanglaBook.org

কোকিলের গান
বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খ'সে-খ'সে
চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ।
হে পৃথিবী,
হে বিপাশামদির নাগপাশ,—তুমি
পাশ ফিরে শোও,
কোনোদিন কিছু খুঁজে পাবে না আর।

জীবনানন্দের মনে হচ্ছে তেজ, আনন্দ, উজ্জ্বলতা সব হারিয়ে যাচ্ছে। এখন কোথাও যেন আর বসন্ত নেই, একসময় ছিল হয়তো, আবার হয়তো আসবে। কিন্তু এখন সব স্থবির। সার্কাসের সিংহের মতো। তেজ ছিল একসময় এখন আফিম খেয়ে ঝিমাচ্ছে, ব্যথিত, অন্ধ।

দুই

পুরোনো পৃথিবী যেন নষ্ট হয়ে গেছে, নতুন পৃথিবীর জন্ম হয়নি, আমরা একটা মাঝামাঝি অবস্থায় আটকে আছি :

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় রয়েছি
একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে আমাদের আগে;
আরেকটি পৃথিবীর দাবি
স্থির ক'রে নিতে হ'লে লাগে
সকালের আকাশের মতন বয়স;
সে-সকাল কখনো আসে না ঘোর, স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।

BanglaBook.org

এ সময় অদ্ভুত সব লোকের কথা মনে হয় জীবনানন্দের। তাঁর মনে পড়ে অনুপম ত্রিবেদীকে যে ভীষণভাবে দ্বিধাদীর্ণ এক মানুষ, জড় আর অজড় যাকে দুকান ধরে দুদিক থেকে টানে :

এখন শীতের রাতে অনুপম ত্রিবেদীর মুখ জেগে ওঠে।
যদিও সে নেই আজ পৃথিবীর বড়ো গোল পেটের ভিতরে
সশরীরে; টেবিলের অন্ধকারে তবু এই শীতের স্তব্ধতা
এক পৃথিবীর মৃত জীবিতের ভিড়ে সেই স্মরণীয় মানুষের কথা
হৃদয়ে জাগায়ে যায়; টেবিলে বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয়
যদিও প্লেটোর থেকে রবি ফ্রয়েড নিজ-নিজ চিন্তার বিষয়
পরিশেষ ক'রে দিয়ে শিশিরের বালাপোশে অপরূপ শীতে

এখন ঘুমায়ে আছে—তাহাদের ঘুম ভেঙে দিতে
নিজের কুলুপ এঁটে পৃথিবীতে—ওই পারে মৃত্যুর তালা
ত্রিবেদী কি খোলে নাই? তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা
ঈশার শবোত্থান—বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে
হেগেল ও মার্ক্স : তার ডান আর বাম কান ধরে
দুই দিকে টেনে নিয়ে যেতেছিলো;

জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক মিলে আমাদের দু-দিকের কান
টানে ব'লে বেঁচে থাকি—ত্রিবেদীকে বেশি জোরে দিয়েছিলো টান।

এই সব কবিতায় আসা সন্দেহের এই পৃথিবী ছাড়িয়ে এক মহাপৃথিবীর দিকে যেন যেতে চাইছে জীবনানন্দের মন।

সফলতা নিষ্ফলতার সমীকরণ

BanglaBook.org

এক

কিন্তু *মহাপৃথিবী* বইটা একেবারেই পছন্দ হলো না বুদ্ধদেবের। নতুন বান্ধব সঞ্জয় এসে হাত ধরলেন, পুরোনো বান্ধব এবার ছেড়ে দিলেন জীবনানন্দের হাত। এই প্রথম প্রকাশ্যে জীবনানন্দের বিরোধিতা করলেন বুদ্ধদেব বসু। একটা প্রবন্ধে বুদ্ধদেব লিখলেন, 'জীবনানন্দ দাশ কি লিখছেন আজকাল? এ প্রশ্ন সাধারণ পাঠক করতে পারেন, আমরা তার অদ্বিতীয় ভক্ত বলে বিশেষভাবে করতে পারি। অন্যদের বাদ দিয়ে বেছে বেছে তার নাম করলুম এই কারণে যে উদাহরণ হিসেবে তিনি সর্বলক্ষণ সম্পন্ন। জীবনানন্দ দাশ আমাদের নির্জনতম স্বভাবের কবি। এই নির্জনতার বিশিষ্টতাই তাঁর প্রাক্তন রচনাতে দীপ্যমান। মনে মনে এখনো তিনি নির্জনের নির্ঝর, তার চিত্ততন্ত্রী এখনো স্বপ্নের অনুকম্পায়ী। কিন্তু পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিষ্ট, কুখ্যাত আইভরি টাওয়ারের নিখোঁজ অধিবাসী, সেইজন্য ইতিহাসের চেতনাকে তার সাম্প্রতিক রচনার বিষয়াভূত করে তিনি এইটেই প্রশ্ন করবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন যে তিনি পিছিয়ে পড়েননি। করুণ দৃশ্য এবং শোচনীয়। এর ফলে তার প্রতিশ্রুত ভক্তদের চক্ষেও তার কবিতার সম্মুখীন হওয়া সহজ আর নেই। দুর্বোধ্য বলে আপত্তি নয়, নিঃসুর বলে আপত্তি, নিঃস্বাদ বলে।'

বুদ্ধদেব জীবনানন্দকে যে প্রেক্ষাপটে খুঁজে পেয়েছিলেন, তাঁকে সেই প্রেক্ষাপটেই দেখতে চান নির্জন, স্বপ্নচারী, প্রকৃতিপ্রেমিক। কিন্তু জীবনানন্দ

ইতিমধ্যে জীবনের ঘাট, আঘাটা পথে হেঁটে হয়েছেন অন্য মানুষ। বুদ্ধদেব এই নতুন জীবনানন্দকে আর চিনতে পারছেন না। জীবনানন্দ যে একটা নতুন চেতনার চরে পৌঁছেছেন, সেটা আর ধরতে পারছিলেন না বুদ্ধদেব বসু। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের চেয়েও খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন। অগণিত কবিতা, উপন্যাসের বই প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুর *বন্দীর বন্দনা* কাব্যগ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কিন্তু জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে দুই-দুইটা কবিতার বই পাঠানো সত্ত্বেও তিনি এক-দুই লাইনের মন্তব্য করেছেন মাত্র। বুদ্ধদেব বসু এমন বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন যে পত্রিকায় তাঁর বিয়ের সংবাদও বেরিয়েছিল, বেরিয়েছিল তাঁর সহসম্পাদক অজিতকুমার দত্তের বিয়ের খবরও। সেখানে কোন কোন সাহিত্যিক উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের নামের লিস্টও দেওয়া হয়েছিল পত্রিকায়। না, জীবনানন্দ সেখানে আমন্ত্রিত হননি। তিনি মনে কষ্ট পেয়েছিলেন তাতে, ডায়েরিতে সে কথা লিখেছেন, 'I remember Ajit's marriage as published in papers in those days & also newspaper report of Budhdha's marriage—I was not invited though almost all important lit. figure were: I read the list of names in papers...'

দুই

যদিও বুদ্ধদেব তাঁর বয়সে অনেক ছোট, ছিলেন জীবনানন্দের সাহিত্যের অনুরাগী, দীর্ঘদিন ছিলেন জীবনানন্দের কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক, তারপরও গোপনে বুদ্ধদেবের প্রতি একটা ঈর্ষা, সন্দেহ, প্রতিযোগিতার ব্যাপার ছিল জীবনানন্দের। সে ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল তাঁর *সফলতা নিষ্ফলতা* উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাওয়ার পর। এই উপন্যাসের তিনজন চরিত্র লেখালেখিকেই জীবনের ব্রত করতে চায়। তিনজনের মধ্যে নিখিল চরিত্রের সঙ্গে জীবনানন্দের মিলটা বোঝা যায়। অন্য দুজন চরিত্র বানেশ্বর এবং শঙ্করের সঙ্গে তাঁর সে সময়কার পরিচিত সাহিত্যিকদের আদল আছে। বানেশ্বর চরিত্রটার ভেতর স্পষ্টতই আছে বুদ্ধদেব বসুর ছায়া। নিখিল বানেশ্বরের চেয়ে বয়সে বড়, তবে নিখিলের চেয়ে বানেশ্বরের সাহিত্যিক খ্যাতি বেশি। বানেশ্বর নানা রকম বইপত্র লিখে নাম এবং টাকা কামাচ্ছে। সেসব বই বেশ বাজার-চলতি। উপন্যাসের এক জায়গায় নিখিল বানেশ্বরকে বলছেন, 'সে এক দিন ছিলো বানেশ্বর বাবু, যখন আপনি একটা কাগজ চালাতেন—একটা কবিতা পাঠালেই সেটার সম্বন্ধে তিন পৃষ্ঠা মন্তব্য এমনি আমাকে লিখে পাঠাতেন। আপনার মত ডিভোশন নিয়ে কেউ আমার কবিতা পড়ে দেখেনি—আমার জিনিষ কেউ ছাপায়নি এত—আপনার কাছ থেকে আমি যথেষ্ট আস্কারা পেয়েছি—এ ঋণ আমি ভুলতে পারব না কোনদিন বানেশ্বর বাবু...'

BanglaBook.org

এখানে জীবনানন্দ আর বুদ্ধদেবের সম্পর্কের ছায়া স্পষ্টই।

তবে বানেশ্বর এখন যেসব গল্প-উপন্যাস লিখছে, নিখিল সেগুলোকে ছেলেমানুষি মনে করে। সেসব গল্পে শুধু প্রেম, যৌনতা এসব। যদিও বানেশ্বর বলে, 'এসব গল্প ছেলেমানুষি নয়, এসব গল্প লিখতে সাহস লাগে, সেই সাহস আপনার নেই।'

জবাবে নিখিল বলে, 'কিন্তু আমার কুকুরের আছে, ফি বছর আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দিনের আলোয় সকলের সামনে পিতা হবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় কোন দিনও তার দ্বিধা নেই—ভয় নেই—পশ্চাৎপরতা নেই; ঢিল মারলেও পালায় না।'

বানেশ্বরের ওই ধরনের গল্প লেখা রাস্তার কুকুরের সংগম করার মতোই ব্যাপার নিখিলের কাছে। স্মরণ করা যেতে পারে বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'রজনী হলো উতলা' নামে এক গল্প নিয়ে তখন অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল।

সফলতা নিষ্ফলতা উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, বানেশ্বর গল্প লেখার পর বসে মাস্টারবেট করে। বানেশ্বর বলে, 'গল্প তৈরী হয়ে গেছে—তারপর আমার গল্পের সমস্ত মেয়েমানুষের অভাব আমি না হয় আমার গল্পটা শেষ করে সব ভুলে গিয়ে এই সোফায় বসেই—সেই শরীরের আস্বাদটাই মিটিয়ে নিলাম।'

নিখিল জানতে চায়, তারপরে একটা নিষ্কৃতি বোধ করেন নাকি?

কেন?

উপভোগ হলো অথচ দাম্পত্যের বোঝা বহন করতে হলো না।

বাস্তবিক স্ত্রী থাকলে একটা অলম্বুশের মত মনে হতো তাকে তখন।

বাইরে বেরিয়ে পয়সা খরচ করার চেয়েও।

বানেশ্বর একটা সিগারেট জ্বালাল, বলল, 'বাস্তবিক, স্ত্রী মেয়েমানুষের লাশের মতো একটা অলম্বুশ জিনিস বিছানায় পড়ে নেই বলে তখনই সবচেয়ে বেশী শান্তি বোধ করি।...আমি হুইস্কি সঙ্গে রাখি।...তারপর দুটো ডিম ফেটিয়ে খানিকটা সোডা পোর্টের সঙ্গে মিশিয়ে খাই...তারপর এক গ্লাস আন্দাজ নির্জলা সোডা হুইস্কি—'

বানেশ্বরকে দেখা যায় সার্বিকভাবে ভোগী একজন চরিত্র হিসেবে। বানেশ্বর বলছে, 'এম এ পাশ করা হয়ে গেছে—লিখে নাম করেছি : জীবন এখন আয়েসও চায়—আমার চেয়ে অনেক নীচু দরের লোক অনেক বেশী আরাম করছে, তাদের সুন্দরী বউ—ফার্স্ট ক্লাস সোফা—সামবিম কার—টেবিলে হুইস্কি—কুষ্ঠের ভয়ে সোফায় ঘষড়াব না? জীবনে পেলাম কী তাহলে? নারীকে বুঝতে গিয়ে সিফিলিস-গনোরিয়ার ভয় কোনও দিন কি আমাকে ঠেকাতে পেরেছে, নিখিল বাবু?'

বানেশ্বরের বই বেশ বিক্রি হলেও তার সম্পর্কে পাঠকের কী ধারণা, সে বিষয়ে নিখিলের মত, 'বানেশ্বরকে মনে মনে অবিশ্যি এরা সকলেই ঠাট্টা করে—এর পদপ্রতিভা যে এক ঢিবি বালি দিয়ে তৈরী, নিভৃতে সকলেই তা জানে...'

BanglaBook.org

উপন্যাসে নিখিল বানেশ্বরের যখন প্রশংসা করে, তখন তাতে থাকে একধরনের ব্যঙ্গ। নিখিল বলে, 'বানেশ্বরকে দেখেই প্রথম চমকালাম—তার চেহারার সৌন্দর্যের জন্য নয়—কিন্তু মনের সাধ ও সাহসের জন্য; সাহিত্যে এই জিনিসগুলো তাকে হাড়হাভাতে করে তুলেছে বটে—কিন্তু জীবনে তাকে বেশ আলাচানা—চানাচুর মানুষ করে রেখেছে; আমি নোনতা ও ঝাল খুব ভালোবাসি; একটু একটু ঠান্ডা লেবুর রসও আছে, এমন হিমশান্তি দেয়।'

তিন

কেতকী কুশারী ডাইসন জীবনানন্দের *সফলতা নিষ্ফলতা* বইটাকে কেন্দ্র করে একটা বড়সড় বই লিখেছেন *তিসিডোর* নামে। কেতকী এই প্রস্তাবই করছেন যে *সফলতা নিষ্ফলতা* উপন্যাসটা জীবনানন্দ বুদ্ধদেবের ওপর ঈর্ষান্বিত হয়েই লিখেছেন। বুদ্ধদেব সফল আর জীবনানন্দ নিষ্ফল। কেতকী বলছেন, 'এই উপন্যাসের ভেতর দিয়ে জীবনানন্দের একটা অপরিচিত দিক আমাদের সামনে খুলে যায়, যেন চাঁদের উল্টো পিঠ। তার মনের অন্ধকার, মালিন্যময় দিক সেটা।' কেতকী লিখেছেন, 'নিরাপত্তাবোধের এতটাই অভাব ছিলো তার মধ্যে যে অনুজপ্রতিম লেখকের অল্প একটু প্রতিষ্ঠাতেই তিনি এতদূর বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন? এ তো এক রকমের হীনম্মন্যতাবোধ।'

কেতকী মনে করেন, বানেশ্বরের সাথে নিখিলেন সম্পর্কের যে ছবি জীবনানন্দ এঁকেছেন, তাতে তাঁর 'ষ্টাটাস এ্যাংজাইটি' প্রকাশ পায়। জীবনে, সাহিত্যে নিজের অবস্থা নিয়ে জীবনানন্দের একটা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাহীনতার বোধ ছিল। আর এই যে বুদ্ধদেব আদলের চরিত্রটাকে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করছেন, একে কেতকী ব্যাখ্যা করেছেন মনোবিজ্ঞানী গুস্তাফ ইয়ুংয়ের 'শ্যাডো' তত্ত্ব দিয়ে। ইয়ুংয়ের ছায়াতত্ত্ব আসলে আমাদের ব্যক্তিত্বের অজানা অন্ধকার অলিগলি। জীবনে পথ নির্বাচনের একটা প্রয়োজন সবার থাকে কিন্তু একটা পথ বেছে নিলে অন্য পথগুলো আর পরিক্রমা করা হয় না। সেই 'অনির্বাচিত' পথগুলো মিলিয়েই গড়ে ওঠে আমাদের 'ছায়া'। নির্বাচিত পথ আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে একটা বিশেষ দিকে ঠেলে দেয়। যা হতে পারতাম কিন্তু হলাম না, যা কিছু করতে পারতাম কিন্তু করলাম না, আমাদের সেই অযাপিত জীবনই 'ছায়া' হিসেবে দেখা দেয়। কেতকী লিখছেন, 'জীবনানন্দের ছায়া স্বত্তার মধ্যে যত রকমের নঙঅর্থক অনুভূমি জমে উঠেছিলো—অতৃপ্তি, অযাপিত জীবন, অভিমান, ক্রোধ, ঈর্ষা, চেয়ে না পাওয়া, আশাভঙ্গ, অক্ষমতার গ্লানিবোধ—সব যেন তিনি তূণ থেকে বাণের মতো একটা একটা করে নামিয়ে তার স্বহস্তে প্রস্তুত কুশপুত্তলিকার দিকে ছুঁড়ে মেরেছেন। আর যাকে সুপরিকল্পিতভাবে এতগুলো বাণের লক্ষ করেছেন, শাণিত বিদ্রূপে তারই নাম রেখেছেন বানেশ্বর।'

BanglaBook.org

জীবনানন্দকে কেতকী বলেছেন 'জটিল, স্তরান্বিত, ব্যতিক্রমী, কমপ্লেক্স সমন্বিত, অনিশ্চয়তাবোধ দ্বারা আক্রান্ত, অন্তর্মুখী, কিছুটা ডিপ্রেসিভ, একাকিত্ব পীড়িত, দ্বন্দ্বদীর্ণ "আধুনিক" মনের মানুষ...'

কথা সত্য বটে।

চার

জীবনানন্দের পক্ষের একসময়ের সেই একমাত্র যোদ্ধা বুদ্ধদেব বসু যখন জীবনানন্দকে মাঠে একা রেখে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছেন, তখন জীবনানন্দের পক্ষে দাঁড়ালেন নতুন দুজন। একজন সেই সঞ্জয় ভট্টাচার্য, যিনি প্রকাশ্যে সরব রইলেন জীবনানন্দের পক্ষে। তিনি *নিরুক্ত* পত্রিকায় লিখলেন, 'যৌবনের শেষে স্থবিরতার পথে সত্যকে খুঁজতে এগিয়ে গেছেন জীবনানন্দ।...এখন আর চোখ তাঁর স্বপ্নমেদুর নয়, জিজ্ঞাসায় তা প্রখর।...দেখলেন, আজকের দিনের জীবন আমাদের জটিল সমস্যায় ঘেরা। বিংশ শতাব্দীর প্রশ্নসমাকীর্ণ জীবনকে যখন তিনি বুঝতে চাইলেন তখন তার ভাষা থেকেও স্বপ্নের সেই প্রাক্তন কোমল ঋজুতা ঝরে পড়েছে, এসেছে তাতে গদ্যভঙ্গি, মিশেছে জটিলতা...

আর বেশ অপ্রত্যাশিতভাবে এই সময় জীবনানন্দ পেলেন আরেক অচেনা মেধাবী অনুরাগীকে। তিনি কোনো লেখক কবি নন, নেহাতই একজন অখ্যাত পাঠক। প্রভাকর সেন নামের এক পাঠকের চিঠি পেয়ে বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন জীবনানন্দ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সদ্য এমএ পাস করা এই যুবকের চিঠি তিনি পান বরিশালে বসে। জীবনানন্দের কবিতাকে তিনি কীভাবে বোঝেন, সে কথাই প্রভাকর চিঠিতে লিখে জানান জীবনানন্দকে। জীবনানন্দ অবাক হয়ে লক্ষ করেন, তাঁর কবিমানসকে ঠিক এভাবে এত গুছিয়ে এর আগে কেউ বিশ্লেষণ করেনি প্রভাকর লিখেছেন, আমার সাহিত্যিক জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ ও কখনো তা পরীক্ষার নিয়মানুগ পথে আহরিত হয়নি। সুতরাং আপনার কবিতার রস সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার উপযুক্ত নিশ্চয়ই আমি নই। তবু আপনাকে পড়ে আপনার সম্বন্ধে যে কয়টি ধারণা আমার হয়েছে তা আমি যাচাই করে নিতে চাই আপনারই কাছ থেকে।

'আমার প্রথম ধারণা হচ্ছে আপনার কবিতা লেখার পদ্ধতি সম্বন্ধে। আমার মনে হয় আপনি যখনি ভাবাক্রান্ত হন তখনি আমাদের দেশের অন্যান্য হাজার কবিদের মত কলম ধরেন না। সমগ্র ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোষাকে ভেবে অথবা অনুভব করে নেন একই অথবা বিভিন্ন সময়ে। যার ফলে আপনার কবিতার প্রত্যেকটি আঙ্গিক অন্য প্রত্যেকটি আঙ্গিককে স্পষ্ট করে ও সুমঞ্জস করে তোলে এতে করে কোন একটা বিশেষ ছত্রের দাম হয়তো ক্ষুণ্ন হয় কিন্তু সমস্ত নক্সাটির উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে বেশী করে। সোজা কথা আপনার প্রত্যেকটি

BanglaBook.org

অক্ষর আপনার আবেগের সমান অংশীদার হয়ে ওঠে। এ ধারণা কি সত্যি? এ প্রশ্ন করলাম যে আমাদের যাবতীয় কবিরা এভাবে তাদের রচনা পদ্ধতিকে দেখেন না বলেই আমার মনে হয়...

'আমার দ্বিতীয় ধারণা আপনার কাব্যপ্রেরণার উৎস সম্বন্ধে। মনে হয় আপনার আধুনিক সব লেখাগুলির শিকড় রয়েছে নিরবধি কাল ও ধূসর প্রসৃতির চেতনার মধ্যে। বিশেষ করে কাল চেতনার মধ্যে, যাকে বলা যেতে পারে ইংরাজি time consciousness আমার ধারণা কি সত্যি। আমি এ প্রশ্ন করলাম এই জন্য যে আমাদের দেশের খুব কম কবির মধ্যেই এই time consciousness, consciousness of time as a universe দেখা যায়। দেখা যায় না বল্লেই চলে। আর সেজন্যই মাফ করবেন আপনার কবিতা সাহিত্যের বড় বাজারে কাটে না, কাটে সাহিত্যের চোরা বাজারে যেখানে আমরা দুএকজন থাকি অনেক বেশী দাম দিয়ে, অনেক ক্ষতি স্বীকার করে, অনেক কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় চড়বার জন্য তৈরী হয়ে, কৃষ্ণনীল সময়ের ডানায় নিজেদের ভয়ে ভয়ে বেঁধে নক্ষত্র থেকে কোটি আলোক বৎসরের সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য তৈরী হয়ে। বিশ্বাস করুন।

'আমার তৃতীয় ধারণা আপনার ইতিহাস-দর্শন সম্বন্ধে। আমার মনে হয়, যেহেতু আপনি কালের উড়ে যাওয়া সম্বন্ধে সচেতন, কোন বিশেষ যুগকে বা বিশেষ ব্যবস্থাকে, এমনকি স্বয়ং মানুষকেও আপনার পক্ষে চরম ভেবে আঁকড়ে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। আঁকড়ে থাকতে চান কিন্তু বোধহয় পারেন না। তবু আপনি নিজে রক্তে মাংসে সৃষ্ট, মানুষী চেতনায় আপনি পরিপূর্ণ, সেজন্যই বোধহয় মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতে আপনার ভালো লাগে, ইচ্ছা হয়। আমার এ ধারণা কি সত্যি? আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে আমি দেখেছি আমাদের দেশে রবীন্দ্রোত্তর সমস্ত কবিরাই হয় জীবনের ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ আনাস্থা জানিয়েছেন (অবশ্য অত্যন্ত স্থূল সীমাবদ্ধ ব্যবস্থার অর্থে) অথবা একেবারে সম্পূর্ণ আস্থা জানিয়েছেন (উক্ত অর্থে)। কেউ কাল প্রসৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করেছেন বলে মনে হয় না।'

চিঠিটা পড়ে জীবনানন্দের মনে হলো, তিনি যেন নিজেই নিজেকে নতুন করে চিনলেন। জীবনানন্দ প্রভাকরকে অনেক প্রশংসা করে চিঠির উত্তর দিলেন, এমনকি যেচে এই অচেনা পাঠককে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন তাঁর বইয়ের ওপর পত্রিকায় একটা রিভিউ লেখেন। চিঠিতে জীবনানন্দ লিখলেন, ...আমার কাব্য আলোচনা করে আপনাকে ছাপাতে অনুরোধ করা যদিও আত্মরতি একরকম, তবুও সাহিত্যের বিশেষত আমার কবিতা সম্পর্কে এমন একজন শিল্পামোদী, সুস্পষ্ট বিশেষজ্ঞকে চুপ করে থাকতে দেখলে কুণ্ঠা বোধ করবো...

BanglaBook.org

প্রভাকর জীবনানন্দকে নিয়ে কোনো আলোচনা লেখার সাহস পাননি, তবে জীবনানন্দ নিজেই প্রভাকরের কথাগুলো অনেকটুকুই ধার করে লিখেছেন একটা প্রবন্ধ, যাতে তিনি তাঁর কবিতার সত্তাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে

এক

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ভারতে তখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তীব্র হয়েছে ভারত ছাড় আন্দোলন। ভারত স্বাধীন হবে এমন আলোচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে চলছে নানা জটিলতা। চলছে গান্ধী, নেহরু, জিন্নাহর দ্বন্দ্ব। হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়ে যাবে কি না, তার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের ভেতর দেখা দিয়েছে উদ্বেগ। এ সময় জীবনানন্দ বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে লাগলেন কলকাতায় চলে যাবেন কি না। তাঁর প্রধান আকর্ষণ কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। পরিস্থিতি বুঝবার জন্য এবং সম্ভাবনাগুলো যাচাই করার জন্য কলেজ থেকে দুই মাসের ছুটি নিয়ে জীবনানন্দ গেলেন কলকাতা। গিয়ে অশোকানন্দের বাড়িতে উঠলেন।

কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে, তিনি যখন কলকাতায়, ঠিক সেই সময়টাতে একদিন সেখানে এক বড় দাঙ্গা বাধল হিন্দু-মুসলমানে। সেদিন ছিল ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট। এক মারাত্মক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষেই অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জীবনানন্দ পড়ে গেলেন সেই দাঙ্গার ভেতর। ক্রিক রো দিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন, হঠাৎ দেখলেন একদল লোক ছুরি, রামদা নিয়ে ছুটে আসছে, রাস্তার লোকজন সব দৌড়ে নানা দিকে পালাচ্ছে, আশপাশের বাড়ির দরজা-জানালা সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সামনে দিয়ে তখন একটা পুলিশ ভ্যান আসছে। লোকজন সব লুকিয়ে গেলেও জীবনানন্দ পরিস্থিতির আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তায় আর কেউ নেই, ভ্যান এসে দাঁড়ায় তাঁর সামনে। পুলিশ অফিসার তাঁর বুকের ওপর বন্দুক ধরে বললেন, 'আই থিংক ইউ আর দ্য রিং লিডার অব দিস এরিয়া। জাস্ট গেট অন।' পুলিশ তাঁকে ভ্যানে উঠিয়ে নিয়ে যায় থানায়। থানায় তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়। জীবনানন্দ দেখলেন, থানায় তাঁর মতো এমন আরও কয়েকজনকে ধরে এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। হতবিহ্বল হয়ে বসে রইলেন। একসময় জানতে চাইলেন,

BanglaBook.org

কতক্ষণ এখানে বসে থাকতে হবে? পুলিশ বলে, চুপচাপ বসে থাকেন, ওসি এলে তারপর ঠিক হবে। বিকেলে তাঁদের ধরে আনা হয়েছিল, সন্ধ্যার দিকে ওসি এলেন। সব পুলিশ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। ওসি এসে দাঁড়ালেন গ্রেপ্তারকৃতদের সামনে। ওসি সবাইকে ভালো করে দেখতে গিয়ে চোখ পড়ল জীবনানন্দের দিকে। তাঁকে দেখেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাছে গিয়ে একেবারে পা ধরে প্রণাম করে বললেন, 'এ কী স্যার, আপনি এখানে কেন?' জীবনানন্দ কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। বললেন, 'তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।' ওসি তখন তাঁর মাথার ক্যাপটা খুলে বলেন, 'আমার নাম আজহারুদ্দীন আহমেদ, আমি আপনার ছাত্র ছিলাম স্যার, বিএম কলেজে।' জীবনানন্দ ঘটনা তাঁকে জানালেন। সেই ওসি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে বললেন, 'আমি স্যার ওদের সবার হয়ে ক্ষমা চাইছি। আপনি আসুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।'

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সেই ঘোরকালে এক মুসলমান ওসির সুবাদে সেদিন মুক্ত হলেন জীবনানন্দ দাশ, নইলে হয়তো বনলতা সেনের কবিকে দাঙ্গার রিং লিডার হিসেবেই জেল খাটতে হতো। কিন্তু ওই দিনের ওই দাঙ্গার ঘটনা জীবনানন্দকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। বরিশালে ফিরে লিখলেন:

মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয়ে কঠিন হ'য়ে বধ ক'রে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিপ্লবকে
বধ ক'রে ঘুমাতেছি—

যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালীর—'
কোথাকার কে বা জানে;

অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে;
কেউ নেই, কিছু নেই—সূর্য নিভে গেছে।

BanglaBook.org

দুই

দাঙ্গার ভেতর থেকে ফিরে আসার পর বরিশালে বসে জীবনানন্দ আবার দোলাচলে পড়ে গেলেন কলকাতায় যাবেন, না বরিশালে থাকবেন। দেশভাগ নিয়ে গান্ধী, নেহরু, জিন্নাহর বাদানুবাদ চলছে তখন। মানুষের ভেতরও তখন এই নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক। ভারতের নানা জায়গায় ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই সময় নোয়াখালীতে বিরাট এক দাঙ্গা হলো। গান্ধী নিজে এলেন সেই দাঙ্গা থামাতে। বরিশালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যে এখানেও দাঙ্গা হবে। পূর্ব বাংলা মুসলমানদের দেশ হবে এই নিয়ে জোর আওয়াজ। হিন্দুরা আতঙ্কে রইল। চারদিকে গুজব উঠল যে বিহার থেকে হাজার হাজার মুসলমান সব পূর্ব বাংলায় ঢুকছে, তারা বরিশালের দিকেও আসছে। শোনা গেল, বিহারের মুসলমানরা এ অঞ্চলের হিন্দুদের আর থাকতে দেবে না। বিএম কলেজের হিন্দু শিক্ষকেরা অনেকেই কলকাতায় পাড়ি জমাতে শুরু করলেন তখন। জীবনানন্দ কলকাতায় যেতে চেয়েছিলেন শিল্প-সাহিত্যের একটা বড় প্রেক্ষাপটে পড়বার জন্য কিন্তু এভাবে আতঙ্কে পালিয়ে যাবার কথা তিনি ভাবেননি কখনো। এদিকে পরিস্থিতি যত ঘোলাটে হতে থাকল, কলকাতা থেকে ভাই অশোক, বোন সুচরিতা চিঠির পর চিঠি দিতে লাগলেন, তাগাদা দিতে লাগলেন যে বরিশালে থাকা আর মোটেও নিরাপদ নয়, তিনি যেন চলে আসেন কলকাতায়।

কিন্তু এভাবে তাড়া খেয়ে নিজের দেশ থেকে চলে যাবার জন্য জীবনানন্দ তখন মোটেও প্রস্তুত নন। এ সময় কলেজে পূজার ছুটি হলো। জীবনানন্দ কলকাতায় গেলেন লাবণ্য আর ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে। জিনিসপত্র তেমন কিছু সঙ্গে নিলেন না, কিন্তু সঙ্গে করে নিলেন তাঁর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সেই ট্রাঙ্কগুলো, যেখানে গোপনে রেখে দিয়েছেন তাঁর অগণিত অপ্রকাশিত লেখার পাণ্ডুলিপি। মনে একটা আশঙ্কা ছিল, যদি আর আসা না হয়? কলকাতায় গিয়ে উঠলেন অশোকের বাড়িতে। সেখানে তাঁর মা-ও আছেন। জীবনানন্দ ঠিক কলকাতায় থেকে যাবেন, তেমন সিদ্ধান্ত তখনো নেননি। কলকাতায় এসে বিএম কলেজে একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলেন। বোঝা যায়, তিনি দুটো পথই খোলা রাখছেন। কলকাতায় কিছুদিন থেকে পরিস্থিতিটা বুঝতে চাইলেন। সুবিধা না হলে আবার বরিশাল ফিরে যাবেন, এমন ভাবছিলেন তখন। রামযশ কলেজে তাঁর ছুটি মঞ্জুর হয়নি কিন্তু বিএম কলেজে ছুটি মঞ্জুর হলো। কিন্তু জীবনানন্দ বরিশাল ছেড়ে আসুন, সেটা কুসুমকুমারী কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। এ সময় জীবনানন্দ ডায়েরিতে লিখেছেন 'Mother however, does not like this idea-Mother hates the idea of working in Cal leaving BM College. 2) Purchasing land near Call or in W. Bengal

BanglaBook.org

leaving homeland & aunt's land's at Barishal. 3) Showing any preference for other places & ways of life than led by my ancestors for generations at Barisal.'

বিএম কলেজে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে কাজ করা, বরিশালের পূর্বপুরুষের ভিটা ছেড়ে কলকাতার পাশে কোনো জায়গা কেনার কথা ভাবতেই পারেন না মা। জীবনানন্দ একটা নোম্যানসল্যান্ডের ভেতর দিন পার করছেন তখন।

তিন

জীবনানন্দ যখন এই দোলাচলে ভুগছেন, তখনই ভারতবর্ষে দুই শ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলো। স্বাধীন হলো ভারত। ব্রিটিশদের কারসাজি, ভারতীয় রাজনীতিবিদদের নানা দলাদলি, স্বার্থ মিলিয়ে তৈরি হলো একটা নয় দুটা দেশ। র‍্যাডক্লিফ সাহেব ইংল্যান্ড থেকে এসে ভারতের ম্যাপের ওপর পেনসিল দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে নির্ধারণ করলেন দুটা দেশের ম্যাপ। একটা হিন্দুদের, অন্যটা মুসলমানের। বরিশাল পড়ল মুসলমানদের দেশে। সেখানে যেতে হলে তাঁকে এখন আটকাবে সীমান্তপ্রহরী। তিনি কি ফিরে যাবেন বরিশালে? ধর্মপরিচয় কখনো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তাঁর কাছে। কিন্তু ধর্মপরিচয় তাঁর কাছে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল তাঁর নিজের দেশে যেতে। মুসলমানদের জন্য ঘোষিত দেশে গিয়ে তিনি কি নিরাপদে থাকতে পারবেন? কিছুদিন আগেই এক রক্তাক্ত দাঙ্গার অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। অথচ তিনি তো নিবিড় করে একদিন ডেকেছেন তাঁরই নিরন্ন মুসলিম প্রতিবেশীকে। শরৎচন্দ্রের সেই গফুর আর তার বলদ মহেশকে স্মরণ করে লিখেছেন :

> 'গফুর'—নীরবে তাহাকে আমি ডাকিলাম, তবু—
> তবুও আমার কানে লেগে এই—এরকম বায়বীয় রোল
> ততটা কৃত্রিম নয়, যতটা অসমীচীন—হিম—
> 'তোমার বলদ দুটো কই গেল' 'সে সব অনেকদিন আগে
> মরে গেছে'—যেন কারু সহোদর মরে গেছে, অথবা হানিফা
> নেই আর—তবুও কিছুই নেই বলে
> কোথাও অন্য কিছু নেই বলে গফুরের মুখের ভিতরে
> নিসর্গ নিজেই চুপে বিকেলের প্রান্তরের দোয়েলের মতো
> নেমে এল...

এক নিরালম্ব মানসিক অবস্থায় কাটাতে লাগলেন জীবনানন্দ। তাঁর হাতে তখনো বিএম কলেজের ছুটির অনুমোদনের চিঠি। যত দিন গেল তিনি টের পেলেন যে দেশ তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে। তিনি হয়ে গেছেন অন্য এক দেশের

BanglaBook.org

বাসিন্দা। তিনি দেখলেন, এপারের মানুষ ওপারে আর ওপারের মানুষ এপারে জায়গা বদলের, সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছাড়ার এক মর্মান্তিক যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। জীবনানন্দ বিহ্বল হয়ে এই অভূতপূর্ব মানবস্রোত দেখতে লাগলেন। সীমানার দুপারে উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়, নিলামে বিক্রি হচ্ছে বাড়িঘর, অচেনা পরিমণ্ডলে একে অপরকে আড়চোখে দেখছে। তিনি লিখলেন :

...দিনের আলোয় ঐ চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা;
পথে ঘাটে ট্রাক ট্রামলাইনে ফুটপাতে,
কোথায় পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে—মনে হয়,
জলের মতন দামে।
সকলের ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছুবে
সকলের আগে সকলেই তাই...
বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
সূর্য অস্তে চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে?
আলুলায়িত হ'য়ে চেয়ে থাকে—কিন্তু কার তরে?
হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই—, বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী
হ'তে পেরেছিলো প্রায়, নিভে গেছে সব।

আজকে অস্পষ্ট সব? ভালো ক'রে কথা ভাবা এখন কঠিন;
অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার
নিয়ম এখন আছে; তারপর একা অন্ধকারে
বাকি সত্য আঁচ ক'রে নেওয়ার রেওয়াজ
র'য়ে গেছে, সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে...

ভালো করে কোনো কথা ভাবা তখন কঠিন হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। কিন্তু জায়গা পাল্টালেই যে জীবন পাল্টায় না, সে কথা এক অশ্বত্থগাছের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছিলেন অনেক আগেই :

বলিল অশ্বত্থ ধীরে : 'কোন দিকে যাবে বলো—
তোমরা কোথায় যেতে চাও?
এত দিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত কাছে;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো—আজো তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;
এইসব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন দিকে কোন পথে ফের

BanglaBook.org

তোমরা যেতেছ চ'লে পাইনাকো টের।
বোঁচকা বেঁধেছো ঢের—ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটো ঘটিটাও;
আবার কোথায় যেতে চাও?

'এখানে তোমরা তবু থাকিবে না? যাবে চ'লে তবে কোন পথে?
সেই পথে আরো শান্তি—আরো বুঝি সাধ?
আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্ক্ষার ঘর!...
যেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর!'
বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।

ব্যথাবিচ্ছেদের ধূসর কাহিনি অনিবার্যভাবে দেখা দেবে জেনেও তাঁকে জায়গা বদল করতে হলো। থেকে যেতে হলো কলকাতায়।

চার

দেশভাগের পর কোনটা যে নিজের দেশ, এ নিয়ে মনে যে এক বায়বীয় অবস্থা তৈরি হয় জীবনানন্দের, সে ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ সময় লেখা তাঁর উপন্যাস *জলপাইহাটি*তে। ভারতকে তখন বলা হতো 'ইউনিয়ন'। তিনি যে নিশীতবাবুর কথা লিখেছেন তাতে স্পষ্টই তার ছায়া। নিশীতবাবু যে পাকিস্তান ছেড়ে ইউনিয়নে চলে গেছেন এটা আমাদের আবিষ্কার, তিনি নিজে জানলেন না যে তিনি ইউনিয়নে গেছেন, তিনি যে পাকিস্তানে ছিলেন সে ধারণাও তাঁর নেই। পাকিস্তান বা ইউনিয়ন বা কোনো পলিটিকস নয়, অন্য জিনিস তাঁকে বায়ুভূত করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার অনেক আগে গত চার-পাঁচ বছর ধরেই তিনি কলকাতায় কাজের চেষ্টায় আছেন। তাঁর কলেজ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দেয়নি, তাঁর পরিবারও তাঁকে ঠকিয়েছে, এসব বিষয়ে শেষের দিকে তিনি খুব হদ্দ হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় কেউ তাঁর ঢেঁকি কলে পাড় দিতে আসবে না—পড়ে থাকবে ঢেঁকিটা। এখানে বসে আমরা তাঁকে ইউনিয়নের শ্রীখোল মনে করে তবলায় চাঁটি মারছি। এসব মানুষ আজকের পৃথিবীতে প্রাপ্য তো দূরের কথা কোনো পথই খুঁজে পান না।'

তেমনি তাঁর *বাসমতির উপাখ্যান* উপন্যাসে লিখেছেন, 'ও—তুমি ভেবেছ পাকিস্তানে যাবে?' প্রভাতবাবু এতক্ষণে হাঁচিটা খালাস করে ফেলে বললেন।

'বাসমতি ত পাকিস্তানে পড়বে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু কলকাতাও?'

'ফজলুল হক বলেছিলেন—' প্রভাসবাবু দাঁতে চুরুট আটকে রেখে বললেন, কিন্তু কাশি এসে পড়ল তাঁর, কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি, চুরুট টানাও থেমে রইল কিছুক্ষণ।

'ফজলুল হক বলেছিলেন' প্রভাসবাবু বললেন, 'কলকাতার বাড়িগুলো মোছলমান রাজমিস্ত্রিরা তৈরি করেছে, অতএব কলকাতা শহরটা মোছলমানদের।'

'স্বাধীন হচ্ছে ত দেশ।'

'স্বাধীন হচ্ছে।'

'বড় পৃথিবী তোমাদের।'

'বড় পৃথিবীর খোঁজ পাওয়া যাবে হয় ত দেশ স্বাধীন হলে,' রমা বলল। 'হয় ত পাওয়া যাবে না। স্বাধীনতাকেই চার অক্ষরের অমৃত মনে করলে পাওয়া অসম্ভব। আমার ভয় হচ্ছে অনেকেই মনে করবে তাই।'

স্বাধীনতাকে চার অক্ষরের অমৃত ভেবে যারা ফুর্তি করছে, তারা যে বিপদ টের পাচ্ছে না, সেটা তিনি বুঝেছেন। *জলপাইহাটি* উপন্যাসে লিখেছেন, 'আমাদের দেশ স্বাধীন হল বলে কয়েকটি লোক ছাড়া আর-কেউ কিন্তু সত্যি টের পেল না, এই কথা যে আমাদের দেশের আজকের প্রাঞ্জল সত্য, এই আমি বলছি...'

এসব বিশৃঙ্খলার ভেতর ভারত যে স্বাধীন হলো, তা যে বিরাট কোনো সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে না, সে কথা ওই উপন্যাসেই লিখেছেন, '...হ্যাঁ, ওদের; আর ওদের মতন ছোকরা আর বুড়োদের। কিন্তু আমাদের কোনো মীমাংসা হবে না। মীমাংসার ভার যাদের ওপরে বাংলাদেশের সে-সব অন্ধদের ত এখনই দেখছি আমি; রাতারাতি ভোল বদলাবে এরা! এদের আওতায় সমস্ত দেশ অন্ধ, খোঁড়া, নুলো, বোবায় ভরে যাবে টাকা চাকরি ব্যবসা, সবই ওদের; দেশ স্বাধীন হল বলে ভালা লাগবে আমাদের, কিন্তু অন্য সব দিক দিয়ে খুবই খারাপ লাগবে। সপরিবারে মরেও যেতে পারি। বাসমতীতে কলেজের কাজে থাকলে খেয়ে বেঁচে থাকার খানিকটা সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু কলকাতায় গেলে সপরিবারে শেষে মারা যাব কিংবা টি-বিতে না খেতে পেয়ে; স্বাধীনতার কোনো সেবকও আমাদের দিকে ফিরে তাকাতে যাবে না।'

এত সব বুঝেও তাঁর হাতে কলকাতায় থেকে যাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। নিজের ভিটেমাটি চিরদিনের জন্য ছেড়ে তখন শুরু হলো জীবনানন্দের উদ্বাস্তু জীবন।

BanglaBook.org

এক

বরিশালে আর ফেরা হচ্ছে না, ফলে ব্রজমোহন কলেজের চাকরিটা তাঁর গেল। কলকাতায় তাহলে একটা কোনো জীবিকা দরকার। কলকাতায় চাকরি খোঁজার বিভীষিকা তাঁর মনে আছে। একটা আতঙ্ক, দিশেহারা অবস্থা তখন। এ রকম একটা সময় তাঁকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য আর *পূর্বাশা* পত্রিকার মালিক সত্যপ্রসাদ দত্ত। তাঁরা এসে একদিন জীবনানন্দকে বললেন, 'আপনার জন্য একটা চাকরি জোগাড় করেছি, পত্রিকায়। আপনার ভালো লাগবে।' সরকারি বড় কর্মকর্তা এবং সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের উদ্যোগে নতুন একটা দৈনিক পত্রিকা তখন চালু হয়েছে *স্বরাজ* নামে। স্বাধীন দেশের আবেগকে ধরতেই এমন একটা নাম দেওয়া হয়েছিল পত্রিকাটার। বেশ তোড়জোড়েই শুরু হয়েছিল সে পত্রিকা। সঞ্জয়ই বিশেষ করে হুমায়ুন কবির আর সত্যেন্দ্রনাথকে তদবির করে পত্রিকাটার রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগের দায়িত্ব জীবনানন্দকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। হুমায়ুন কবির জীবনানন্দের লেখার গুণগ্রাহী, ফলে তিনিও এ প্রস্তাব সাগ্রহেই গ্রহণ করেন। জীবনানন্দের বিকল্প কোনো কিছু ছিল না তখন, তা ছাড়া শিক্ষকতায় ফিরবার আগ্রহও বিশেষ ছিল না, বেকার অবস্থায় একবার সাংবাদিকতা করার কথাও ভেবেছিলেন। বিশেষ করে দায়িত্বটা সাহিত্য পাতার, ফলে সব মিলিয়ে মনে হলো চাকরিটা জুতসই হবে। জীবনানন্দ যোগ দিলেন *স্বরাজ* পত্রিকায়।

স্বরাজ-এ যোগ দিয়ে জীবনানন্দ বুঝলেন তাঁর এত দিনের কলেজে শিক্ষকতার পরিবেশের চাইতে পত্রিকার অফিসের পরিবেশ একেবারেই ভিন্ন। কলেজে নিজের মতো ক্লাস নিয়েছেন, কখনো টিচার রুমে বসেছেন, কখনো বসেননি, বাড়ি ফিরে গেছেন। কিন্তু পত্রিকা অফিসে সব সময় একটা হইহুলুস্থুল অবস্থা। প্রতিদিনের খবর ধরার মহাব্যস্ততা। যেন গরম তাওয়ায় রুটি ভাজা হচ্ছে। রুটি তাড়াতাড়ি নামিয়ে না নিলে পুড়ে যাবে নির্ঘাত। এখানে সবার ভেতর 'এই এখনই করে দিচ্ছি'-জাতীয় একটা ভাব। একটা চটজলদি আবহ চারদিকে। নানা রকম লোকের আনাগোনা। জীবনানন্দের যে কাজ সেটা সাপ্তাহিক হলেও ওই রবিবাসরীয় পৃষ্ঠা ভরাতে সারা সপ্তাহই ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে। পাতা ভরানো, লেখা জোগাড় এক সার্বক্ষণিক উদ্বিগ্নতার ব্যাপার। এ ধরনের ব্যস্তসমস্ত পরিবেশ, এমন টার্গেট ধরে কাজ করতে গিয়ে জীবনানন্দ বেশ হিমশিম খেতে লাগলেন। তা ছাড়া তিনি তখন কলকাতায় রিফিউজি, নানা বিশৃঙ্খলা তাঁর জীবনে।

স্বরাজ অফিসে চাকরি করতেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও, যিনি জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা পড়ে লিখেছিলেন তাঁর ভেতর একটা

BanglaBook.org

আত্মঘাতী ক্লান্তি আছে। জীবনানন্দ সাধারণত নিজের লেখার পক্ষ নিয়ে কিছু লেখেন না। কিন্তু এই 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' কথাটার বিরোধিতা করে লিখেছিলেন। নীরেন্দ্রনাথকে সহকর্মী হিসেবে দেখে শুরুতে একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন তিনি। এমনিতে পত্রিকার অচেনা পরিবেশ, তার ওপর সে অফিসে তাঁর এমন এক ঘোর সমালোচক বসে আছেন জেনে একটু সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন জীবনানন্দ। নীরেন্দ্রনাথ একদিন অবশ্য নিজে থেকে এসেই আলাপ জমালেন, বললেন, 'জীবনানন্দ বাবু, আমি কিন্তু এখনো মনে করি আত্মঘাতী ক্লান্তিই আপনার বৈশিষ্ট্য কিন্তু এও বিশ্বাস করি যে ওই আত্মঘাতী ক্লান্তি নিয়েই আপনি মহৎ। জেনে রাখবেন আমি কিন্তু আপনার কবিতার বিরাট একজন ভক্ত।'

জীবনানন্দ কোনো মন্তব্য করলেন না, সাবধানে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। নীরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বোধ হয় আপনার। তাহলে শুনুন।' এই বলে তিনি তাঁর 'মৃত্যুর আগে' নামের লম্বা কবিতাটা আবৃত্তি করতে লাগলেন :

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল...

একপর্যায়ে জীবনানন্দ বললেন, 'থামুন থামুন।' এরপর তিনি কাঁধ কাঁপিয়ে তাঁর সেই বিশেষ হাসিটা হাসতে লাগলেন। জীবনানন্দের টেবিলের ড্রয়ারে *ধূসর পাণ্ডুলিপি*র একটা কপি ছিল, তিনি সেটা বের করে তাতে সই করে বইটা তখনই উপহার দিলেন নীরেন্দ্রনাথকে। সেদিন থেকে নীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা সখ্য গড়ে উঠল তাঁর। অফিস পাঁচটা পর্যন্ত হলেও জীবনানন্দ চারটার দিকে নীরেন্দ্রের ডেস্কে গিয়ে বলতেন, 'চলুন বেরিয়ে পড়ি।' পত্রিকা অফিস থেকে বের হয়ে জীবনানন্দ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচতেন। নীরেন্দ্রনাথকে নিয়ে রওনা দিতেন *পূর্বাশা* অফিসের দিকে। এই নির্বান্ধব শহরে সেখানে রয়েছে জীবনানন্দের বান্ধব সঞ্জয়। যেতে যেতে নীরেন্দ্রের সঙ্গে বরিশালের গল্প করতেন তিনি।

BanglaBook.org

দুই

নীরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও সঙ্গে অফিসে জীবনানন্দ বিশেষ কথা বলতেন না। পত্রিকা অফিসের ওই হইচইয়ের ভেতরও জীবনানন্দ গুটিয়ে থাকতেন নিজের ভেতর। কিন্তু এটা টের পেতেন যে পত্রিকা অফিস তাঁর কলেজ নয় যে স্রেফ নিজের ক্লাস নিয়ে চুপচাপ বাড়ি হাঁটা দিলে চলবে। এখানে সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা না বললে, আড্ডা না দিলে চলে না। এই যে অচেনা লোকজনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুলতে না পারার অক্ষমতা, সেটা নতুন করে পীড়া দিতে লাগল

জীবনানন্দকে। তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করতে শুরু করেন যে তাঁর মা-বাবা দুজনেই দারুণ কথক, তাহলে তিনি কোথা থেকে এই মুখচোরা স্বভাব পেলেন? *স্বরাজ*-এ যখন কাজ করছেন, সেই ১৯৪৭-এর ডায়েরির এক পাতায় লিখেছেন,

'My mother is a great কথক & my father never faltered when talking or lecturing...where from then have I inherited diffidence, faltering, taciturnity?....

My memory is short I can't talk logically & systamitcally for long, nor is it easy find the revent words, phrases & expressions of prose talking (or writing) quickly & all about many important matters of life. Though I read newspapers, journals & books not a little yet I find that even in armchair political, social matters other can talk & debate more clearly impressively & convincingly than me. '

জীবনানন্দ ভাবছেন, মা ছিল দারুণ কথক, বক্তৃতা দিতে গেলে বাবা একবারের জন্যও আটকাত না অথচ আমার এই লজ্জা, দ্বিধা, সংশয় কোথা থেকে এল?...তিনি ভাবছেন তাঁর স্মৃতিশক্তি খুব কম। তিনি খুব গুছিয়ে, যৌক্তিকভাবে কথা বলতে পারেন না। এমনকি লেখাতেই বা জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সঠিক শব্দ, বাক্য সহজে খুঁজে পান না। ভাবছেন তিনি তো পত্রপত্রিকা, বই কম পড়েন না, তবু দেখেন যে সমাজ, রাজনীতি নিয়ে অন্যরা তাঁর চেয়ে অনেক ভালো তর্কবিতর্ক করতে পারে। ডায়েরিতে এরপর তিনি লিখেছেন,

'Mere reading & information & even memory don't make one a good talker—Memory & silent arguing out & training the mind in this way & actual practice of talking sedulously cultivated help a good deal no doubt—but at the same time one must have the heart to be interested in, delighted in or at least discover & appreciate the necessitiy of having to find in such matters—I have not the heart—My heart is for lonliness, money, women, writing poetry alone.

তিনি বুঝতে পারছেন, শুধু পড়াশোনা, তথ্য, এমনকি স্মৃতিশক্তি থাকলেই একজন ভালো কথক হতে পারে না। পড়াশোনা, এসব নিয়ে প্রশিক্ষণ হয়তো সাহায্য করতে পারে কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এভাবে তর্কবিতর্ক করার আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্দীপনা থাকা, সেটা তাঁর নেই, ওই তর্কবিতর্কে তাঁর মন নেই, তাঁর মন তো পড়ে আছে একাকিত্ব, খুঁজছে টাকা, নারী আর চাইছে নির্জনে কবিতা লিখতে... ওই সময় এর কোনোটাই নেই তাঁর হাতে।

জীবনানন্দের 'মজলিস' গল্পটার এক চরিত্রের মুখে আড্ডা নিয়ে এই ভাবনার কথাই জানিয়েছেন। গল্পের সেই চরিত্র একটা বেশ রমরমা পার্টিতে এক কোনায়

BanglaBook.org

সোফায় বসে আছে। অংশগ্রহণ করতে পারছে না এই হইচইয়ে। বসে সে ভাবছে, 'মজলিসকে নিজের প্রাণের জিনিস করে নেবার মতো চরিত্রের সুন্দর সচ্ছলতা আমার নেই...গাইতে পারি না, বাজাতে পারি না, ইয়ার্কিতে এক হাত নেবার মতো প্রবৃত্তি মনের ভেতর খুঁজে পাই না, যে সমস্ত শস্তা সাধারণ কথাবার্তা ও হাসি তামাশা মজলিসের উপকরণ সেগুলোকে বেশ একটু উঁচুগ্রামে চড়িয়ে নিতে ইচ্ছা করে। মানুষের উপলব্ধি ও কল্পনার যে সমস্ত নিবিড় পরিচয় ভালো ভালো কাব্যে, বড় বড় উপন্যাসে পাই এইখানেও এক একবার সেই সবের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠি, অবসন্ন হয়ে পড়ি। যে কোন মুহূর্তেই উঠে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে...'

জীবনানন্দের মনের গড়নটাও এমন। তার মন যে উঁচুগ্রামে বাঁধা তার থেকে নিচে নামতে হলেই অস্বস্তিতে পড়ে যান তিনি। কিন্তু একজন অতি সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে সারাক্ষণ নিজের ওপর নজর রাখছেন তিনি, নিজেকে ব্যাখ্যা করছেন। 'সেলফ রিফ্লেক্সিভিটি' একজন অগ্রসর ভাবনার মানুষেরই তো বৈশিষ্ট্য। তবে এ-ও ঠিক, এই অতি আত্মসচেতনতা তাঁকে বরাবর বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে অন্যদের কাছ থেকে।

BanglaBook.org

তিন

পরিপার্শ্ব থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে *স্বরাজ*-এ চাকরিটা করছেন তিনি তখন। নিজের দেশ পুরোপুরি ছেড়ে আসা, নতুন চাকরি সব মিলিয়ে তাঁর একটা বেতাল অবস্থা তখন। পত্রিকা অফিসের এই শশব্যস্ত পরিবেশের বিড়ম্বনা তো আছেই, এর ওপর আছে লেখা জোগাড় করার চাপ। এক সহকর্মী একদিন বললেন, 'এভাবে গজেন্দ্রগমনে চললে তো চলবে না জীবনানন্দ বাবু, এ তো আপনার কবিতা লেখার টেবিল নয়।'

কলকাতার লেখক-জগতের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ক্ষীণ। লেখা জোগাড় করা এক কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াতে লাগল। এই কাজে টিকে থাকতে পারবেন কি না সন্দেহ জাগল তাঁর। তিনি পালাবার পথ খুঁজতে লাগলেন। এ সময় তাঁর মনে পড়ল পুরোনো বন্ধু অচিন্ত্যকে। অচিন্ত্য তখন মুর্শিদাবাদের মুনসেফ। তাঁকে এক চিঠিতে লিখলেন, '...আমার দোষ আমি সহজে কাউকে ধরা দিতে পারি না, কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্বের সুপরিসর সরসতা ছিল আলাদা জিনিস। এই সজীবতা ও স্নেহ আজকের পৃথিবীর সব দিকেই সব বিভাগেই বিরল। সাহিত্যে হয়তো সাহিত্য আছে কিন্তু যে মানুষ তা সৃষ্টি করে সে সত্যিই প্রায় মানুষ নয়... 'স্বরাজে' কাজ মন্দ ছিলো না। কিন্তু কোন কোন কারণে ভালো লাগছে না। অন্য কিছু পেলেই কিম্বা আগেই চলে যেতে হবে।...

চার

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স জীবনানন্দের তখন। এই বয়সে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে, অন্য একটা দেশে উদ্বাস্তু হয়ে গিয়ে, নতুন ধরনের এক চাকরি নিয়ে, নতুন করে জীবন শুরু করা একটা দুর্বিষহ ব্যাপার। বরিশালের কলেজের চাকরিজীবনে শেষের দিকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তিনি, এখানে এই *স্বরাজ*-এর চাকরিতেও মানাতে পারছেন না নিজেকে। বেকারত্বের পুরোনো দুর্বিষহ স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে। আবার কি সেই গহ্বরে পড়বেন? এই বয়সে? এদিকে লাবণ্য, মেয়ে মঞ্জু, ছেলে সমরকে নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডের ছোট বাড়িটায় উঠে নতুন করে ওদের স্কুল, কলেজে ভর্তি করা, নতুন করে একটা সংসার শুরু করার ব্যাপক ঝক্কি, আছেন অসুস্থ মা। একটা শিক্ষিত উদ্বাস্তু পরিবারের মর্মান্তিক প্রাথমিক দিনগুলো কেমন হতে পারে ঋত্বিক ঘটক তাঁর *মেঘে ঢাকা তারা* চলচ্চিত্রে আমাদের দেখিয়েছেন।

অসহায় আগেও অনেকবার জীবনানন্দ হয়েছেন, একভাবে বললে বরাবরই অসহায় তিনি কিন্তু এবার তাঁর অসহায়ত্বকে মনে হতে লাগল অতলান্তিক। চেপে ধরা গভীর, গাঢ়, সীমাহীন হতাশার কথা ১৯৪৭-এর ডায়েরিতে লিখেছেন, 'One nights before sleeping, the all round frustrations of life.

1) Barisal home and BM college which can never be thought of...the hell days of college & students 2) Swaraj job: an equal hell in another colour.

3) Lansdowne RD: a terrible suffocating prison 4) Family: it brought here the suffocating prison & other all–round frustrations would be intencified on them too without relieving me in any way 5) Mother: who is dying 6) Brother: who seems now to be suffering enough & enough & now again a sort of fool's paradise with wife seems to be in the offing (D&R) 7) Manju: who is dead to duty & khuki's peculiar favours 8) Frustration in Lit. Love, Herdias daughters, বনলতা সেন, Imaginary women, bus women & life impel me to evoke God...'

কোনো এক নির্ঘুম রাতে জীবনের সব হতাশা নিয়ে ভাবছেন তিনি। ভাবছেন, বরিশালের বাড়ি ছিল নরক, স্বরাজ-এর চাকরিটাও একটি নরক, কলকাতার ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িটা একটা কারাগার, পরিবারের অন্য সদস্যরা মাথাব্যথার কারণ, মা মরতে বসেছে, ভাইটিও কষ্ট করছে অনেক, সে স্ত্রীকে নিয়ে একধরনের বোকার স্বর্গে আছে, মেয়েটা ঘরের কাজ করতে করতে মরতে বসেছে প্রায়, গভীর হতাশা সাহিত্য নিয়ে, প্রেম নিয়ে, মনে চলছে নানা কাল্পনিক নারীর আনাগোনা।

BanglaBook.org

ইতিমধ্যে *স্বরাজ* পত্রিকা অর্থসংকটে পড়ে গেল। পত্রিকা প্রকাশের জন্য ব্যাংক লোন নিয়েছিলেন হুমায়ুন, সে দেনা শোধ করায় জটিলতা দেখা দিল। কর্মীদের বেতন ঠিকমতো দিতে পারছিলেন না। জীবনানন্দ এমনিতেই চাকরিটা নিয়ে হাতাশায় ছিলেন, এ সময় *স্বরাজ* পত্রিকার চাকরিটা ছেড়ে দিলেন তিনি।

পাঁচ

এবার সত্যি গভীর গভীরতর খাদে পড়ে গেলেন জীবনানন্দ। আবার কোনো চাকরি নেই, আবার হাতে কোনো টাকাপয়সা নেই। একটা মানুষের কী করে এ অবস্থা হয় বারবার? কোনো এক ভয়ানক দুষ্ট নক্ষত্র তাঁকে যেন ধাওয়া করছে অবিরাম। একেবারে হতভম্ব, ভ্যাবাচেকা খাওয়া অবস্থা তাঁর। নিজেও যেন হিসাব মেলাতে পারছেন না কী করে এসে পড়লেন এই পাতালে। তবু নিজের অবস্থাকে বরাবরের মতোই অক্ষরবন্দী করে চলেছেন তিনি। এ সময়ের এক কবিতায় লিখেছেন :

সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিলো স্বাভাবিকভাবে পথ দিয়ে
কি করে তা হলে তারা এরকম ফিচেল পাতালে
হৃদয়ের জনপরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে?

কলকাতায় গিয়ে নতুন স্বাধীন ভারতে দেখছেন কর্মিষ্ঠকর্মারা কেমন দ্রুত এই অবস্থার সব সুবিধা লুটেপুটে নিচ্ছে। তাঁর এ সময় লেখা *জলপাইহাটি* উপন্যাসে লিখেছেন, 'চার দিকে কুড়ি-বাইশ বছরের ছোকরারা জিপে ছুট যাচ্ছে, ব্যাঙ্ক লুটছে, কালবাজার চিবিয়ে খাচ্ছে, বড়-বড় ব্যবসাদারি জোগাড় করছে নতুন ইউনিয়নে, জায়গা জমি কিনছে যাদবপুর বেহালায়, টালিগঞ্জ রিজেন্টপার্কে, বালিগঞ্জে দিব্যি ভিলা তুলে ফেলছে সব, মেয়েমানুষ নিয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে ফিরছে।'

লিখেছেন, '...চারদিককার ট্রাম, বাস, মোটর, ট্রাকের দুর্নিবার পৃথিবীতে অর্থসঞ্চয়ের কলাকৌশলটা দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলা দরকার তার, খুব তাড়াতাড়ি; তা হলেই সেও দ্রুত, একান্ত হয়ে যাবে এই অপ্রকৃতিস্থ মহানগরীর এই অনর্গল অপরিস্রুত উল্লাসকে আশ্চর্য পরিশ্রুত তাণ্ডবে পরিণত করবার দুর্দান্ত সময়যন্ত্রের সঙ্গে। কিন্তু আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ বছরেও ঢেঁকুর তুলে হাঁটতে-হাঁটতে যদি তাকে নিজের কায়দা-কানুন ঠিক করে নেবার কথা ভাবতে হয়, তা হলেই হয়েছে...'

কিন্তু জীবনানন্দ কিছুতেই টাকা কামানোর কৌশলটা শিখে উঠতে পারছেন না, ওই আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ বছরেও ঢেঁকুর তুলে হাঁটতে হাঁটতে তাঁকে নিজের কায়দাকানুন ঠিক করে নেবার কথা ভাবত হচ্ছে।

BanglaBook.org

বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেলেও পৃথিবী থেকে অন্ধকার যে ঘোচেনি, মানচিত্র ভেঙে ভেঙে পৃথিবী যে হয়ে উঠছে আরও বিপজ্জনক, সে কথাই সে সময়ের কবিতায় লিখলেন জীবনানন্দ

মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে :—
তবুও রয়েছে মহাসমরের তিমির
আমাদের আকাশ আলো সমাজ আত্মা আচ্ছন্ন করে।
প্রতিনিয়তই অনুভব করে নিতে হয় আলো; অন্ধকার
আকাশ শূন্যতা, সমাজ : অঙ্গার,
জীবন মৃত্যু, প্রেম : রক্তঝর্ণা;—জ্ঞান
এইসবের অপরিমেয় শববাহন শুধু, নিজেকেও বহন করছে।

তিনি উপলব্ধি করলেন, এতকাল তিনি আঁধার দেখেছেন, এবার যেন সম্মুখীন হয়েছেন আরও বড় অন্ধকারের

আঁধার দেখেছি, তবু আছে অন্য বড় অন্ধকার;
মৃত্যু জেনেছি, তবু অন্য সম্মুখীন মৃত্যু আছে;
পেছনে আগাগোড়া ইতিহাস রয়ে গেছে, তবু
সেই মহাইতিহাস এখনো আসেনি—তার কাছে
কাহিনীর অন্য অর্থ, সমুদ্রের অন্য সুর, অন্য আলোড়ন
হৃদয় ও বিষয়ের,—মন এক অন্য দীপ্ত মন।

BanglaBook.org

এ সময়ের আরেক কবিতায় তিনি লিখলেন, 'চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভীড়।' তাহলে কি আবার এই বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়ের ভেতর কুকুর-বেড়ালের মতো পথে পথে ঘুরে আবার তাঁকে একটা চাকরি খুঁজতে হবে? নিজের দাম্পত্যকে অনেকটা সামাল দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, আবার কি শুরু হবে লাবণ্যর সেই ভূতে পাওয়া অবস্থা, তাঁকে কি সে আবার ধুলায় মিশিয়ে দিতে চাইবে?

সোনালি মেঘের ভেতর অদৃশ্য হতে হতে

এক

ঠিক এই সময়টায়, সেই বড় অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার সেই দিনগুলোতে একটা সম্পূর্ণ নতুন কথা জীবনানন্দ লিখলেন তাঁর ডায়েরিতে। এই সময়ের

ডায়েরিতে দেখা গেল, তিনি স্পষ্ট করে আত্মহত্যার চিন্তা করছেন। অন্ধকারে কোনো দিন আর ঘুম থেকে না জাগার কথা লিখেছেন আগে কিন্তু এবার লিখলেন আত্মহননের কথা। ১৯৪৭-এ দেশভাগের সেই প্রাথমিক দিনে, কলকাতার উদ্বাস্তু জীবনে, *স্বরাজ*-এর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পূর্বাপর সময়ে তিনি ডায়েরিতে লিখলেন কী কী কারণে আত্মহত্যা করতে চান, এমনকি কোন পদ্ধতিতে আত্মহত্যা করবেন, সে কথাও, 'Almost every night I thought of ending life's tangle by suicide...Reasons:1) Insecurity of Swaraj 2) Cal. House life extremely dreary & bitter 3) No security or Honour anywhere in the world 4) No woman—No Love—And I am quickly aging 5) Daughters of Herodias 6) Immense sense of frustration.'

প্রতি রাতে আত্মহত্যার কথা ভাবছেন তিনি। আত্মহত্যার অনেকগুলো কারণ তখন তাঁর হাতে: *স্বরাজ*-এ অনিশ্চয়তা, কলকাতার বাড়ির তীব্র তিক্ততা, পৃথিবীর কোথাও কোনো সম্মান না থাকা, জীবনে কোনো নারী বা প্রেম না থাকা অথচ বয়স বেড়ে যাচ্ছে তাঁর, ভাবছেন হেরোডিয়াসের কথা, হেরোডিয়াস এক মিথের চরিত্র, যে একাধারে প্রেমিক এবং নৃশংস। আরও লিখেছেন, '...before death making good provision for my family & mess which however seem to be impossible in the final analysis—so I determine to commit suicide by drowining myself & the other 3 in the ocean... how I would pull them all mightily towards the great waves, how each of them in his or her individual way would protest vehemently & how my physical force & the great sense of frustration would trumph over everything else—Ranju, Manju, Labanya. ...Other forms of suicide such as Euthanasia etc are welcome but violent forms are unwelcome—Again one should not die alone—The ramnants of family will be immensely disgraced & anguished in that case—

I remember of a school teacher who killed all his family members with an axe & then killed himself—But this is very crude solution—the best is ocean death in a sunny day (evening better than morning)'

তিনি সাগরে ডুবে আত্মহত্যা করবেন ঠিক করেছেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে পরিবারের জন্য কোনো ব্যবস্থা করে যেতে পারবেন না বলে তাঁর দুই ছেলেমেয়ে আর লাবণ্যকে সহই সমুদ্রে ঝাঁপ দেবেন ভেবে রেখেছেন। তিনি এক এক করে ওদের সমুদ্রের বড় ঢেউয়ে ছুড়ে ফেলে দেবেন। ওরা প্রত্যেকে নিজেদের মতো প্রতিবাদ করবে কিন্তু তাঁর শক্তির কাছে ওরা পরাজিত হবে এবং তিনি ওদের সবাইকে নিয়ে সাগরে ডুবে মরবেন। ভয়ংকর মরবিড ভাবনা তখন পেয়ে বসেছে

BanglaBook.org

জীবনানন্দকে। ভেবেছেন উথেনেশিয়া বা স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা। লিখেছেন কোনো এক স্কুলশিক্ষকের কথা যে তার পরিবারের সবাইকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে নিজে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু এ ধরনের বীভৎস পদ্ধতিতে আত্মহত্যা তিনি অনুমোদন করছেন না। তবে একাও মরতে চান না তিনি, মরতে চান সবাইকে নিয়েই এবং সমুদ্রে ডুবে মরাই ভালো বলে ভাবছেন। এমনকি কখন সমুদ্রে ঝাঁপ দেবেন, সেটাও ভেবে রেখেছেন। ঠিক করেছেন কোনো এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনেই ডুবে মরবেন এবং সময় হিসেবে সকালের চেয়ে বিকেলটাই ভালো। এসব বিচিত্র ভাবনা তখন দখল করে রেখেছে তাঁকে।

তবে এই সিদ্ধান্ত তিনি আবার পরক্ষণেই স্থগিত রাখার কথা ভাবছেন। স্থগিত করবেন শুধু একটা কারণে, লেখা। মৃত্যুর আগে আরও কিছু বই লিখতে হবে তাঁকে। তাই লিখেছেন, '...I can't do it before publishing some other books & dealing soundly with all my mess.'

দুই

আত্মহত্যার অনুষঙ্গ তাঁর কবিতা, গল্পে আছে। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার মূল বিষয়ই তো আত্মহত্যা। যদিও সেই আত্মহত্যা নিয়ে একটা স্ববিরোধী অবস্থানে ছিলেন তিনি তখন। তাঁর *কারুবাসনা* উপন্যাসে অবশ্য সরাসরি আত্মহত্যার ইচ্ছার কথা আছে। সেখানে *কারুবাসনা*র মূল চরিত্রের সঙ্গে তাঁর মায়ের এক অদ্ভুত কথোপকথন হচ্ছে, উপন্যাসের চরিত্র বলছে, 'মাঝে মাঝে মনে হয় দুএকজন মাড়োয়ারির পকেট কেটে নিলে পারি।

মা এমন কথাও মনে হয় তোমার?

হ্যাঁ, অত্যন্ত অবসাদ বিষাদের সময় কিছুক্ষণের জন্য মনে হয় বৈকি। কোনো বড় লোকের বাড়ি ব্যাংক, মাড়োয়ারির টাকার ওপর লোভ জন্মায়। তাদের তো অনেক আছে এত বেশী দরকার কি? হৃদয় মনের স্থূলতা পাশবিকতায় অর্থ জমিয়ে অর্থ খরচ করেই বা কী লাভ তাদের? আমাকে কিছু দিক—মানুষের ক্ষমা দাক্ষিণ্য বিধাতার হৃদয়হীনতা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাক—দেশে ফিরে যাই দু মুঠো খেয়ে বাঁচি, কবিতা লিখি... কিন্তু এ-ভাব শিগগিরই কেটে যায় আমার। দারিদ্র্যের সংগ্রামের ভিতর অজস্র নিপীড়িত আত্মা ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখি। চেয়ে দেখি কুষ্ঠ রোগী জীর্ণশীর্ণ কাঠের ঠেলাগাড়িতে বসে আছে তার ভিজে ফুটপাথের উপর এক পাশে কাদা-জলের মধ্যে আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে একটি নারী পড়ে রয়েছে—দেবদারু গাছের ছায়ায় নয়, মেঘের সোনায় নয়, কিন্তু এই পথে-ঘাটে রাস্তায় পৃথিবীর আদি অসীম স্থিররূপ আবিষ্কার করি আমি। নিজের জীবনের বেদনাকে মুকুটের মত মনে হয়। বাদলের বাতাসে, আবছায়ায়, জনমানব, ট্রাম-

BanglaBook.org

বাস, গাছের পাতাপল্লব, পাখপাখালির কলরবে এক-একটা সন্ধ্যা বড় চমৎকার কেটে যায় আমার।...কিন্তু তবুও আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।

কার? তোমার? কেন?

চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ, সে রকম মৃত্যু নয়, আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যার সোনালী মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করে; মনে হয় আর যেন পৃথিবীতে ফিরে না আসি।'

একবার পরিকল্পনা করেছেন সাগরে অদৃশ্য হয়ে যাবেন, এবার ভাবলেন অদৃশ্য হবেন মেঘের ভেতরে। কিন্তু শুধু কিছু নতুন লেখা লিখবেন বলে বাতিল করলেন সে পরিকল্পনা। মৃত্যু এবং লেখার ভেতর লেখাকে বেছে নিলেন তিনি।

চাই টলস্টয় আর গ্যেটের প্রশান্তি

এক

ঝেঁপে আসুক অন্ধকার, না থাক চাকরি, না খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হোক, তবু মরে যাবার আগে আরও কিছু লেখা তাঁকে লিখতে হবে, এমনই ভাবলেন জীবনানন্দ। ডুবতে বসা মানুষের কাছে ভেসে যাওয়া টুকরো কাঠ যেমন, লেখা তাঁর কাছে তাই। এ সময় তিনি খুব গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে লাগলেন কবিতার বদলে কথাসাহিত্য রচনার কথা। সেই ১৯৩০-এ বিয়ের পরপর যখন চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে গিয়েছিলেন, তখন একে একে অনেকগুলো গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। মাঝখানে দীর্ঘদিন আর গল্প-উপন্যাস লেখেননি। ১৯৪৮-এ এসে তাঁর সেই নতুন পর্বের বেকারত্বের দিনে তাঁর মনে হলো আরও কিছু গল্প-উপন্যাস তাঁর লেখা বাকি রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে বিশেষ করে কয়েকটা উপন্যাস তাঁকে লিখে যেতে হবে। সেসব উপন্যাস লেখার জন্য নানা রকম প্রস্তুতির কথাও উল্লেখ আছে তাঁর সে সময়ের ডায়েরিতে। ডায়েরিতে লিখেছেন উপন্যাস লেখার রসদ জোগাড় করতে কলকাতার অলিগলি আনাচকানাচে আরও ভালোভাবে ঘুরে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। কিন্তু হাতে পয়সা নেই, পয়সার জন্য একটা নিয়মিত চাকরি করার কথা তাঁকে ভাবতেই হয়, ওদিকে স্বাস্থ্যও ভালো নেই, যৌবনের সেই শক্তি নেই, এসব ভেবে হতাশ লাগছে তাঁর, 'There are many other places, conmers, streets, lanes, blinds, houses, factories, footpaths

BanglaBook.org

and insides in Cal one oauth to go & spend attentive houres for experiences in novels etc. I lack of money for which I have to do routine job & I lack of health & youth frustrate me—'

তিনি তাঁর বয়স নিয়েও খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তখন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তখন তাঁর, ভাবছেন ৭০ বছর হতে আর মাত্র বছর বিশ বাকি। এর ভেতর বেশ কিছু উপন্যাস তাঁকে লিখে ফেলতে হবে। অন্তত ষাট বছর হওয়ার আগে এসব লেখা দরকার। তিনি মা-বাবাকে চোখের সামনে অথর্ব হয়ে যেতে দেখেছেন। ভাবছেন ওই পর্যায়ে যাবার আগে এমন সব লেখা শেষ করে ফেলা দরকার, যা তাঁকে টলস্টয় বা গ্যেটের প্রশান্তি দিতে পারে, 'Very often I have to remember my age: 47/48 or 49? (D&R) and 20/21 years to 70. And I have to write some novels & many other things before that or preferably before the deadline of 60-D&R. I find mother as I saw father blind, groping, shaking with palsy, incapaciateted, unable to do anything & before reaching that stage one will have to finish 'everything' that may give one Tolstoy's or Goethe's satisfaction.'

তাঁর আকাঙ্ক্ষার উচ্চতাটা লক্ষ করবার মতো। তিনি বাংলা ভাষার এক অল্পপরিচিত লেখক কিন্তু নিজেকে স্থাপন করতে চাচ্ছেন বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দিকপাল টলস্টয় বা গ্যেটের পর্যায়ে। অবশ্য ডায়েরির পরের অংশেই দেখা যাচ্ছে, এ নিয়ে নিজের ভেতরই সন্দেহ জাগছে তাঁর। ভাবছেন এসব হয়তো দুরাশা, এ স্বপ্ন হয়তো তাঁর জন্য নয়। ভাবছেন তাঁর এই সীমিত অভিজ্ঞতা, এই বেকারত্ব, দারিদ্র্য এসব বিবেচনা করে টলস্টয়ের মতো উপন্যাস লেখা কিংবা গ্যেটের মতো বহুমুখী সাহিত্য করার চিন্তা হয়তো বাদ দেওয়াই উচিত, But that grand achievement is not for me. Would it be better for me (in view of my lack of 'expereince' & lack of opportunity for gathering it profusely & deeply & also my lack of jobless economic independence etc) to give up the idea of writing epic novels like Tolstoy etc. or of trying to be overwhelmingly many sided like Gothe etc.'

ভাবছেন তার চেয়ে বরং হয়তো কবিতা আর কবিতার সমালোচনাতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখা উচিত। এমনকি কিছু টাকাপয়সা রোজগারের চিন্তায় এবং খানিকটা নিজের গদ্য লেখার ক্ষমতা অন্যদের দেখাবার তাগিদে যে প্রবন্ধ, ছোটগল্প লিখতে শুরু করেছিলেন, সেটিও বাদ দেওয়া উচিত। গ্যেটে, টলস্টয়, শেক্সপিয়ার যদিও বহুমাত্রিক প্রতিভা, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিটস তো শুধু কবিতাই লিখেছেন, এসব ভাবনার দোলাচল তখন তাঁর মনে, ...Concentrate on Poetry & criticism only (even to the exclusion of writing personal essays, short stories & other Prose attempts meant for 'money' & also

BanglaBook.org

for demonstrating that I am capable of good prose, a fact that people seem increasily to disbelieve?

Worthworth, Keats, Milton, Shelly, Dante etc were for Peotry only—

But Goethe, Tolstoy & Shakespear allure–'

কী লিখবেন, উপন্যাস না কবিতা? এ নিয়ে দ্বিধায় আছেন তিনি। উপন্যাস লেখার কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছেন আবার তাঁর মনে হচ্ছে উপন্যাস লিখতে গিয়ে শুধু শুধু সাহিত্য-জীবনটাকে বরবাদ করবেন কি না, 'I don't know what would be the proper literary line for me and attempt to write novels may mean heartless wastage & uncharted sabotage of my literary life.'

তাঁর ব্যক্তিজীবনের সীমাহীন দুর্ভোগে তাঁর উদ্বিগ্নতা যতটুকু তার চেয়ে শতগুণ বেশি উদ্বিগ্নতা তাঁর লেখা নিয়ে। যেন প্রতিটা মুহূর্ত তাঁর জীবন থেকে নিলাম হয়ে যাচ্ছে, যেন তিনি মাথা দিয়ে আছেন কোনো গিলোটিনে, ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হবার আগে তাঁকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে লেখাবিষয়ক এই সব আকাশ-পাতাল প্রশ্নের।

BanglaBook.org

দুই

উপন্যাস লেখায় সময় দেবেন কি দেবেন না এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সুরাহা করতে না পেরে এ সময় তিনি দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রভাকর নামের। প্রভাকর সেই তরুণ মেধাবী পাঠক, যিনি তাঁর কবিতা ব্যাখ্যা করে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। জীবনানন্দ তাঁর অগ্রজ, সমসাময়িক কারও সঙ্গে তাঁর সাহিত্য বিষয়ে আলাপে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি। খুঁজে নিয়েছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, সাহিত্যে খ্যাতিহীন এক পাঠককে। প্রভাকরের সাহিত্যবোধের ব্যাপারে আস্থা ছিল তাঁর। জীবনানন্দ কলকাতার বিখ্যাত কফি হাউসে বসে প্রভাকরের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁর উপন্যাস নিয়ে, 'With Pravakar I go to Coffee House. Talks about novels & novel writing. About my novels of 22/25 years ago–will they hit now?–Those novels a problem: what to do with them? Revise them? Have them fair copied (by relevant persons available in Cal. As stated by Dharamdas Mukhaerjee? How to fair copy? I have no Mrs. Tolstoy etc...Time might be better spent in writing new novles.'

বিশ-পঁচিশ বছর আগে যে উপন্যাসগুলো লিখে তিনি ট্রাঙ্কে রেখে দিয়েছেন, সেগুলো কী করবেন তা নিয়ে আলাপ করেছেন প্রভাকরের সঙ্গে। উপন্যাসগুলোর ফেয়ার কপি করার কথা ভাবছেন। কিন্তু কে তাঁর লেখার ফেয়ার কপি করবে।

তাঁর তো আর মিসেস টলস্টয় নেই। আমরা জানি, টলস্টয়ের স্ত্রী *ওয়ার অ্যান্ড পিস*-এর মতো ঢাউস উপন্যাস কপি করে দিয়েছিলেন। লাবণ্য তাঁর উপন্যাস কপি করে দেবে, এ তো তাঁর কল্পনারও অতীত। নিজের লেখা নিজেকেই কপি করতে হবে কিন্তু তার চেয়ে বরং নতুন একটা উপন্যাস লেখাই ভালো—এসব ভাবছেন তিনি।

Tolstoy's *War and Peace* the greatest novel–Mann's Joseph. A Spanish writers, 'Three of life' Dostoyevsky's novel we all highly praised–He 2 weeks (day and night) for finishing Tolstoy's War & Peace.

কফি খেতে খেতে জীবনানন্দ আর প্রভাকর টলস্টয়, দস্তয়ভস্কি, টমাস মান নিয়ে কথা বলেছেন। প্রভাকর রাত-দিন পড়ে দুই সপ্তাহে টলস্টয়ের *ওয়ার অ্যান্ড পিস* শেষ করেছেন জানিয়েছেন। প্রভাকর সম্ভবত জীবনানন্দকে উপন্যাস লেখার ব্যাপারে উৎসাহিতই করেছেন। দেখতে পাচ্ছি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও *স্বরাজ*-এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৪৮-এর সেই বেকারত্বের সময়টাতে তিনি টানা লিখে ফেলেছেন চারটা উপন্যাস। লিখেছেন কিছু গল্পও। বেকার হলে বিপদ তো চারদিকে, তবে এতে একটা বড় লাভ হয় জীবনানন্দের। জগৎ-সংসারে তাঁর তখন কোনো কাজ নেই, তখন জোয়ার আসে তাঁর মনের আসল কাজে, লেখায়। অখণ্ড সময় পেয়ে তিনি ঘোরগ্রস্তের মতো লিখতে থাকেন। সেই কালো ট্রাঙ্ক থেকে উদ্ধার করা উপন্যাসগুলো লেখার তারিখ লক্ষ করলে দেখা যায়, তিনি সেগুলো কোনো কোনোটা মাত্র তিন থেকে চার দিনের ভেতর টানা লিখে শেষ করেছেন। মনে হয় যেন লেখাগুলো তাঁর কলমের ডগায় এসে আটকে ছিল। একটা সুযোগ পেয়ে বন্যার ঢলের মতো নেমে এসেছে কলকল করে। সমাজ, সংসার, জীবন ভেস্তে যাক, লিখে শেষ করতে হবে যা লিখতে চাই, এই তাঁর পণ যেন তখন।

BanglaBook.org

কোনো দিন ফুরোবে না শীত রাত

এক

সে সময় যে উপন্যাসগুলো জীবনানন্দ লিখেছেন, তার ভেতর সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী *মাল্যবান*। *মাল্যবান* উপন্যাসে প্লট বলতে তেমন কিছু নেই, বিশেষ কিছু ঘটেও না এতে। এর আগে লেখা তাঁর *সফলতা নিষ্ফলতা* উপন্যাসে, উপন্যাস নিয়ে জীবনানন্দের ভাবনা এক চরিত্রের মুখে বলিয়েছিলেন, 'প্লট নতুন, কিংবা কোন

প্লটই থাকবে না, নতুন নভেলের মানুষদের গতিবিধির চেয়ে ভাবনাচিন্তার ওপরই জোর দেয়া বেশি, কাজের চেয়ে কথার উপর। যখন কোন প্লট থাকবে না, কাজও থাকবে কম, গল্পটা তখন একটা কথার সমুদ্র হয়ে দাঁড়াবে না শেষ পর্যন্ত? দাঁড়াক—মন্দ কি?' গল্পের প্লট থাকা না থাকা নিয়ে একবার ডায়েরিতে লিখেছেন, 'জীবনটাই তো প্লটবিহীন, কেবল ষড়যন্ত্রকারীরাই প্লট করে।'

মাল্যবান উপন্যাসে প্রচলিত অর্থে প্লট নেই। আছে এক রহস্যময় দাম্পত্যের বয়ান। মাল্যবান নামের এক যুবক, যে বেড়ে উঠেছে শহর থেকে দূরে, প্রকৃতি, গাছপালা, ছায়া অন্ধকার, নক্ষত্ররাশির ভেতর। সে উৎপলা নামের এক নারীকে বিয়ে করে, চাকরি নিয়ে এসেছে বড় শহরে। সেখানে তাদের দাম্পত্য কেটে গেছে বারোটা বছর। তাদের মনু নামে এক কন্যাসন্তান আছে। কিন্তু মাল্যবানের দাম্পত্য জীবন এক বিবমিষা জাগানো ব্যর্থতায় ভরা। যদিও মাল্যবানের চাকরিতেই সংসার নির্বাহ হয় কিন্তু সংসারে সার্বিক কর্তৃত্ব উৎপলার। তাদের দুই রুমের একটি বাড়ি, একটি নিচতলায়, আরেকটি ওপরতলায়। ওপরতলার খোলামেলা বড় রুমটায় থাকে উৎপলা, নিচের অন্ধকার ঘুপচি ঘরে মাল্যবান। ওপরের ঘরে মাঝে মাঝে নানা রকম পুরুষ আসা-যাওয়া করে, সেখানে গান-বাজনা-আড্ডা হয়, মাল্যবান একা থাকে নিচে। উৎপলা আর মাল্যবানের ভেতর শারীরিক সম্পর্কও হয় না। মাল্যবান মাঝেমধ্যে শারীরিক সম্পর্কের চেষ্টা করলে উৎপলা একরকম তাড়িয়ে দেয় তাকে। একসময় উৎপলার মেজদা তার পরিবার নিয়ে বেড়াতে এলে উৎপলা মাল্যবানকে বলে মেসে গিয়ে থাকতে। নিজের রুম ছেড়ে দিয়ে মাল্যবান গিয়ে ওঠে মেসে। মাল্যবানকে অবিরাম তীক্ষ্ণ, তীব্র আজেবাজে ভাষায় গালমন্দ করে উৎপলা। মাল্যবান সব সহ্য করে। মাল্যবান যেন তার নিজের সংসারে বন্দী এক চরিত্র। খুব আশ্চর্য মাল্যবানের ক্লীবতা আর অদ্ভুত উৎপলার আচরণ। বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের নারী চরিত্র সম্ভবত আর দ্বিতীয়টি নেই। এই দুজনের সম্পর্ক বেশ জটিল এবং রহস্যময়। জীবনানন্দ তাঁর আশ্চর্য ভাষাভঙ্গিতে তৈরি করেছেন এসব চরিত্র। উৎপলার কথা বলতে গিয়ে লিখছেন, 'এই বারটা বছর উৎপলার অনিচ্ছা-অরুচির বইটি—কাঁটা চাঁদা—কাঁটা বেত—কাঁটার ঠাসবুনোন জঙ্গলে নিজের কাজকামনাকে অন্ধ পাখির মত নাকেদমে উড়িয়েছে মাল্যবান। কত যে সজারুর ধাস্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, তোঁদড়ের কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল, আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির।'

উৎপলার সঙ্গে মাল্যবানের দাম্পত্যের কথা লিখতে গিয়ে তিনি লিখছেন, 'মাল্যবানকে কেমন সহজ দিব্যতায় বিদায় দিয়ে, অথচ মাল্যবানকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রুচির বিরুদ্ধে, অপ্রেমে, কামনার টানে, বেশি লালসায় রিরংসায় উৎপলার মতন একজন ভাল বংশের সুন্দর শরীরের নিচু কাণ্ডজ্ঞানের নিরেস

BanglaBook.org

মেয়েমানুষের কাছে ঘুরে-ফিরে আসতে হবে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কী নিদারুণভাবে, কেমন অধমের মত, কেমন হাতে-পায়ে ধরে মেয়েটির কখনো-বা ঘরের শান্তি কখনো বা বাইরের সুনাম রক্ষা করবার জন্যে, কখনো-বা লালসা, অতিক্কচিৎ প্রণয় এসে উৎপলার দিকে মাল্যবানকে হিঁচড়ে টানছে বলে।'

কোনো কোনো দিন মাল্যবান তাঁর নিচের ঘর থেকে মাঝরাতে ওপরের ঘরে গিয়ে উৎপলার বিছানার পাশের একটি চেয়ারে বসে। মশারির ভেতর ঢুকতে চায়, তাকে স্পর্শ করতে চায়। কিন্তু একেবারে খেঁকরে উঠে উৎপলা বলে, 'আ গেল যা। রাত দুপুরে ন্যাবড়া করতে এলো গায়েন...'

রোমান্টিকতার ছিটেফোঁটা সুযোগ দেয় না উৎপলা। অথচ তার ওপরতলার ঘরে অন্য পুরুষ আসে। গান-বাজনা করে। মাল্যবান কিছু বলতে পারে না। শুধু চেয়ে দেখে। বিশেষ করে, অমলেশ নামের এক মানুষ প্রায়ই আসে তার ঘরে। মাল্যবানকে পাত্তাই দেয় না। মাল্যবান অমলেশকে দেখে শুধু আর তাকে নিয়ে ভাবে। তার মনে হয় অমলেশের 'যেন দুটো ঠাঙের বদলে আটটা ঠাঙ, মাকড়সার মতো কেমন ল্যাং ল্যাং ল্যাং ল্যাং করছে সব সময়ই, কখনো গাঢ় সবুজ, কখনো লাল মাকড়সানীদের দেখছে বলে—সমস্ত জীবন ধরে।'

এই নারীর কবল থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার পরিণতি নিয়ে মাল্যবান ভাবছে,

'জীবনের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোককে জড়িয়ে নিয়ে—এ জড়িয়ে নেওয়ার সমস্ত নিহিতার্থের ছোব-পোচড় গায়ে মেখে দধিতে কাদায় মূর্খতায় ওগরানো অম্বলে আগুনে অতৃপ্তিতে মণ্ডিত হয়ে কী হল সে।'

'জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে এই দাম্পত্য জীবনেরও নানা রকম খাঁকতি দেখছে সে। ঝড়তি-পড়তি নষ্ট ফসল, পচা হাড়মাংসের গন্ধে ভরে উঠছে সব।'

কেন উৎপলা এমন করে মাল্যবানের সঙ্গে? কারণ মাল্যবানের ভেতর একধরনের প্যাসিভনেস আছে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, টাকাপয়সার সাফল্যের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই, এটাকেই বুঝি আঘাত করতে চায় উৎপলা।

অমলেশ যখন তার ওপরতলায় যায়, উৎপলা মাল্যবানকে বলে, 'ওকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিতে পারবে তুমি?...তুমি না হয় উপরে এসে কাল একটা বিহিত করে যেও।'

উৎপলা জানে মাল্যবান তা পারবে না।

অমলেশ যখন ওপরে থাকে, মাল্যবান তখন ওপরে যায় না। মাল্যবান ভাবে,

'উৎপলার ঘরে লোক কম—দুটি কি একটি—খুব সম্ভব একটি—তখন সে কিছুতেই ওপরে যায় না : মন দিয়ে করেছে, চোখ দিয়ে সকলের জীবনের সব তলানি আবিষ্কার করতে চায় না।'

BanglaBook.org

মাল্যবানের এই নিষ্ক্রিয়তাকেই আঘাত করতে চায় উৎপলা। বলে, 'এক বেশ্যার সঙ্গেও যদি সমানভাগে তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারতাম, তা হলে এতটা দম আটকে আসতো না।'

কিন্তু মাল্যবানের এসব চাকরি, টাকাপয়সা, সাফল্য ভালো লাগে না।

'টাকা, পারিবারিক সচ্ছলতা এগুলোকে এমন ঘাসের বিচি, ধুন্দলের বিচি, রামকাপাশের আঁটি বলে মনে হয় এক এক সময়।...মাটির নীচে গেঁড় আর কন্দ খাওয়া শুয়োরের মত (আপার গ্রেডের) অফিসগিরিই তার সব নয়...'

কিন্তু মাল্যবান তার এই আচরণকে নিয়ে আবার নিজেই কৌতুক করে। খেতে বসে উৎপলা যখন তাকে গালাগাল করছে, তখন মাল্যবান লেবুর খোসা দিয়ে এঁটো প্লেটে কার্টুন আঁকে।

গায়ে তেল মাখতে-মাখতে মাল্যবানের কখনো মনে হয়, 'কী জানি, আমার বদলে অন্য কোনো দশাসই পুরুষের স্ত্রী হলে এত দিনে উৎপলার আট-দশটি সন্তানের মা না হলে ছাড়ত না হয় ত।'

উৎপলার ওপরের ঘরে যখন গান-বাজনা হয়, তখন মাল্যবান নিচের কলতলায় কাপড় কাচে, কোনো কোনো দিন বমি করে দেয়। মাল্যবান নিজেকে নিয়ে অদ্ভুত এক পরিস্থিতি তৈরি করে। নিজেকে নিয়ে এ ধরনের সেলফ মকারি করে সে।

উৎপলা, মাল্যবান দুই পৃথিবীর মানুষ। মাল্যবান কেন যে উৎপলাকে সহ্য করে, কেন এমন বশ্যতা মেনে নেয়, সেটা নিয়ে নিজেই ভাবে মাল্যবান। এই অন্ন আর যৌনতা ভরা পৃথিবীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার স্পৃহা, সাহস, রুচি হয় না তার। তার মনে হয় সে একটি ফাঁদে পড়ে গেছে এবং এই ফাঁদকে সহ্য করাই তার পরিণতি। উৎপলার এই অত্যাচার সহ্য করে সে, উৎপলাকে করুণা করে। এই করুণা করার ভেতর দিয়ে সে বরং তার মহত্ত্বকেই চর্চা করে যেন। জীবনানন্দ লেখেন, 'রাস্তায় নেমে মাল্যবানের মহাপুরুষদের মত মনে হল ভালবাসা বা কামনা নয়, করুণাই মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির অগ্নিকারুকার্যের ভেতরে আপতিত শিশির-ফোঁটার মত খচিত করে রাখে।'

নিজেকে অতিমানব মনে হয় তার কখনো কখনো।

'সে, কোনো যৌন আকর্ষণ বা যৌনাতীত গভীর ভালবাসা—নারীকে ভালবাসা—এসব স্তর ও ফাঁদ উতরে গিয়ে একটা নির্জন অন্তর্ভেদী সমভিব্যাপী দয়ার উজ্জ্বলতায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন অতিমানুষের মত হয়ে উঠল মাল্যবান।'

'মাল্যবান' রামায়ণের একটা পাহাড়ের নাম। এই পাহাড় ধৈর্যশীলতার প্রতীক।

BanglaBook.org

মাল্যবানের মনে হয় উৎপলার কারণে তার জীবন আর দশটা পুরুষের মতো হয়নি। সেটাও সে উপভোগ করে, 'মাল্যবান ভাবে, রাতের বেলাটার তার তাদের মত কেটে যেত যদি উৎপলার মত একজন "সত্তমা" স্ত্রী এসে বাদ না সাধতো। উৎপলার সংস্পর্শে এসে জীবন ধাক্কা আঘাত উপলব্ধির ভেতর দিয়ে চলেছে। এ না হলে তার অফিসের মাইতি, দে, গুই বাবুদের মতো এড়িগেড়ি বাচ্চায় ঘর ভরে ফেলে, সিঁদুর থেবড়ানো, ফোকলা দেঁতো শাকচুন্নিদের নিয়ে ঘর করত। কিন্তু উৎপলাকে নিয়ে তার জীবন সে রকম নয় তো। ওদের মতো নয়, আরেক রকম।'

অথচ এত বিরূপতা সত্ত্বেও আবার মাল্যবান উৎপলার কাছে যেতে চায়। তার সান্নিধ্য চায়। নিচতলায় মাল্যবান যখন বমি করে, তখন উৎপলা ওপর থেকে নেমে এসে তাকে বাতাস করে। তবু তাদের দূরত্ব ঘোচে না।

'না, নয় বৎসরেও ঘরজোড়া স্নিগ্ধতা হল না, খড়খড়ে আগুন কড়ের চমৎকার অগ্নি-ডাইনির মত হল মাল্যবানের বিয়ে আর বৌ, আর বিবাহিত জীবন।'

দুই

তবে কি নারীর হৃদয়হীনতার কদর্যতা ফুটিয়ে তুলবার জন্যই জীবনানন্দ আয়োজন করে লিখেছেন *মাল্যবান* উপন্যাস? কী করে তা বলি, আমরা তো এ-ও দেখি যে নারীসত্তার প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ, শ্রদ্ধার কথা ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায়। কবিতাতেই তিনি লিখেছেন, 'নারী, শুধু তোমাকে ভালোবেসে জেনেছি, নিখিল বিষ কতটা মধুর হতে পারে।'

গভীর বিস্ময়ে তিনি তাকিয়েছেন নারীর প্রতি। *নিরুপম যাত্রার* প্রভাত তার প্রতিবেশী স্নিগ্ধ, বিচক্ষণ উষার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'অন্ধকার রাতে কাঁঠাল-হিজলের জঙ্গলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে যেমন ভাল লাগে—এই মেয়েটিকেও তেমন লাগে—'

একজন সুস্থ পুরুষ বিপরীত লিঙ্গের মাধুরী এবং মদিরার আবেশে যে আকর্ষণ বোধ করে, তা-ও অক্ষরবন্দী করেছেন তিনি। যেমন মন তেমন নারী শরীরের ঘনিষ্ঠতার অনুপুঙ্খে গেছেন :

তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন...

নারীর চুলের ভেতরের ঘাম, জিবে সেই ঘামের নোনা স্বাদ, যে নুন সমুদ্রের, এই নিবিড় শরীরী মাদকতার কথা লিখেছেন কবিতায়।

লিখেছেন পুরষের শরীরী উত্তেজনার কথাও
মাঝে মাঝে পুরুষার্থ উত্তেজিত হলে—

BanglaBook.org

(এরকম উত্তেজিত হয়)
উপস্থায়িতার মতন
আমাদের চায়ের সময়
এসে পড়ে আমাদের স্থির হতে বলে...

আবার শুধু পুরুষ হিসেবে নয়, একেবারে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে তার নাজুকতা আর শক্তির অদ্ভুত গল্প তিনি শুনিয়েছেন গভীর মমতায় লেখা এক নারীর জীবনের উপন্যাস *কল্যাণী*তে, যে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে চায়। যে মানুষের কথা তিনি লিখেছেন *বিভা* উপন্যাসে :

'জীবন সম্বন্ধে ধারণা করতে গিয়ে পুরুষ ও নারী যদি ভিন্ন স্বভাবের জীবন হয়, তাহলে এ কথা ঠিক যে এমন অনেক নারী পুরুষ রয়েছে যারা নিছক নারী বা পুরুষ নয়, কিন্তু বিশেষভাবে ব্যক্তিগত মানুষ।'

এমনকি নারীর হাতেই পৃথিবীর সামাজিক, অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটতে পারে এমন মতই তিনি দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের মুখে, বলেছেন নারীর অর্থনীতির কথা। তাঁর *বাসমতি উপাখ্যান* উপন্যাসের চরিত্র ফাটা বলে, 'ইকনামিক্স পুরুষদের শাস্ত্র ছিল। অনেকদিন থেকে ধস্তাধস্তি করে আসছে তারা। শেষ মার্ক্সে এসে সিদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়া সেটাকে প্রমাণিক সাফল্য দিচ্ছে—শুনে ভাল লেগেছিল। কিন্তু হল না কিছু। পুরুষদের হাতে এ শাস্ত্র মনের ভূমিতে বা সমাজ ভূমিতে খুব সম্ভব কোথাও সিদ্ধ হবার নয়। ইকনামিক্স নিছক বিজ্ঞান নয়, কিন্তু এটা কী তাহলে?'

এরপর ফাটা বলে অর্থনীতি শুশ্রূষার ব্যাপার। শুশ্রূষায় নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ। ফাটা বলে, 'আজকের পৃথিবী এই শুশ্রূষা চাইছে, জ্ঞানের ভেতর দিয়ে। দরকার একটি বিশেষ জ্ঞান-ইকনামিক্স। কিন্তু একে এর আধুনিক অবস্থায় ফেলে রাখলে চলবে না, অনেক দূর এগিয়ে নিতে হবে, মানুষের সেবা শুশ্রূষার বড় ব্যাপ্ত, প্রাণঘন সুর এর ভেতরে ফুটিয়ে তোলে। পুরুষরা কি তা পারবে?'

তিন

সত্যি বলতে, একাধারে শুশ্রূষাপরায়ণ আবার নির্মম আত্মপরায়ণ নারীর স্ববিরোধিতাকে জীবনানন্দ যেন মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেছেন *মাল্যবান* উপন্যাসে। উপন্যাসটা শেষ হয় প্রায় এক পরাবাস্তব দৃশ্যে। দেখা যায় মাল্যবান আর উৎপলা দুজনে উপন্যাসে প্রথমবারের মতো এক বিছানায় গিয়ে শুয়েছে। তারপর উৎপলা মাল্যবানকে বলছে, 'ভোর হবে না আর, জানতে হবে না। দেখো শীতের রাত কিরকম শীত, খড়ের বিছনায় হাঁস হাসিনের শীতের রাত সত্যিই কী

BanglaBook.org

যেন চমৎকার লম্বা বলে আরো ভালো। সত্যি কোনদিন শেষ হবে না।'

মাল্যবানের আশ্চর্য লাগছিল। কোনো দিনও যে জেগে উঠতে হবে না আর, শীত, যা সবচেয়ে ভালো, এই বিশৃঙ্খল অধঃপতিত সময় মাল্যবানের সময় ঘেঁষে থেকে যাবে অনিঃশেষ শীত ঋতুর ভেতর।...

'কোনদিন শেষ হবে না রাতের?
না।
কোনদিন শেষ হবে না আমাদের রাতের, উৎপলা?
হবে না। হবে না।
শীতের রাত ফুরুবে না কোনদিন?
না।
কোনদিন ফুরুবে না শীত রাত, আমাদের ঘুম?
না, না, ফুরুবে না।
কোনদিন ফুরুবে না শীত, রাত আমাদের ঘুম?
ফুরাবে না। ফুরুবে না।
কোনদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?
না, না, ফুরুবে না।
কোনদিন ফুরুবে না শীত রাত, আমাদের ঘুম?
ফুরুবে না। ফুরুবে না। কোনদিন।'

BanglaBook.org

এই দৃশ্য, এই সংলাপ মাল্যবানের স্বপ্নেই ঘটে যেন। এক বিচিত্র বিমূর্ততায় শেষ হয় উপন্যাস। *মাল্যবান* জটিল, নানা স্তরী উপন্যাস। বিষম দাম্পত্যের যে ফিরিস্তি সেটা মাল্যবানের একটা ওপরের খোলসমাত্র। এর ভেতর গোঁজা আছে ভোগ আর ভোগের নিস্পৃহ অবলোকনের দ্বৈধতার দর্শন। মুণ্ডক উপনিষদের একই গাছে বসা দুটা পাখির কথা উল্লেখ করা আছে। একটা পাখি ফল খাচ্ছে আর অন্য পাখিটা তার ফল খাওয়া দেখছে। এক পাখি এই জড় জগতের আকর্ষণে আবদ্ধ, আরেক পাখি কেবল দর্শক। একটা জীবাত্মা, আরেকটা পরমাত্মা। এই দুই পাখির মিলনই হচ্ছে মুক্তি। দুঃখ যন্ত্রণায় বিষাদে অপমানে লাঞ্ছিত হতে হতে মাল্যবান অগ্রসর হয় তারই দিকে যে তার দুঃখের কারণ।

চার

মাল্যবানের দাম্পত্যের সঙ্গে জীবনানন্দের দাম্পত্যের মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, খুঁজে পেয়েছিলেন লাবণ্য। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর মাল্যবানের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হলে ভূমেন্দ্র এবং জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ এটা বই আকারে প্রকাশ

করতে চাইলে বাধা দিলেন লাবণ্য। বললেন, এ পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা যাবে না। এক অদ্ভুত কারণ দেখালেন লাবণ্য। বললেন, জীবনানন্দ তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন এবং বলেছেন এ পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা যাবে না। লাবণ্যর আসল অস্বস্তির কারণ লুকানো থাকেনি ভূমেন্দ্র এবং অশোকের কাছে। পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের পর *মাল্যবান* প্রকাশ করতে পেরিয়ে গেছে বিশ বছর।

সন্দেহ নেই, জীবনানন্দ-লাবণ্যর দাম্পত্য ছিল অসুখী, অসফল।

কবিতা, লেখালেখি জীবনানন্দের জীবনের, তাঁর সত্তার একেবারে গোড়ার ব্যাপার হলেও সিন্দবাদের মতো এই চিন্তাই বরাবর তাঁর ঘাড়ে চেপে থাকলেও, তাঁর ঘরের সবচেয়ে কাছের মানুষটার এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহই ছিল না। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর *মানুষ জীবনানন্দ* নামে লাবণ্য যে স্মৃতিকথা লিখেছেন, তাতে তিনি তাঁদের দাম্পত্যের বেশ একটা সতর্ক বয়ান দিয়েছেন। এই বই যখন লিখেছেন তখন জীবনানন্দের ব্যাপারে ক্রমশ আগ্রহ বাড়ছে পাঠক-পাঠিকাদের। লাবণ্য জীবনানন্দের সেই সামাজিক পরিচিতির কথা ভাবনায় রেখেছেন। সেই বইয়ে জীবনানন্দকে কবি বলে সম্বোধন করেছেন লাবণ্য, তাঁর কবিতার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন কিন্তু জীবনানন্দ বেঁচে থাকতে তাঁর কবিতার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে জানা যায় না। সেই বইয়ে নিজেই স্বীকার করেছেন যে কবিতার পৃথিবীর সাথে তাঁর কোনো যোগ নেই।

একদিনের একটা ঘটনার স্মৃতিচারণা করেছেন লাবণ্য। বরিশালের বাড়িতে একদিন লাবণ্য দুপুরে ঘুমিয়ে ছিলেন, জেগে দেখলেন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। বাইরে উঠানেই সকালবেলা শাড়ি, কাপড় নেড়ে দিয়েছিলেন। দেখলেন জীবনানন্দ আর তাঁর মেয়ে বাড়ির বারান্দায় বসে কবিতা নিয়ে কথা বলছেন। মেয়ে মঞ্জু তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। তাঁদের চোখের সামনে সবগুলো কাপড় ভিজছে কিন্তু তাঁদের কোনো টনক নেই। জীবনানন্দের এই বেখেয়ালিপনায় মেজাজ বিগড়ে গেল তাঁর। তাঁদের দুজনকে এ নিয়ে অনেক কথা শোনালেন। জীবনানন্দ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি কি একদিনের জন্যও সংসারের একটু ওপরে উঠতে পারবে না? কোনো দিন এক মুহূর্তের জন্যও কবিতা নিয়ে একটু কথা বলবে না?'

লাবণ্য ঘাড় ঘুরিয়ে যেতে যেতে বলেছেন, 'আমি ওসব কবিতার ধার ধারি না।'

জীবনানন্দের সংসারের আনাড়িপনার নানা বয়ানই লাবণ্য দিয়েছেন সেই স্মৃতিচারণায়। তবে জানিয়েছেন ছেলেমেয়েদের জন্য একটা কাজই জীবনানন্দ খুব দক্ষতার সঙ্গে করতেন। সেটা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের স্কুলের পেনসিল কেটে দেওয়া। নিখুঁত করে সন্তানদের পেনসিল কেটে দিতেন তিনি। এমন নিখুঁত পেনসিল কাটা লাবণ্য কখনো দেখেননি। মোটকথা, সংসারে তাঁর কৃতিত্ব ওইটুকুই. সুন্দর করে বাচ্চাদের পেনসিল কেটে দেওয়া।

BanglaBook.org

লাবণ্য ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। তখনকার সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের রেওয়াজ অনুযায়ী লাবণ্য গান-বাজনা শিখেছেন, ইডেন কলেজে নাটকও করেছেন। তিনি একসময় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনেও আগ্রহী হয়েছিলেন। বিয়ের পরপর একবার বরিশালে তাঁদের বাড়িতে পুলিশও হানা দিয়েছিল। অবাক হয়েছিলেন জীবনানন্দ, পুলিশকে বলেছিলেন 'না, না, আপনারা ভুল করছেন, লাবণ্য রাজনীতি করতে যাবে কেন?' পুলিশ বলেছিল, 'আপনি কি জানেন জীবনানন্দ বাবু, এরা ঢাকার মেয়ে, ডেঞ্জারাস।' পরে বাড়ি তল্লাশি করে আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা বই পায় পুলিশ, তারা মনে করে এই তো যথেষ্ট প্রমাণ যে লাবণ্য সন্ত্রাসী। আসলে সেটা ছিল লাবণ্যর ব্রজমোহন কলেজের বিএর পাঠ্যবই। জীবনানন্দ পুলিশকে বহু কষ্টে তা বোঝাতে পেরেছিলেন। পুলিশ শেষে লাবণ্যকে ছেড়ে দিলেও সাবধান করে দিয়েছিল জীবনানন্দকে।

না, লাবণ্যর রাজনীতির কোনো সংশ্লিষ্টতার জন্য সাবধান থাকতে হয়নি জীবনানন্দকে। সাবধান থাকতে হয়েছে তাঁর নানা সাংসারিক বঞ্চনাবোধকে সামাল দিতে। লাবণ্য নেহাত সরল, লাজুক, মুখচাপা কোনো নারী ছিলেন না। ছিলেন বুদ্ধিমতী এবং প্রগল্‌ভ নারী। ছাত্র অবস্থায় কিছু সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকলেও সেসব তাঁর জীবনের প্রধান কোনো অনুপ্রেরণা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন একটা সচ্ছল সংসার, স্বামী হিসেবে চেয়েছেন একজন সাধারণ মানুষকে, যে স্ত্রীকে সময় দেবে, যার জীবন হবে সংসারকে কেন্দ্র করে। উনি এমন লোককে স্বামী হিসেবে চাননি, যার মাথার চারপাশে বোধ কাজ করে। তাঁদের এক পারিবারিক বন্ধু মিনু সরকার মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, লাবণ্য বিস্তর কথা বলতেন, ব্রাহ্মসমাজের শীতল, শোভন জীবনযাপনের ভেতর লাবণ্যকে কিছুটা বেমানান লাগত। মিনু আরও জানাচ্ছেন, লাবণ্য তাঁকে একদিন বলেছেন, লেখক বলতে তিনি বোঝেন ডা. নিহাররঞ্জন গুপ্তকে। তিনি লাবণ্যর সম্পর্কে মামা। ডা. নিহাররঞ্জন গোয়েন্দা উপন্যাস লিখে বিস্তর খ্যাতি অর্জন করেছেন তখন। লাবণ্য বলেছেন, লিখলে তাঁর মামার মতোই লেখা উচিত, যেমন নামডাক, তেমনি পয়সা। বলা বাহুল্য, লিখে নাম, পয়সা কোনোটিই জোটেনি জীবনানন্দের। মিনু নিজে যাকে বিয়ে করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে ভদ্রলোকও কবিতা লেখে শুনে লাবণ্য মিনুকে বলেছিলেন, 'সাবধানে থাকিস...

জীবনের কাছে লাবণ্যের যা প্রত্যাশা তা ভিন্ন, জীবনানন্দের চেয়ে যোজন দূরত্বের। তাঁদের পরস্পরের মানসিক দূরত্ব ছিল ব্যাপক। একপর্যায়ে *মাল্যবান*-এর উৎপলার মতোই তাঁদের দাম্পত্যেও ছিল না স্বাভাবিক শারীরিক কোনো নৈকট্য। জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচনে সাহায্য করেছেন যে বিরাম

BanglaBook.org

মুখোপাধ্যায়, তিনি জানাচ্ছেন, একবার জীবনানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, 'স্ত্রী যদি আপনার আমন্ত্রণে ঘনিষ্ঠ হবার প্রস্তাবে সায় না দেয় কী করবেন, কী করা উচিত?'

লাবণ্য ও জীবনানন্দ পরস্পর বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন কি? তাঁদের দাম্পত্যের ফসল তাঁদের দুটি সন্তান। বিচ্ছেদের পারিবারিক, বৈষয়িক, ধর্মীয় নানা জটিলতা আর পরিণতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা হয়তো সে পথে যাননি। বিরোধ সত্ত্বেও একটি সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চেয়েছেন। একপর্যায়ে জীবনানন্দ আর লাবণ্যর দাম্পত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে নেহাত কর্তব্যপালন।

জীবনানন্দ তাঁর অন্তিমকালে যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তখন ভূমেন্দ্র, সুচরিতা সারা রাত জেগে জীবনানন্দকে পাহারা দিলেও লাবণ্য কোনো দিন রাত জাগেননি। গেছেন হাসপাতালে কিন্তু দীর্ঘ সময় থাকেননি। যেদিন মারা গেলেন, সেদিন তাঁর মরদেহ দেখতে সমসাময়িক অনেক লেখক-কবি এসেছিলেন। শবযাত্রা শুরু হবার আগে ল্যান্সডাউন রোডের সেই বাড়ির এক কোনায় দাঁড়িয়ে লাবণ্য ভূমেন্দ্রকে বলেছিলেন, 'তোমার দাদা তাহলে বাংলা সাহিত্যের জন্য অনেক কিছু রেখে গেলেন, আমার জন্য কী রেখে গেলেন বলো তো?'

মোক্ষম প্রশ্ন। জীবনানন্দ বাস্তবিক লাবণ্য আর তাঁর পরিবারের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেননি, ওই কিছু ধূসর পাণ্ডুলিপি ছাড়া। ওই পাণ্ডুলিপি রচনাই ছিল তাঁর জীবন। যদিও অবশ্য তিনি অবিরাম চেষ্টা করে গেছেন জীবন আর জীবিকার একটা সমীকরণ ঘটাতে। একটা ন্যূনতম বৈষয়িক বৃত্তান্ত তৈরি করতে। কিন্তু অক্ষর দিয়ে দ্বিতীয় একটা জীবন গড়ে তুলবার তীব্র ইচ্ছা তাঁকে বারবার অন্যমনস্ক করেছে। তিনি টের পেয়েছেন জীবনে একটু অন্যমনস্ক হলে জীবন তাঁকে ছাড় দেয় না। জীবনে যা কিছুকে মূল্যবান মনে করেছেন, চোখের সামনে সেগুলোকে ধূলিকণা হতে দেখেছেন। গভীর অসহায় বোধ করেছেন। জীবনের এই অসহায়ত্ব, এই শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর *বিভা* উপন্যাসে একটা দৃশ্য আছে, যেখানে খাঁচার ভেতরের একটা পাখি খাঁচার শিক কাটবার চেষ্টা করছে। সেই পাখিটাকে দেখে উপন্যাসের চরিত্র বলছে, 'এই দেখ, আমরা প্রত্যেকেই এ রকম শিক কাটতে চেষ্টা করছি, কিছুতেই পারছি না। এমনি গভীর প্রতিবাদ করছি, শুনছে না, এমনি নিজের জীবনটাকে নিষ্ফলতার ফাঁকে-ফাঁকে আঁচড়ে কামড়ে খিঁচড়ে ফেলছি, অন্য কারু তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। তারপর অবসন্ন হয়ে জীবনের এক কোণে ঘাড় হেঁট করে পড়ে থাকছি। পাখিটার বেলা তুমি বরং এইসব তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছ। মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছ। নিজে অন্তত বেদনা পাচ্ছ। কিন্তু আমাদের বেলা তোমার মতন সমবেদনাপরায়ণ বিলাসী শৌখিন তৃতীয় ব্যক্তিকে হাতের কাছে কোথাও হাতড়ে পাচ্ছি না।'

BanglaBook.org

জীবনানন্দ হাতের কাছে তাঁর জীবনসংগ্রামের একজন সমব্যথী খুঁজেছিলেন। লাবণ্য তা ছিলেন না। নিজের বৈষয়িক বঞ্চনার জন্য লাবণ্যর এই যে আন্তরিক আক্ষেপ, আমরা কি এর প্রতি সহানুভূতিশীল হব? নাকি লাবণ্য যে জীবনানন্দের শক্তির জায়গাটুকু ন্যূনতম অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে সমবেদনা থেকে বঞ্চিত করলেন, সে জন্য তাঁকেও প্রশ্নবিদ্ধ করব?

যেমন মরালী যায়—উড়ে যায়—দূর দূর মালবার পাহাড়ের কোল

এক

তিনজন নারী গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন জীবনানন্দের জীবনকে। তাঁর মা কুসুমকুমারী, তাঁর প্রথম আশ্রয়, তাঁর কবিতার প্রথম অনুপ্রেরণা। অবশ্য তাঁর মায়ের সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাঁর স্ত্রী লাবণ্য, যাঁর সঙ্গে তাঁর নৈকট্যই ঘটেনি, তিনি দূরত্বেই ছিলেন বরাবর। আর শোভনা, যিনি ক্ষণকাল নিকটে ছিলেন জীবনানন্দের, তারপর চলে গেছেন তাঁর সীমানার বাইরে, বহুদূরে। অথচ এই একজন নারীকেই তিনি বরাবর মনের ভেতর বহন করে বেড়িয়েছেন অবিরাম। তাঁর মনের যাবতীয় প্রেম তিনি সাজিয়ে রেখেছেন তাঁর জন্যই। শোভনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দিন কাটাবার বছর বিশ পরও সেই ১৯৪৮ সালে, যখন তিনি জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত, তখনো তাঁর মনে গভীরভাবে জেগে আছে শোভনা। এই সময়ে লেখা তাঁর 'অনেক রাতে হুমায়ুন প্লেসের থেকে' নামের গল্পে অদ্ভুতভাবে উপস্থিত হয় প্রাক্তন প্রেমিকা।

এই গল্পে সোমনাথ নামের এক লোক অনেক রাতে হুমায়ুন প্লেস থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গীতে এসে দাঁড়িয়েছে। এত রাত পর্যন্ত কোথায় সে ছিল, কোথায় ঘুরেছে, কী করেছে নিজেই সে খেয়াল করতে পারছে না। শেষ ট্রাম চলে গেছে, কোনো রকম একটা বাস পেয়ে তাতে চড়ে বাড়ি ফিরেছে। সে থাকে একটা বাড়ির দোতলার ছোট্ট একটা ঘরে একা। নিচের তলার লোকেরা মূল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সোমনাথ দেখে তার দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু তার মনে পড়ে বের হবার আগে আলো নিভিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সে। কী ব্যাপার বুঝতে পারে না। কোনো উপায় না পেয়ে, দেয়ালের পাশে পাইপ বেয়ে দোতলায় ওঠে। দেখে তার ঘরে আলো জ্বলছে। কিছু চুরি গেছে কি না বোঝার চেষ্টা করে সোমনাথ। কিন্তু কিছু চুরি যায়নি। তার ঘরে তেমন দামি কিছু নেইও, আছে কিছু বই। বাতি নিভিয়ে শুতে যাবে। তখন হঠাৎ শোনে ঘরের ভেতর এক নারীকণ্ঠ। সোমনাথ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে বলে, কে?

BanglaBook.org

নারীকণ্ঠ বলে, 'আমি, বাতি জ্বালিও না।' সোমনাথ চিনতে পারে এ সেই নারীর কণ্ঠস্বর, যাকে উজাড় ভালোবাসা দিতে চেয়েছিল একদিন।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি এখানে?'

না, সোমনাথের ঘরে ঠিক কোনো মানুষ নেই, শুধু একটি কণ্ঠস্বর আছে। সেই নারী কণ্ঠস্বরের সাথে আলাপ চলে :

সোমনাথ : বারো বছর পর তোমার সাথে দেখা...এতদিন কোথায় ছিলে?

কণ্ঠস্বর যত জায়গায় থাকা সম্ভব হতে পারে।

সোমনাথ : শুনেছিলুম প্যারিসে গিয়েছিলে—

কণ্ঠস্বর : ও, সে কথা তোমার কানেও ঢুকেছে?

সোমনাথ কবে গিয়েছিলে?

কণ্ঠস্বর বম্বিং-এর সময়।

সোমনাথ প্যারিস তো ওপেন সিটি হলো, জার্মানরা নিয়ে নিল...

এভাবে সোমনাথ সেই নারী কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অন্ধকারে গল্প করতে থাকে। তার প্রাক্তন প্রেমিকা কী করে এক মুসলমান বড়লোক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে আটকে পড়েছিল, সেসব গল্প করে। তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারত কি না, সেসব বিবেচনা করে। তারপর অনেক রাতে সেই নারী কণ্ঠস্বর বিদায় নেয় এবং সোমনাথ মদের বোতল নিয়ে বসে। এক অশরীরী কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অন্ধকারে যুদ্ধ, প্রেম, রাজনীতির আলাপ চলে এই অভিনব গল্পে। সশরীরে না হলেও নেহাত এক কণ্ঠস্বর হিসেবেই কি শোভনাকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন তিনি?

BanglaBook.org

দুই

যে শোভনাকে জীবনানন্দ নিরন্তর বহন করেছেন মনের ভেতর, তিনি আসাম থেকে ম্যাট্রিক পাস করে চলে গিয়েছিলেন কলকাতা, সেখানে ভর্তি হয়েছিলেন ডায়োসেশন কলেজে। কেতাদুরস্ত ব্রিটিশ কায়দার কলেজ। ওখান থেকে বিএ পাস করে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে শোভনা চলে যান শিলংয়ের লেডি কিং স্কুলে। সেখানে শোভনার বিয়ে হয় ইঞ্জিনিয়ার সুহৃদ মজুমদারের সঙ্গে। বার্ড অ্যান্ড কোম্পানি নামের এক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির ম্যানেজার ছিলেন সুহৃদ। চাকরি করেছেন ভারতের নানা জায়গায় এবং শ্রীলঙ্কাতে। শোভনা তাঁর সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন। শেষে এসে স্থায়ী হয়েছেন কলকাতায়। কলকাতার কমলা গার্লস স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু মেয়েদের জন্য বিশেষ ক্যানটিন খুললে পশ্চিমবঙ্গের সে সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বিধান

রায় শোভনাকে এর প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ দেন। বিধান রায়ের সঙ্গে পারিবারিক যোগাযোগ ছিল তাঁদের। এই সচ্ছল, সার্থক জীবনযাপনের ফাঁকফোকরে তিনি কি কখনো স্মরণ করেছেন তাঁর মিলুদা, জীবনানন্দকে?

ভূমেন্দ্র গুহ খুঁজে বের করেছিলেন শোভনাকে, দেখা করেছেন তাঁর সঙ্গে। শোভনা তখন দক্ষিণ কলকাতায় থাকেন। ফোনে যোগাযোগ করে একটা তারিখ নিয়ে ভূমেন্দ্র হাজির হয়েছিলেন শোভনার বাড়িতে। জীবনানন্দের ডায়েরিজুড়ে, কবিতাজুড়ে যে শোভনার জন্য আকুতি, তাঁর দেখা পাওয়ার উত্তেজনায় ছিলেন ভূমেন্দ্র। ভূমেন্দ্রর সামনে লাঠিতে ভর দিয়ে এলেন শোভনা। শোভনা তখন তাঁর বার্ধক্যে, ফরসা, ছিপছিপে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ভূমেন্দ্র যখন শোভনার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তার বছর খানেক আগে ১৯৯৯ সালে জীবনানন্দের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়েছে। জীবনানন্দকে নিয়ে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে তখন। শোভনা ধীরকণ্ঠে বললেন, 'আজকাল মাঝে মাঝে টিভিতে দেখি মিলুদাকে নিয়ে আলোচনা হয়। আমি সেসব অনুষ্ঠান মিস করি না। মিলুদা যে কালে কালে এমন একজন বিখ্যাত কবি হয়ে উঠবে, এত দিন পরও লোকে তার কথা এমন বলাবলি করে আমি তো তা কখনো আঁচই করতে পারিনি। অবাক লাগে।'

এরপর শোভনা স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেন, 'মিলুদা তো সারাক্ষণ কবিতা নিয়েই থাকতেন। শুধু ওই কবিতা কবিতা করে কি লোকে বাঁচতে পারে? আমি নিজের জীবন নিয়েই তো ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, মিলুদার কবিতার খোঁজখবর আর রাখতে পারিনি...খুব মনে আছে, তার প্রথম কবিতার বইটা আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। ডাকে যখন আমার নামে বইটা এল, আমি লজ্জা আর ভয় পেয়েছিলাম। মনে মনে খুশিও হয়েছিলাম খুব। বইটা তো আমি আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম অনেক দিন। তারপর সব জানাজানি হয়ে যায়...আমি ওদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে গেছি। মিলুদা আসলে বিয়ে করতে চায়নি। বিয়ে করার জন্য একজন পুরুষ মানুষ কি ত্রিশ একত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বসে থাকে? আমাদের জ্যাঠামশাই মনোমোহন চক্রবর্তী ওই যে *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকার সম্পাদক উনিই জোর করে বিয়েটা করালেন। তার ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের ওই বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য করালেন। মিলুদা তো সারাটা জীবন মুখচোরা, সবাইকে সন্তুষ্ট করাতে ব্যস্ত। বাবা-মার বাধ্য। উনি তো কবি মানুষ, বিয়ে করবার দরকার কী ছিল? ওর স্ত্রী তো ভয়ংকর মহিলা। মিলুদার সাথে একদম বনেনি। মিলুদার জীবনটা ভাজাপোড়া করে ছেড়েছে।'

ভূমেন্দ্র অবশ্য বলতে পারেননি, 'এতই যদি বোঝেন তাহলে আপনি নিজে কেন তাঁকে গ্রহণ করেননি।' আলাপের এক ফাঁকে হঠাৎ শোভনা বললেন, 'মিলুদা আমাকে চিঠি লিখত, চিঠিগুলো কিন্তু এখনো সব আছে আমার কাছে।' ভূমেন্দ্রর

BanglaBook.org

চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। যেন দারুণ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন। উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'চিঠিগুলো কি দেখা যায়?' শোভনা একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলেন, 'আরেক দিন আসুন।' আরেক দিন বিপুল আগ্রহ নিয়ে গেলে ভূমেন্দ্রকে হতাশ করে শোভনা বলেছিলেন, 'না, চিঠিগুলো নেই, খুঁজে পাচ্ছি না।' শোভনা কি এর মধ্যে ভেবেচিন্তে ঠিক করেছেন যে ওই চিঠিগুলো তিনি আর প্রকাশ্য করবেন না? জীবনানন্দের এই দুর্লভ প্রেমপত্রগুলো পড়বার সুযোগ থেকে সকলকে বঞ্চিত করলেন শোভনা। শোভনা যে তাঁর জীবন থেকে চলে গেছেন চিরতরে, তা জীবনানন্দ ভাঙা মন নিয়ে মেনে নিয়েছিলেন অনেক আগেই :

তুমি চলে গেলে—
যেমন মরালী যায়—উড়ে যায়—দূর দূর মালবার পাহাড়ের কোল।
পিছনে চায় না ফিরে তিমির অতীত তীরে—কোন দ্বিধা কোন ব্যথা নাই?
...তুমি আর আসবে না জানি জীবনের প্রথম ফসল
এখন আসিছে সন্ধ্যা আর শীত আর তীব্র শিশিরের জল—

BanglaBook.org

কালো ট্রাঙ্কের প্রহেলিকা

এক

নতুন শতাব্দীর ক্রান্তিকালে জন্ম নিয়ে একটা শতাব্দীর অর্ধেকটুকু পাড়ি দিয়ে ১৯৫০ সালের দিকে এসে জীবনানন্দ জীবনের কেন্দ্র থেকে ছিটকে পড়েছেন, ঠেকেছেন একেবারে কিনারে। কিনার থেকে তিনি জীবনকে দেখছেন তখন। সেই ছিটকে পড়া জীবন নিয়েই লিখছেন গল্প-উপন্যাস। তাঁর 'অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি' নামের গল্পের এক চরিত্র বলে, 'জীবনের কেন্দ্র থেকে যেসব উপন্যাসের জন্ম হয়, সে সব ভালো লাগে না আমার আজকাল আর। বরং জীবনের কিনার ঘেঁষে মৃত্যুর অশরীরের অস্পষ্ট গন্ধের ভিতর যে সমস্ত গল্পের জন্ম হয়, সেগুলো নেড়েচেড়ে সন্ধ্যা ও রাত্তির বেশ কেটে যায় আমার।'

*মাল্যবান*সহ গোটা বিশেক উপন্যাস লিখেছেন তিনি, লিখেছেন এক শর ওপর গল্প। কিন্তু একটাও ছাপাননি। লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর খাটের নিচের ট্রাঙ্কে। সাহিত্যে মোটামুটি পরিচিতি পেয়ে যাবার পর এমন বিশাল লেখালেখিগুলো লুকিয়ে রাখার মতো ঘটনা বাংলা সাহিত্যে নেই। বিশ্বসাহিত্যেও আছে কি? কাফকা তাঁর বন্ধুকে বলেছিলেন তাঁর অপ্রকাশিত লেখা পুড়িয়ে ফেলতে। জীবনানন্দের তেমন ইচ্ছা ছিল না। সেসব গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সযত্নে রেখে

দিয়েছেন তিনি ট্রাঙ্কে। কবিতা ছাপালেন কিন্তু গল্প, উপন্যাস ছাপালেন না কেন?

হতে পারে তিনি তাঁর কবিতা নিয়ে যতটা আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, কথাসাহিত্যের ব্যাপারে অতটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারেননি। ডায়েরির পৃষ্ঠা থেকে জানা যাচ্ছে, তাঁর উপন্যাস বিচারের মানকে তিনি রেখেছিলেন অনেক ওপরে। সে সময় তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার উজ্জ্বল উপন্যাসিক। জীবনানন্দ এঁদের লেখাকে গভীরভাবে পাঠ করেছেন, এঁদের নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন কিন্তু তিনি তাঁর আরাধ্য করে রেখেছিলেন টলস্টয়, টমাস মান কিংবা দস্তয়ভস্কির মতো বিশ্বসেরা ঔপন্যাসিকদের। তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলো সেই বিশ্বসাহিত্যের মান স্পর্শ করেছে কি না, তা নিয়ে হয়তো সংশয় ছিল তাঁর। অবশ্য সিদ্ধান্ত নিলেও কোনো প্রকাশক তাঁর গল্প-উপন্যাস ছাপাতে আগ্রহী হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। জীবনানন্দের মৃত্যুর পরও সেসব উপন্যাস ছাপাতে অনেক নামজাদা পত্রিকা গড়রাজি ছিল। তারা এগুলোকে দেখেছে নেহাত এক কবির আনাড়ি কথাসাহিত্য চর্চার নমুনা হিসেবে। নিজ খরচে ছাপাবার মতো বাস্তবিক অবস্থা তাঁর ছিল না। আবার এ-ও হতে পারে যে তিনি নিজেই কবি পরিচয়ের বাইরে না আসবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হয়তো একান্ত নিজের তৃপ্তির জন্য, বিশেষ মানসিক, জাগতিক সংকট মোকাবিলার উপায় হিসেবে গল্প-উপন্যাসগুলো লিখেছেন। কাউকে পড়াবার জন্য নয়। লেখা ছাপানো যেমন লেখকের ইচ্ছা, না ছাপানোও তেমন লেখকের ইচ্ছা হতেই পারে। কবিতা না উপন্যাস—কোন পথ ধরতে চান এ নিয়ে তাঁর দ্বিধার নমুনা আছে ডায়েরিতে।

তা ছাড়া লক্ষ করা যায় তাঁর কবিতায় ব্যক্তি জীবনানন্দ তেমন উপস্থিত নন, তিনি আছেন পরোক্ষে অথচ গল্প-উপন্যাসে তিনি খুবই আত্মজৈবনিক। জীবনানন্দ কি দ্বিধান্বিত ছিলেন জনসমক্ষে এতটা উন্মুক্ত হতে? চেয়েছিলেন কি যে এসব আসলে তাঁর মৃত্যুর পরই আসুক জনসমক্ষে? তাঁর ট্রাঙ্কে রাখা পাণ্ডুলিপিগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ এবং একদিন যে লোকে এর খোঁজ করবে সে বিশ্বাস তাঁর ছিল। সে প্রমাণ আছে তাঁর গল্পের বয়ানেই।

দুই

তাঁর 'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ' গল্পে মৃত্যুপথযাত্রী চরিত্র বলছে:

'আমার কতগুলো খাতা আছে।

কিসের খাতা।

অনাদি একটু হেসে, 'হিসেবের খাতা নয়, আমি মাঝে মাঝে লিখতাম টিখতাম।'

এ অপরাধ তাহলে—

BanglaBook.org

হ্যাঁ সকলেরই আছে। আমার মতন লোকেরই দিন। দশ বছর আগেও আমার ভয় হতো চোর যদি কাপড়চোপড় ভেবে বাক্স দুটি ভরে নিয়ে যায়—এই খাতার বাক্স ঘর যদি আগুনে পুড়ে যায়—উইয়ে যদি কেটে যায় তাহলে পৃথিবীর অনেক দর্শন বিজ্ঞানের চেয়েও বড় জিনিস হারিয়ে যাবে...এই পাণ্ডুলিপি নেড়েচেড়ে এইরকম একটা নির্জন আনন্দ আমি পেয়েছি। আমার সাংসারিক জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি করতে পারিনি তাই। এ বেশ ভালো হয়েছে।

তোমার সেই পাণ্ডুলিপিগুলো আছে আজও?

আছে।

কিছু ছাপাওনি?

না, মরবার আগে এখনো এও যেন একটা সান্ত্বনা যে এই লেখাগুলো আমাকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখবে...'

মৃত্যুর পর লেখা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে—এমন বিশ্বাস তাঁর গহন মনে ছিল সব সময়। সে কারণেই কি তিনি প্রকাশ না করলেও কাফকার মতো অপ্রকাশিত লেখা ধ্বংস করতে চাননি? শুধু গল্প না, অপ্রকাশিত কবিতাগুলো নিয়েও তাঁর ছিল এমন আত্মবিশ্বাস। তাঁর উপন্যাসে চরিত্ররাও এমন গভীর বিশ্বাসে কবিতা লিখে না ছাপিয়ে লুকিয়ে রাখে। তারা জানে তাদের কবিতাগুলো মূল্যবান এবং তা একদিন মানুষ পড়বে এবং আক্রান্ত হবে। *আমরা চারজন* উপন্যাসের কবি চরিত্র বলে, 'কাজেই ঠিক করেছি—যখন খুশি কবিতা লিখব, কিন্তু কাউকে দেখাতে যাব না। আমি যত দূর বুঝে দেখেছি, তাতে মনে হয় যে, যে কবিতাগুলো না ছিঁড়ে জমিয়ে রেখেছি, সেগুলো কোন না কোন হৃদয়কে কোন না কোন দিন আলো দেখাবে, জলের কণিকাদের আঘাতের মতো ঘরোয়া প্রতীকের আশ্রয়ে সমাজকে বহন করে ফিরতে; কথা ভাবাবে তার পরেও কথা ভাবাবে—অনেক কাল।...'

নিরুপম যাত্রা উপন্যাসের গোপন কবিও ভাবে, 'এ কবিতাগুলো কাউকে দেখাইনি। অনেক ক্ষণ সময় কেটে যায়। অবাক হয়ে ভাবি জীবনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে নিজেকে স্থির রাখা। ভাবতে-ভাবতে অনেক মুহূর্ত কেটে যায়, এক সময় নিজেকে স্থির রাখতে চেষ্টা করি এই ভেবে যে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন এমন অনেক অনেক চিন্তা ও কল্পনার সম্ভার ধোঁয়ায় মিশে গেছে যার তুলনায় আমার এ কবিতাগুলো কিছুই নয়। শেষ পর্যন্ত সেক্সপিয়রের সমস্ত কাব্যও ত এক দিন বরফের নিচে ধ্বসে যাবে। পৃথিবীতে একটি মানুষও থাকবে না। কিন্তু তবুও থেকে-থেকে

BanglaBook.org

মনে হয় আলেকজানড্রিয়ার লাইব্রেরির সমস্ত লুপ্ত ঐশ্বর্যের চেয়েও আমার কবিতাগুলোর ইঙ্গিত ও মূল্য ঢের চমৎকার ছিল, শেক্সপিয়র যা দিতে পারেনি—তাই ত দিয়েছিলাম আমি।...'

অতলান্ত খাদের গহ্বরে

এক

সাহিত্যে বিশ্বমানের ধন-দৌলত তাঁর তোরঙ্গে ভরে রেখে যাচ্ছেন এমন বিশ্বাস গোপনে বয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। কিন্তু সংসারের তোরঙ্গ তখন তাঁর ফাঁকা। পকেটে ফুটো পয়সা নেই তাঁর। টাকা অর্জনে সর্বব্যাপী ব্যর্থতা তাঁকে তখন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে।

এ সময়ে লেখা জীবনানন্দের *সুতীর্থ* উপন্যাসের এক চরিত্র বরিশালের কথ্য ভাষা ব্যবহার করে বলে, 'সফলতা পেতে দুটো জিনিসের দরকার—এক টাকা, আর এক জুঁকের নাগান লাইগ্যা থাকা, আমি শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম আর এক্কেকবালে তাজ্জব মাইরা ভাবতেছিলাম যে আমিত্তির নাহান প্যাঁচে প্যাঁচে রস সেই জিনিসের, হেইয়ার নাম ট্যাহা...'

সেই 'ট্যাহা' সত্যিই জীবনানন্দের হাতে তখন একদম নেই। *স্বরাজ*-এর চাকরিটা ছাড়বার পর জীবনানন্দ বাস্তবিক কপর্দকহীন হয়ে পড়লেন। উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় আসার পর বরিশালে জমানো যে টাকাপয়সা কিছু ছিল, সেগুলো শেষ হয়ে গেছে। তখন একেবারে শূন্য হাত তাঁর। টাকা এবং জোঁকের মতো লেগে থাকার স্পৃহা দুটার কোনোটাই তাঁর নেই। আগে বেকার অবস্থায় কলকাতার মেসের ভাড়া দিতে না পারলে বরিশালের বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারতেন। মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই, দুবেলা খাওয়ার একটা বন্দোবস্ত হতো। কিন্তু কলকাতায় সে সুযোগ তাঁকে কে দেবে? তিনি তখন এক অতলান্তিক খাদে। এর মধ্যে তাঁর ভাই অশোকানন্দ কলকাতা থেকে বদলি হয়ে গেলেন দিল্লি। জীবনানন্দ তখন ভাড়া নিলেন ওই ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িটাই। অশোকানন্দ ভাড়ার টাকাটার জোগান দিতে লাগলেন। জীবনানন্দ আবার একটা টিউশনি নিলেন, লাবণ্য শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন একটা বাচ্চাদের স্কুলে। কোনো রকম কায়ক্লেশে সংসার টেনে নিচ্ছেন তখন জীবনানন্দ। আবারও হন্যে হয়ে খুঁজছেন একটা কোনো নিয়মিত চাকরি। আবার সেই পুরোনো চক্র।

এ সময় একদিন সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে চিঠিতে লিখলেন

BanglaBook.org

প্রিয়বরেষু,

আশা করি ভালো আছেন। বেশি ঠেকে পড়েছি, সেজন্য বিরক্ত করতে হলো আপনাকে। এখুনি চার পাঁচশো টাকার দরকার, দয়া করে ব্যবস্থা করুন।

এই সঙ্গে পাঁচটি কবিতা পাঠাচ্ছি। পরে প্রবন্ধ ইত্যাদি (এখন কিছু লেখা নেই) পাঠাব। আমার একটা উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয় ছদ্মনামে) *পূর্ব্বাশায়* ছাপতে পারেন; দরকার বোধ করলে পাঠিয়ে দিতে পারি। আমার জীবনস্মৃতি আশ্বিন কিংবা কার্তিক থেকে মাসে মাসে লিখব। সবই ভবিষ্যতে কিন্তু টাকা এক্ষুনি চাই—আমাদের মত দুচারজন বিপদগ্রস্ত সাহিত্যিকের এরকম দাবী গ্রাহ্য করবার মতো বিচার-বিবেচনা অনেক দিন থেকে আপনারা দেখিয়ে আসছেন—সেজন্য গভীর ধন্যবাদ।

লেখা দিয়ে আপনার সব টাকা শোধ করে দেব—না হয় ক্যাশে। ক্যাশে শোধ করতে গেলে ছ'সাত মাস (তার বেশী নয়) দেরী হতে পারে...'

সঞ্জয়ের নিজের তখন আর্থিক সংকট, *পূর্বাশা* পত্রিকা বন্ধ হবার জোগাড়। চার-পাঁচ শ টাকা দেওয়ার মতো অবস্থা তখন তাঁর ছিল না। সঞ্জয় এবং *পূর্বাশা* পত্রিকার সত্যপ্রসন্ন জীবনানন্দের জন্য একটা কাজ জোগাড় করার সব রকম চেষ্টা করতে লাগলেন। সত্যপ্রসন্ন একবার জীবনানন্দকে এক ব্যাংকিং করপোরেশনে নিয়ে গেলেন, সেখানে বিশেষ সুবিধা হলো না, একবার কিছু ইংরাজি নোটবই লিখে দেবার কাজ করতে দিলেন, জীবনানন্দ রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত পারলেন না লিখতে।

এ সময় মুর্শিদাবাদে থাকা অচিন্ত্যকুমারকে লিখলেন, '...আমি বিশেষ কোন কাজ করছি না আজকাল। লিখে, পড়িয়ে অল্পস্বল্প রোজগারে চলে যাচ্ছে। একটা চাকরীর জন্য দরখাস্ত করেছিলাম, রেফারেন্স চেয়েছিলো, তার ভেতর তোমার নামও দিয়েছি। ওসব চাকরী হবে না। সব ছেড়ে দিয়ে শুধু লিখে যেতে পারলে ভালো হতো। সেটা অনেকদিন থেকেই সম্ভব হচ্ছে না।...'

অবস্থা তাঁর তখন এমন দাঁড়িয়েছে যে জুনিয়রদের কাছ থেকে তাঁর নিজের চাকরির রেফারেন্স নিতে হচ্ছে। এ সময় জনৈক অনিল বিশ্বাস, মুর্শিদাবাদের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি, তাঁর লেখা একটা কবিতার বই জীবনানন্দকে পাঠালেন রিভিউ লিখবার জন্য। জীবনানন্দ সেই অনিল বাবুকে লিখলেন রিভিউ লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, তারপরও লিখবার চেষ্টা করবেন। তারপর লিখলেন, '...আমি আজকাল বড় মুস্কিলের ভেতর আছি, কাজ খুঁজছি। কলকাতায় কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কিছু করতে পারেন? কালকের কাগজে দেখলাম একজন ইংরাজির লেকচারার চায়। আমার বর্তমান অবস্থা এমন হয়েছে যে ওসব জায়গায় এ ধরনের কাজেও যেতে দ্বিধা করলে

BanglaBook.org

চলবে না। আপনি তো মুর্শিদাবাদে আছেন। হয়তো কিছু করতে পারবেন...'

একজন তাঁকে বই পাঠিয়েছেন রিভিউ করতে আর তিনি নির্লজ্জের মতো রিভিউ লেখার বদলে তাঁর কাছে চাকরি চাইছেন, এই হচ্ছে তখন তাঁর অবস্থা। একদিন দমদম মতিঝিল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর কাছে গেলেন জীবনানন্দ, উনি তাঁর বিএম কলেজের সহকর্মী ছিলেন। তাঁকে গিয়ে ওই মতিঝিল কলেজে একটা চাকরি দেবার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। একপর্যায়ে বললেন, তিনি একটা আত্মজীবনী লিখছেন এবং নরেন্দ্র গাঙ্গুলী যদি তাঁকে চাকরিটা দেন, তাহলে তিনি নরেন্দ্র বাবুর নাম আত্মজীবনীতে উল্লেখ করে তাঁকে অমর করে রাখবেন। এই রকম সব উদ্ভট কাণ্ডকারখানা জীবনানন্দ করছেন তখন। মরিয়া হয়ে উঠেছেন তিনি। এবার গেলেন তাঁর এককালের ছাত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। নারায়ণ তখন সিটি কলেজে শিক্ষক, তাঁকে বললেন তাঁর কলেজে কোনো চাকরির ব্যবস্থা করা যায় কি না। নারায়ণ জানালেন চেষ্টা করবেন। উঠে আসবার আগে জীবনানন্দ নারায়ণকে বললেন, 'একটা কথা, চাকরি যদি হয় তাহলে আমার বেতনটা যেন তোমার চেয়ে অন্তত এক টাকা বেশি হয়, হাজার হোক আমি তো তোমার শিক্ষক, তাই না?' দারুণ নাজুক পরিস্থিতিতে নিজের সম্মানটুকু বজায় রাখবার মর্মান্তিক চেষ্টা তখন করছেন জীবনানন্দ।

একদিন রাস্তায় *দেশ* পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে দেখা হলে জানতে চাইলেন গদ্য লিখলে কি কবিতার চেয়ে বেশি পয়সা পাওয়া যাবে? এ সময় শিক্ষা নিয়ে প্রবন্ধ লিখে ছাপালেন *দেশ* পত্রিকায়। নিবন্ধ লিখলেন এবং তা *দেশ*-এ ছাপা হলো, কিছু টাকা পেলেন। একদিন হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী প্রতিভা বসুর বাড়িতে। বুদ্ধদেব তখন একটা ফেলোশিপ নিয়ে আমেরিকায়। প্রতিভা বসুর কাছে জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা উপন্যাস লিখে কেমন টাকা পাওয়া যায় একটু বলবেন? বুদ্ধদেব কেমন টাকা পায়?'

হতভম্ব হয়ে গেলেন প্রতিভা বসু। জীবনানন্দের পরিচিত অনুজ লেখক অশোক মিত্র সেই সময়ের স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন, '...উত্তর ভারতে অবস্থান করছি, জীবনানন্দের কাকুতিভরা পোষ্টকার্ড প্রায় প্রতি সপ্তাহে, যদি উদ্যোগী হয়ে আমরা ওর জন্য, দিল্লি উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাব-রাজস্থান যে কোন জায়গায়, একটি শিক্ষকতা পদের ব্যবস্থা করে দিতে পারি, মাসে তিনশ টাকা হলেও তিনি সন্তুষ্ট!...চূড়ান্ত অভাবগ্রস্ত সংসার, খুব সম্ভব এঁর ওঁর তার কাছে সাময়িক সাহায্য ভিক্ষাও করতে হয়েছে তাকে। মফস্বল শহরের নির্জনতম মানুষটি কাশ-বেতফুল হোগলার বন, ধানসিড়ি নদী থেকে কলকাতার নির্বাসিত হতভম্ব, সর্বস্বলুণ্ঠিত, প্রায় শূন্যতাঘেঁষা অস্তিত্ব। বেঁচে থাকার ভয়, জীবিকাহীনতার ভয়, হিসাব না মেলাতে পারার ভয়, পড়শীদের ভয়, হয়তো বন্ধুদের ভয় পর্যন্ত...

BanglaBook.org

কিছু বাড়তি আয়ের জন্য এ সময় লাবণ্য একটা কমার্শিয়াল কোম্পানিতে নাটকে নামেন। কলেজে থাকতে নাটক করতেন লাবণ্য। 'চালোমী' ক্লাব থেকে রঙমহলে রবীন্দ্রনাথের *ঘরে বাইরে* নাটকে বউরানীর পাট করলেন। কেউ কেউ তাঁকে সিনেমায় নামবার পরামর্শও দিলেন। নামবেন কি না ভাবছেন তখন লাবণ্য।

একপর্যায়ে উপায়ান্তর না দেখে জীবনানন্দ তাঁর এককালীন ছাত্র নরেশ গুহকে একটা চিঠিতে লিখলেন, ...আমার এখানে একটা বড় room ও খানিকটা isolated বারান্দা (রান্না ইত্যাদি করা যেতে পারে) যা আপনি অনেক আগে একবার দেখেছিলেন—খালি আছে। sublet করতে চাই। আপনার জানাশোনা কোনো লোক একজন হলেই ভালো কিম্বা বড়জোর দুজন—থাকলে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিলে খুশি হব।...'

এ সময় জীবনানন্দের সেই ঘরটায় সুরুচি মজুমদার নামের এক বিধবা মহিলা ভাড়া নিলেন, তিনি ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে কাজ করতেন। এই মহিলা এরপর হয়ে উঠলেন জীবনানন্দের জীবনের বিভীষিকা। কিছুদিন যেতেই দেখলেন সেই মহিলার ঘরে নানা রকম লোকের আনাগোনা, হইহুল্লোড়, পানাহার। জীবনানন্দ অবিলম্বে সেই মহিলাকে বাড়ি ছাড়তে বললেন। কিন্তু সেই মহিলা কিছুতেই উঠবেন না এ বাড়ি থেকে জানালেন। জীবনানন্দ প্রভাবশালী লেখক তারাশঙ্করের শরণাপন্ন হলেন, উকিলের সাথে যোগাযোগ করলেন, একপর্যায়ে খোঁজখবর করতে লাগলেন কোনো গুন্ডাকে দিয়ে এই মহিলাকে উৎখাত করানো যায় কি না। কোনো কাজ হলো না। মহিলা বহাল তবিয়তে তার বাড়িতে সাবলেট থেকে হইহুল্লোড় চালিয়ে গেলেন।

BanglaBook.org

দুই

এ সময় একদিন সঞ্জয়ের বাড়িতে গেছেন জীবনানন্দ। সঞ্জয়, ভূমেন চা খাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই সঞ্জয় বললেন, 'আসুন আসুন। আপনার মুখ দেখে বুঝতে পাচ্ছি কিছু একটা অঘটন ঘটেছে।'

জীবনানন্দ বললেন, 'না না, তেমন কিছু না। এমনি এলাম আপনাদের এখানে।'

সঞ্জয় 'না, না জীবনানন্দ বাবু লুকাবেন না। বলুন।'

জীবনানন্দ : 'না মানে যে কিছু টাকার জন্য ঠেকে পড়েছিলাম। তো সেজন্য গিয়েছিলাম *দেশ* পত্রিকা অফিসে। ভাবলাম ওদের কয়েকটা কবিতা দিয়ে অগ্রিম কিছু টাকা পাওয়া যায় কি না।'

সঞ্জয় 'তা কী বলল ওরা।'

জীবনানন্দ 'না, মানে ওরা বললেন যে এভাবে অগ্রিম তারা দেন না। আরও

বললেন যে এত কবিতার তাদের দরকার নেই। আমাকে দুতিনটা রেখে যেতে বললেন। যখন ছাপা হবে তখন টাকা পাঠিয়ে দেবেন বললেন।'

সঞ্জয় : 'তা আপনি কী করলেন, দুতিনটা কবিতা দিয়ে এলেন?'

জীবনানন্দ : 'হ্যাঁ, তাই দিয়ে এলাম। ভবিষ্যতের কথা ভেবে।'

সঞ্জয় কিছু বললেন না। পাশের ঘরে গিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসে বললেন, 'আপনি বসুন, আমি এখনই আসছি।' ভূমেনকে বললেন জীবনানন্দকে সঙ্গ দিতে। বললেন তিনি এখনই চলে আসবেন।

ভূমেন আর জীবনানন্দ বসে রইলেন। ঠিক কোনো কথা বলতে পারছিলেন না তাঁরা। চা পড়ে রইল সামনে। ঠান্ডা হয়ে চায়ের ওপর সর পড়ল। ঘণ্টা খানেক পরে সঞ্জয় এসে বললেন, 'দেশ-এর সুরেশ মজুমদারের কাছে গিয়েছিলাম তাকে শুধু এই কথাটা বলতে যে সামান্য কিছু টাকার জন্য জীবনানন্দ কিছু লেখা নিয়ে এসেছিলেন আপনাদের কাছে, আপনারা নেননি ফেরত দিয়েছেন। তাতে জীবনানন্দ অপমানিত হননি, তিনি মান অপমানের উর্ধ্বে, সময় একদিন তা বলবে, অপমানিত হয়েছি আমরা সবাই, যারা সাহিত্য সেবা করি বলে ভাবি।'

জীবনানন্দ খুব কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, বারবার বলতে লাগলেন, 'কেন এসব করতে গেলেন। উনিও তো চাকরি করেন। চাকরির কিছু নিয়মকানুন আছে। কী দরকার ছিল তাঁকে বলবার...'

সত্যপ্রসন্ন এক ফাঁকে এসে জীবনানন্দের হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিলেন। বললেন, 'আপাতত চলুক, আমরা তো আছি।'

সঞ্জয় চেয়ার টেনে জীবনানন্দের সামনে এসে বসলেন এবং তাঁর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, 'শুনুন জীবনানন্দ বাবু, এখন যারা কবিতা লিখছে এরা কেউ কবি নয়। কবি একমাত্র আপনি, এটা জেনে রাখবেন। আপনিই আমাদের এই দেশটাকে, এই সময়টাকে সবচেয়ে ভালো চিনেছেন, ধরেছেন। আপনি রবীন্দ্রনাথের পরে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে গ্লোবাল রাইটার। হুইটম্যান থেকে শুরু করে ইয়েটস, এলিয়ট, ডিলান টমাসের সাথে আপনার আত্মীয়তা।'

জীবনানন্দ একটু উসখুস করতে লাগলেন, তারপর বললেন, 'একজন সচেতন কবিকে এতজন অগ্রজ বা সমসাময়িক কবি একই সঙ্গে প্রভাবিত করতে পারেন?'

সঞ্জয় রেগে গেলেন, 'আমি তো প্রভাবের কথা বলছি না জীবনানন্দ বাবু, বলছি আত্মীয়তার কথা। অন্য কবিদের প্রভাব থাকতে পারে, আপনার আছে আত্মীয়তা, আপনি এদের বংশধর, অন্যরা কেউ না...'

BanglaBook.org

বিধাতা, তোমার কাজ সাঙ্গ হয় নাই

এক

জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী তখনো বেঁচে আছেন। তাঁর আদরের মিলুকে জীবনযুদ্ধে জর্জরিত হতে দেখছেন। এই জটিল জটাজালে জড়ানো ছেলের বেদনা তিনি আর কী করে লাঘব করবেন? দূর থেকে তাঁকে দেখেছেন শুধু। কুসুমকুমারী যে দিনলিপি লিখতেন, তাতে একদিন লিখেছেন, '...মিলু রে তোর তুলনা নাই। মাতৃগতপ্রাণ সন্তান আমার। ভগবানকে আঁকড়াইয়া ধর—তিনিই তোর সহায়।'

বিশ্বাসী কুসুমকুমারীর মনে হয়েছে ভগবানই তাঁর এই বিপর্যস্ত ছেলেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু জীবনানন্দ কি তা মনে করতেন? ঈশ্বরে কি বিশ্বাস করতেন তিনি? তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাসের তত্ত্ব-তালাশ করি।

অনেক আগে অচিন্ত্য তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ঈশ্বর মানেন?' জীবনানন্দ বলেছিলেন, 'মানুষের নীতিবোধ মানি।'

দুই

ঈশ্বর বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কথাবার্তা আছে তাঁর *বিভা* উপন্যাসে। উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, বিভা মেয়েটা একটা ময়না কিনেছে। সে ময়নাটার পায়ে ফোড়া। বিভার বাবা তাকে বলছেন এতগুলো পয়সা দিয়ে খামোখা কেন এই পাখি কিনেছ?

বিভা বলছে, ভেবে দেখো এ বেচারা পাখিদুটো যদি আমার কাছে না আসত, তাহলে এদের কী রকম বিপদ হতো?

বিপদ, কাদের?

পাখিদের।

কী রকম?

এই দেখো ময়নাটার ডানার নিচে কেমন একটা ফোড়া হয়েছে। বিভা খুব আগ্রহে বেদনায় তার বাবাকে দেখাতে লাগল।

ভদ্রলোক একবার তাকিয়ে বললেন, মরুক গে, ফোড়া হয়েছে তো আমার কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে।

ফোড়াটার দিকে তাকিয়ে বিভা বলে, এতে তোমার কষ্ট হয় না?

এই ময়নার ফোড়ার জন্য?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে পড়ে বললেন, জীবন আমার অতটা শৌখিন এখনো হয়ে ওঠেনি, বিভা।

BanglaBook.org

এ রকম করে বিচার কোরো না বাবা। আমি জানি এই পাখি দুটো আমার কাছে না থাকলে বড্ড কষ্ট পেত। এই রকম ফোড়া নিয়ে শীতের ভেতর পথে পথে ঘোরা...জীবনের নানা কাজে আমি ভগবানের হাত দেখি। এ দুটো পাখিকে তিনি আমার কাছেই পাঠাতে চেয়েছেন। কেন জানো? তিনি জানেন যে আমি এদের খুব পরিচর্যা করব। শান্তিতে রাখব এই দুটো পাখিকে।

বিভার বাবা : এই পাখি দুটোর বেলাই তিনি এত কথা ভাবেন। আর কারু বেলা ভাবেন না কেন?

—তা ভাবেন।

—কই নমুনা তো দেখি না।

বিভা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা কাণ্ড হয়ে গেল। ময়নাটা কোন ফাঁকে বিভার কোল থেকে লাফিয়ে কার্পেটের ওপর গিয়ে বসেছে। সকলেই হঠাৎ তটস্থ হয়ে দেখল একটা বিড়াল এসে এক মুহূর্তের ভেতর পাখিটার ঘাড় মটকে সেটাকে নিয়ে ছুট দিল।

সুদর্শন তাদের কাজের লোক বিড়ালটাকে তাড়া দিতেই ময়না পাখিটাকে কার্পেটের মাঝপথে ফেলে চলে গেল বিড়াল।

পাশের মেস থেকে লেখক দেখছে...'দেখলাম পাখিটার মাথা নেই, যতদূর চোখ যায় ময়নার মাথাটা কোথাও আবিষ্কার করতে পারলাম না, জানি না কী হয়েছে। ওই বিড়ালটাই খেয়ে ফেলল নাকি...'

বিভা ভাবছিল পাখিটার ফোড়া সারাবার জন্য ভগবান তাকে তার কাছে পাঠিয়েছেন কিন্তু ফোড়া সারানো তো দূরের কথা এবার এক বিড়াল এসে পাখির ঘাড়ই মটকে দিল, কার্পেটের ওপর পড়ে আছে মাথা কাটা ময়না। কোনো ভগবান তাকে বাঁচাতে পারল না। পুরো দৃশ্যটার ভেতর আছে বীভৎসতা আর চাপা কৌতুক।

বিভার বাবা মুচকি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভগবানের বিশেষ প্রিয় ভেবে পাখিটাকে যে ঈর্ষা করছিলাম, সে ঈর্ষার পাত্র সে নয় শেষ পর্যন্ত।...

বিভার মা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে বললে, শুনছ?

বিভার বাবা বললেন, কী হলো আবার।

সুদর্শনটা কী!

কেন, কী করল?

পাশের বাড়ির সেই কেঁদো বিড়ালটা, সেই সোহাগীটাকে এমনি করে মাথায় লোহার ডান্ডা মারলে যে সেটা কাতরাতে-কাতরাতে গেল মরে।

BanglaBook.org

বিভার বাবা বিভার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা আমি এখন সুদর্শনকে মারব। তারপর বিভা মারবে আমাকে। এই রকমই।...কিন্তু বিভা অনেক কিছু শিখলে, এখন থেকে যেখানে সেখানে ভগবানের হাত বা মঙ্গল উদ্দেশ্য দেখতে যেও না। নিজে যদি শান্তিতে থাকতে পার তাই যথেষ্ট। পরকে আশ্বাস বা সান্ত্বনা দেবার মত শক্তি আমাদের কারুরই নেই।'

তিন

ঈশ্বর-ভাবনার দিক দিয়ে এই যে তাঁর সংশয়বাদিতা, এ নিয়ে আরও সরাসরি কথা আছে তাঁর *পূর্ণিমা* উপন্যাসে, 'সুশৃঙ্খল বিধাতা হলে এই কয়টি জীবনকে এমনি করেই সাজাত। কিন্তু সুশৃঙ্খল বা উচ্ছৃঙ্খল—বিধাতা বা শয়তান বলে কেউ কোথাও নেই। কিংবা আছে কি? কে জানে? থাকলে ঢের বেশি শান্তি পাওয়া যেত—নালিশ করে কিংবা প্রার্থনা করে কিংবা বিদ্রোহী হয়ে—কিংবা ভবিতব্যতাকে স্বীকার করে। জীবনের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার সামঞ্জস্যের দিক দিয়েও ব্যবধানটা এমন অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। যে সৃষ্টিতে নক্ষত্রেরা থাকে কিন্তু তাদের অপর্যাপ্ত নীচে কোনো দিকেই কারো কোনো সহানুভূতি নেই, কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, কোনো সাহায্য নেই, নিজের কোনো শক্তি নেই, কোনো আকস্মিক যাদু বা ভেল্কির পৃথিবী ও যুগ নেই, বিধাতা, ধর্ম বা সন্ন্যাসেও কোনো বিশ্বাস নেই, তা থাকলেও একটা সম্বল শান্তি খাটত বটে।'

অনেক নিরাশ্রয়তার ভেতর এ-ও এক নিরাশ্রয়তা জীবনানন্দের। বিশ্বাসী মানুষের মতো ঈশ্বরে আশ্রয় নিয়ে প্রশান্তি পাবার উপায় তাঁর নেই। ঈশ্বরকে কখনো কখনো অবশ্য তিনি স্মরণ করেছেন একজন শিল্পী হিসেবে। 'প্রেতিনীর রূপকথা' গল্পে যেমন লিখেছেন, 'একটা মৃত পোকা তুলে নেই; মাখনের মতো শাদা পাখনা, ছোট্ট শরীরের মধ্যে চোখ মুখ গলা বুক পা ডানা দেহের কারুকার্যে তাজমহলের শিল্পগুণের চেয়ে একটুও কম সহিষ্ণুতা কৌশল ও যত্ন দেখায়নি তো! লক্ষ লক্ষ বার এই রকম গভীর সাধনার পরিচয় দিয়েছে এই কীটনির্মাতা। কিন্তু তবুও মৃত্যু ও অন্ধকারের মধ্যে এই অবর্ণনীয় প্রয়াস মুহূর্তে-মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও বিরাম নেই তো শিল্পীর।'

চার

কীটনির্মাতাকে শিল্পীই ভেবে নিচ্ছেন তিনি। আবার কখনো বিধাতাকে স্মরণ করেছেন খুব বিষণ্ন, অভিমানে। লিখেছেন :

> ইচ্ছা হয় কোন দূর প্রান্তরের কোলে গিয়ে শ্যামাপোকাদের ভীড়ে—
> কাশ মাখা সবুজ শরতে
> বসে থাকি; আবার নতুন করে গড়ি সব,

BanglaBook.org

আবার নতুন করে গড়ো তুমি;
বিধাতা, তোমার কাজ সাঙ্গ হয় নাই;
মানুষ ঘুমায়ে থাক—এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাক
কাঁচপোকা মাছরাঙ্গা পানকৌড়ি চড়াই।
একদিন হবে নাকি তাই?
বিধাতা, তোমার কাজ সাঙ্গ হয় নাই।

পাঁচ

কুসুমকুমারী দেখলেন তাঁর মিলুর আঁকড়ে ধরবার কেউ নেই। ভগবান নেই, বন্ধু, পরিজন নেই। জীবনানন্দকে এমন নিরালম্ব রেখেই ১৯৪৮-এ মারা গেলেন জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দাশ, যাঁর ভোরের প্রার্থনার সংগীতে ঘুম ভাঙত জীবনানন্দের, বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত যাঁর জন্য জেগে থাকতেন, যিনি তাঁর ভেতর গুঁজে দিয়েছিলেন সেই মন্ত্র 'কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'। কুসুমকুমারী মারা গেলেন বরিশালে তাঁর প্রিয় গৈলা গ্রাম, বগুড়া রোড থেকে অনেক দূরে কলকাতায় এক ছোট গলিতে। মায়ের মৃত্যুর পর জীবনানন্দ লিখেছেন, 'ভাবনা বেদনা সংকল্প স্বপ্নের কোনো ক্ষয়ক্ষতির হাতে, ইতিহাসের অন্ধকার ক্ষমতার হাতে মা নিজেকে কোনদিন সমর্পিত করতে যাননি। যে বড় ভূমিকা তাঁর পাওয়া উচিৎ ছিলো সংসারে সে পটভূমি পাননি তিনি। কিন্তু তাহলে কি হবে, তিল ধারণের মত তুচ্ছ ভূমিকায় দেখিয়েছেন ব্রহ্মাণ্ড প্রতিফলিত হয়ে উঠতে পারে।'

BanglaBook.org

কোথায় শুভ মানবিকতার ভোর?

এক

ব্যক্তিগত জীবনটা তখন দুমড়েমুচড়ে গেছে জীবনানন্দের। ভেঙে গেছে তাঁর স্বপ্নের সিঁড়ি। কিন্তু এই ভাঙা সিঁড়ি কি শুধু তাঁর নিজের জীবনেরই? তিনি বরাবর তাঁর নিজের পৃথিবী, নিজের সময় ছাড়িয়ে তাকিয়েছেন বড় পৃথিবী, বড় সময়ের দিকে। সেই বড় পৃথিবী, বড় সময়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছে ব্যর্থতা শুধু তাঁর একার জীবনে নয়, ব্যর্থতা যেন পুরো সভ্যতারই। তিনি যেন সেই সামগ্রিক ব্যর্থতার নগণ্য একজন ধারক মাত্র। এ সময়ে লিখেছেন : 'মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে/ বড়ো বড়ো নগরীর বুক ভরা ব্যথা।' সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের ভেতরও জীবনানন্দ খাড়া রেখেছেন তাঁর কবিতার মাস্তুল। মুখ থুবড়ে পড়ে পড়তেও লিখে গেছেন কবিতা।

তাঁর মনে হয়েছে এই যে স্বপ্নের সিঁড়ি ভেঙে যাওয়া, এ যেন শুধু তাঁর নিজের জীবনেরই পরিণতি নয়, এ পরিণতি বিশ্বসংসারেরই। এ সময় লেখা তাঁর কবিতায় এই উপমাটা বারবার এসেছে, একটা সিঁড়ি স্বর্গে উঠতে গিয়ে মাঝপথে গেছে ভেঙে :

প্রেম নেই—প্রেমব্যাসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে;
একটি অমেয় সিঁড়ি মাটির উপর থেকে নক্ষত্রের
আকাশে উঠেছে।
উঠে ভেঙে গেছে।
কোথাও মহান কিছু নেই আর তারপর।...

অথবা

কোথায় সমাজ, অর্থনীতি?—স্বর্গগামী সিঁড়ি?
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্ত নদীর মতো—
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হয়ে কি আজ চারিদিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার দ্বৈপসাগর দখল করে।

তার মনে তখন এই গভীর প্রশ্ন যে বিশ্বজুড়ে প্রগতি, উন্নয়ন, বৈষম্যহীন সমাজ, অর্থনৈতিক মুক্তির এই যে সব আয়োজন তা কি শেষ পর্যন্ত নিজের নিজের স্বার্থের দেয়ালে ঘেরা এক-একটা বৃত্ত দখল করে রাখারই ফন্দি? হাজার বছরের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তেমন স্মরণীয় শতক তো তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না—

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর?
নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হ'য়ে যেতে চাই;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।...

সবকিছু মিলিয়ে তাঁর মনে তখন ভর করেছে তীব্র ক্ষোভ আর ক্রূর ঘৃণা :

পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—

BanglaBook.org

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো করে হেসে উঠলো :
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংশ হয়ে যায়?
হো হো করে হেসে উঠলাম আমি!—
চারিদিককার অট্টহাসির ভিতর একটি বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠলো যেন;
পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো...

ভীষণ হতাশার ভেতর মনকে চোখ ঠারা দিয়ে অনেক সময় বুঝিয়ে রেখেছেন, যাকে তিনি বলেছেন টেমপোরারি সাসপেনশন অব ডিজবিলিভ। এখন তাতেও যেন কুলাচ্ছে না আর :

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।
হৃদয়কে চোখঠার দিয়ে ঘুমে রেখে
হয়তো দুর্যোগে তৃপ্তি পেতে পারে কান;
এ-রকম একদিন মনে হয়েছিলো;

আমরা তো বহুদিন লক্ষ্য চেয়ে নগরীর পথে
হেঁটে গেছি; কাজ ক'রে চ'লে গেছি অর্থভোগ ক'রে;
ভোট দিয়ে মিশে গেছি জনমতামতে।
গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে প'ড়ে গেছি;
সহধর্মীদের সাথে জীবনের আখড়াই, স্বাক্ষরের অক্ষরের কথা
মনে ক'রে নিয়ে ঢের পাপ ক'রে, পাপকথা উচ্চারণ ক'রে.
তবুও বিশ্বাসভ্রষ্ট হ'য়ে গিয়ে জীবনের যৌন একাগ্রতা
হারাইনি;—তবুও কোথাও কোনো প্রীতি নেই এতদিন পরে।

BanglaBook.org

দুই

জীবনের শুরুটা তাঁর হয়েছিল একটা নিষ্পাপ পৃথিবীতে। মনের ভেতর লালন করেছেন নানা সত্য, সুন্দর, কল্যাণের আভা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর, দেশভাগোত্তর সেই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছে শুধু তাঁর নিজের জীবনে না, কোথাও সত্য, সুন্দর, কল্যাণের সেই আভা আর অবশিষ্ট নেই। তাঁর এমনও আশঙ্কা হচ্ছে যে হাজার বছরের ইতিহাসে বুঝি সেই সত্য, সুন্দর, কল্যাণকামী স্বর্ণযুগ ছিল না কখনো, এ এক মায়াই শুধু :

সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে
তা তো নেই,—স্থবিরতা আছে—জরা আছে।
চারিদিক থেকে ঘিরে কেবলি বিচিত্র ভয় ক্লান্তি অবসাদ
রয়ে গেছে। নিজেকে কেবলি আত্মক্রীড় করি; নীড়
গড়ি। নীড় ভেঙে অন্ধকারে এই যৌন যৌথ মন্ত্রণার
মালিন্য এড়ায়ে উৎক্রান্ত হতে ভয়
পাই। সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই;
লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
চাই। আমাদের দু'হাজার বছরের জ্ঞান এ-রকম।

জীবনানন্দের সেই ১৯৪৮ পেরিয়ে গেছে বহুকাল, আজকে এই দুই হাজার সতেরো সালে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে এই মুহূর্তেও তো শোনা যায় একই রক্তশব্দ, মৃত্যুশব্দ। সে শব্দ আসে সিরিয়া থেকে, গাজা থেকে, সোমালিয়া থেকে।

জীবনানন্দের মনে তখন অনুযোগ :

আমাদের প্রবীণেরা আমাদের আচ্ছন্নতা দিয়ে গেছে?
আমাদের মনীষীরা আমাদের অর্ধসত্য ব'লে গেছে...

কেন মিছে নক্ষত্রেরা আসে আর? কেন মিছে জেগে ওঠে নীলাভ
আকাশ?
কেন চাঁদ ভেসে ওঠে :

আমরা যে কমিশন নিয়ে ব্যস্ত—ঘাঁটি বাঁধি—
ভালোবাসি নগর ও বন্দরের শ্বাস
ঘাস সে বুটের নিচে ঘাস শুধু—আর কিছু নয় আহা—
মোটর যে সবচেয়ে বড়ো এই মানব জীবনে
খঞ্জনারা নাচে কেন তবে আর—ফিঙা বুলবুলি কেন ওড়াউড়ি করে
বনে বনে?

এই ভাবনাকেই আরেকটু টেনে নিয়ে তাঁর *সুতীর্থ* উপন্যাসের চরিত্র বলে,

'মানুষ, মানে যারা মারণমন্ত্র, শেল তৈরি করতে পারে? তার চেয়ে যারা তালপাতার ব্যাগ তৈরি করতে পারে তারা বেশি মানুষ। যারা একশোবার করে

BanglaBook.org

ইউরোপ আমেরিকায় এশিয়ায় কনফারেন্স পাতায় আর ভাঙে, পরস্পরকে বজ্জাৎ বলে গালাগাল দেয়—একেবারে উৎখাত করে ফেলবার ফিকিরে থাকে, তারাই তো মানুষ এখনকার পৃথিবীতে: আর তাদের তাঁবেদাররা—ব্যাঙ্কে অফিসে—ডিপার্টমেন্টাল চেয়ারে বসে পৃথিবীর সর্বত্র। এর চেয়ে বেশি মানুষ মনে করি আমি যারা নদীর পারে, হোগলার ক্ষেতের পাশে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কি করে বাবুই পাখিগুলো বাসা তৈরি করে, তেমনি শান্তিতে তেমনি নীড় মানুষের জন্যেও তৈরি করবার প্রেরণা পায় তারা, কিন্তু তারপরেই উপলব্ধি করে মানুষ তো মারীবীজ হাঁকিয়ে চলেছে পৃথিবীতে—বাবুইদের সঙ্গে মানুষের তো কোনো মিল নেই—কি করে স্থিরতা পাবে মানুষ পৃথিবীতে—কি করে শান্তি পাবে?... পৃথিবী যে খারাপ নয়, মানুষ যে সত্যিই ভালো, প্রাণের গঙ্গা যে রক্তে নাওয়াবে না মানুষকে আর, কোনো বিপ্লবেরই দরকার হবে না একদিন সমাজ যে সুস্থ ও শুভ হয়ে উঠবে সকলের জন্যে, জীবন যে বাস্তবিকই আশা-ভরসা, এসব জিনিসে কোন আপ্ত বিশ্বাস নেই আমার। সেটা থাকলেই ভালো হত এ যুগে বিশ্বাস কাঁচিয়ে গেলে অভিজ্ঞতা ও যুক্তি দিয়ে তাকে ফিরে পাওয়া যায় না আর।'

বিশ্বাস তখন জীবনানন্দের সত্যিই কাঁচিয়ে গেছে। চারদিকের এই ছুটে চলা থেকে নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়ে তিনি স্থির হয়ে ভাবতে চান কোথায় ছুটে চলেছি আমরা। তাঁর সমসাময়িক অন্য কবিরা যখন 'আধুনিকতা'কে উদ্‌যাপন করছেন, তিনি তখন যন্ত্রের জয়জয়কার ভরা সেই আধুনিকতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকেন, একেবারে গোড়ায় হাত রাখেন:

ভেবেছিলাম মানুষ ইতিহাসের হাতে ক্রমেই বড়ো হবে
মেশিনকে বশ করে খেলার চেয়ে
হয়ে পড়ে সফলতায় প্রবীণ;—তবুও মানুষ খেয়ে
মেশিন ক্রমেই আজ পৃথিবীর এক শক্তি হলো
প্রেমের ছেদ হয়ে তার নিউক্লিয়ার বোমীয় ক্ষমতা
বেড়েই গেল—জ্ঞানের পরিণামের মানে হলো
এই ধরনের পৃথক করার কথা?...

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই তাহলে ফল? তাই সেই জ্ঞানের মূল ধরেই প্রশ্ন তুললেন তিনি:

মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ;
এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল;

BanglaBook.org

জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভীড়
শুধু—বেড়ে যায় শুধু;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে
জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

কথা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমরা একটা প্রেমের পৃথিবীই তৈরি করব। তা হলো কি? ট্রাম, রেলগাড়ি পেরিয়ে সে সময়ের কলকাতা শহরে আধুনিকতার, বিজ্ঞানের নতুন চমক মোটরকার। মানুষকে বিস্মিত করে ট্রাম, রেলগাড়ির চেয়েও দ্রুততায় পথে-প্রান্তরে ছুটে চলেছে মোটরকার। চারদিকে যখন মোটরকারের জয়জয়কার, তিনি তখন সন্দেহের চোখে তাকালেন এই মোটরকারের দিকে। মোটরকার তাঁর কাছে খটকার মতো মনে হতে লাগল। মোটরকার যে দ্রুততা উপহার দিচ্ছে, তিনি সেই গতি নিয়েই প্রশ্ন তুললেন। প্রশ্ন তুললেন এই যে গতি তা কিসের জন্য? এই গতি আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চায়? খুব দ্রুত কোথাও পৌঁছে আসলে কী অর্জন করতে চাই আমরা? তিনি লিখলেন :

একটা মোটরকার
খটকা হয়ে আসে।

পরিষ্কার ভোরের বেলা
দেশের মটরশুঁটি কড়াইয়ের সবুজ ক্ষেতে-মাঠে হাঁটতে-হাঁটতে
হঠাৎ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখছি
লাল সুরকির রাস্তার ভিতর দিয়ে
হিজল গাছ দু'টোর নিচে দিয়ে
উনিশ শো চৌত্রিশের মডেল একটা মোটরকার
ঝকমক করছে, ঝড় উড়িয়ে ছুটছে;
পথ ঘাট ক্ষেত শিশির স'রে যেতে থাকে,
ভোরের আলো প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধে কোণের বধূর মতো সহসা অগোচর,
মাঠ-নদী যেন নিশ্চেষ্ট,

BanglaBook.org

সহসা যেন প্রতিজ্ঞা হারিয়ে ফেলে,

এই মোটর অগ্রদূত,
সে ছুটে চলেছে
যেই পথে সকলের যাওয়া উচিত;

একটা মোটরকারের পথ
সব-সময়েই আমার কাছে খটকার মতো মনে হয়েছে,
অন্ধকারের মতো।

রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার কার হু হু ক'রে ছুটছে
প্যারিসে—নিউইয়র্কে—লন্ডনে—বার্লিনে—ভিয়েনায়—কলকাতায়;—
সমুদ্রের এপার-ওপার ছুঁয়ে
অসংখ্য তারের মতো,
রাতের উল্কার মতো,
জঙ্গলের রাতে অবিরল চিতার মতো,
মানুষ-মানুষীর অবিরাম সংকল্প ও আয়োজনের অজস্র আলেয়ার মতো
তারাও চলেছে;
কোথায় চলেছে, তা আমি জানি না।

একটা মোটরকারের পথ—মোটরকার
সব-সময়েই আমার কাছে খটকার মতো মনে হয়েছে,
অন্ধকারের মতো।

আমি অতো তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে চাই না;
আমার জীবন যা চায় সেখানে হেঁটে-হেঁটে পৌঁছুবার সময় আছে,
পৌঁছে অনেকক্ষণ ব'সে অপেক্ষা করবার অবসর আছে।
জীবনের বিবিধ অত্যাশ্চর্য সফলতার উত্তেজনা
অন্য সবাই এসে বহন করুক : আমি প্রয়োজন বোধ করি না :
আমি এক গভীরভাবে অচল মানুষ
হয়তো এই নবীন শতাব্দীতে
নক্ষত্রের নিচে।

BanglaBook.org

জীবনানন্দ ঘোষণা করছেন কোথাও পৌঁছাবার তাড়া নেই তাঁর, জীবনের বিবিধ সফলতার উত্তেজনা নিয়ে অন্যরা ব্যস্ত থাকুক, তিনি টের পেয়েছেন যে এই অতীব সচল পৃথিবীতে তিনি বস্তুত গভীরভাবে অচল এক মানুষ। তিনি টের পেয়েছেন পৃথিবীতে অদ্ভুত আঁধার নেমে এসেছে এবং ইতিমধ্যে শিয়াল আর শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়েছে তাঁর হৃদয়:

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন আর শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়...

সেই ১৯৪৮ সালের বিক্ষুব্ধ সময়ের এই কবিতাগুলো নিয়ে প্রকাশিত হলো জীবনানন্দের পঞ্চম কবিতার বই *সাতটি তারার তিমির*। বইটা জীবনানন্দ হুমায়ুন কবিরকে উৎসর্গ করলেন, দুর্দিনে যিনি তাঁকে *স্বরাজ*-এর চাকরিটা দিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

লিচুগাছে পেঁচা নেমে আসে

এক

স্বরাজ-এর চাকরি ছেড়েছেন বছর পাঁচেক হলো, এর ভেতর কোনো নিয়মিত চাকরি আর জোগাড় করতে পারেননি জীবনানন্দ। কলকাতার আশপাশে কয়েকটা কলেজে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেছেন কিন্তু স্থায়ী কোনো চাকরি পাননি তখনো। সাহিত্য পরিমণ্ডল থেকেও নিজেকে গুটিয়ে রেখেছেন তিনি। সে সময় কলকাতায় একদিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাসায়, অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবনে নিয়মিত সাহিত্যের সভা হতো। কিন্তু জীবনানন্দ দুটোর কোনো আড্ডায়ই যেতেন না। তত্ত্ব আর পাণ্ডিত্যের বিদগ্ধ আবহাওয়ায় মাপা কথার আসর সেসব। জীবনানন্দ সঞ্জয়কে বলেছিলেন, 'ওসব সভাটভায় সাহিত্যের বিশেষ কিছু লাভ হয় না।'

তিনি তখন পৃথিবীর ওপর নেমে আসা অদ্ভুত আঁধারের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন, ভীত, ক্লান্ত। কিন্তু চারদিকের এই রক্তশব্দ আর মৃত্যুশব্দের ডাইনির নাচ দেখে তিনি

কী আর করতে পারেন? কতটুকু আর ক্ষমতা তাঁর, নেহাত এক অক্ষম শব্দকর্মী তিনি। শব্দে শব্দে তাঁর নাজুক আশা আর আকুতিটুকু জানাতে পারেন শুধু :

এখানে অর্জুন ঝাউয়ে যদিও সন্ধ্যার চিল ফিরে আসে ঘরে
যেতে আর সাধ নেই পৃথিবীর ঘরের ভিতরে।
একে একে নক্ষত্রেরা দেখা দেয়—লিচু গাছে পেঁচা নেমে আসে;
গোরুর গাড়ির ঘুন্টি সাড়া দিয়ে চলে যায় সন্ধ্যার বাতাসে,
আস্তে যাচ্ছে গাড়ি আকাশ প্রান্তর ভেঙ্গে মৃদু বাতি নিয়ে—
চুপে চুপে কুয়াশায় যাচ্ছে মিলিয়ে,
সোনালী খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে তার—মুখে তার শান্ত অন্ধকার;
ভালো; তবু আরো কিছু চাই আজ পৃথিবীর দুঃসহ ভার বইবার
প্রয়োজনে; তবুও মানবজাতি রক্তস্রোতে বার বার শক্তিশালী
নদী না হয়ে এ স্নিগ্ধ রাত্রি—পথ হয়ে যেত যদি...

দুই

কলকাতায় বসে তিনি বহুকাল লিচুগাছে পেঁচা নেমে আসতে দেখেন না আর। এ সময় তিনি খুব করে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন বরিশাল নিয়ে। ফিরে যেতে চান তাঁর প্রিয় মাটিতে। কিন্তু সে মাটি তখন অন্য দেশে। ১৯৫৩ সালে এ বাংলার কবি কায়সুল হকের কাছে পাঠানো একটা চিঠিতে লিখেছেন : '...পূর্ব পাকিস্তান আমার জন্মস্থান, সেখানে যেতে আমি অনেক দিন থেকেই ব্যাকুল, কিন্তু পাসপোর্ট ইত্যাদি কবে জোগাড় করে উঠতে পারব বলতে পারছি না...।' সে সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলছে ভাষা আন্দোলন। আগের বছর ঘটে গেছে একুশে ফেব্রুয়ারিতে হত্যাযজ্ঞ। জীবনানন্দ খুব মনোযোগের সঙ্গে সেসব ঘটনা লক্ষ করেছেন, ভাষা নিয়ে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় ভীষণভাবে তাড়িত হয়েছেন তিনি। বাংলা ভাষা নিয়ে এক দৃষ্টিপ্রসারী লেখা তিনি লিখলেন সে সময়। পূর্ব বাংলার কথ্য ভাষার শক্তি এবং তাতে সাহিত্য রচনার সম্ভাবনার কথা তিনি বললেন দ্ব্যর্থহীনভাবে। কলকাতার সুধীসমাজ যে সে ভাষাকে উপহাস করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমান যে বৃহত্তর বাঙালি ঐতিহ্যের অংশ, সে কথা তিনি জোর গলায় ঘোষণা করলেন সে প্রবন্ধে। 'বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, 'খণ্ডনের আগে বাংলাদেশ বড় ছিলো...এবার সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের আমরা হারিয়েছি...আমার মনে হয় বাংলার শ্রেষ্ঠ উপভাষাগুলো পূর্ব (ও উত্তর) বাংলায় এবং সেখানে কয়েকশ বছর ধরে সিদ্ধি লাভ করেছে। পূর্ব বাংলার প্রবাদে বচনে ছড়ায় গীতিকায় ও মুখের ভাষার বিশদ ও ক্রান্তিগভীর তাৎপর্যে তার প্রমাণ রয়েছে। উপভাষাগুলো মাতৃভাষা থেকে

BanglaBook.org

উৎপন্ন হয়ে মাতৃভাষাকে নিয়ন্ত্রিত ও নতুন নতুন সূচনা নিয়ে উৎপন্ন হতে সাহায্য করে। উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্য ও মুখের ভাষা (অন্তত শিক্ষিত সমাজে সবচেয়ে বেশী প্রসার পেয়েছিলো) প্রায় পুরোপুরি পশ্চিম বাংলা ঘেঁষা ছিলো। পূর্ব বাংলায় তখন ও তার অনেক আগে থেকেও উপভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছিলো, মুখের ভাষা বিকাশ পাচ্ছিল, কিন্তু এদিককার সুধী সাহিত্যিক বা চলতি সমাজের খেয়ালে তা বড় একটা আসেনি, ক্বচিৎ এলেও উপহাসনীয় হিসেবে ছাড়া বিশেষ উল্লেখ কিছু মনে হয়নি।...পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কিছুকাল থেকে আলোড়ন চলছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত লোকই বরাবর বাংলা ব্যবহার করে আসছে। শিক্ষিতেরা ইংরাজি জানেন। কিন্তু যত মহৎই হোক বিদেশী ভাষা। রাষ্ট্রের ভাষা দেশী হওয়া দরকার। বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের দেশজ ভাষা, এভাষা যে স্বরূপ মুখে ও সাহিত্যে পূর্ব বাংলা এতদিন ধরে গড়ে তুলেছে তা বিশেষভাবে সেখানকার মুসলিমদের মুখে ও মননে গড়া জিনিস, সমস্ত বাংলাদেশ সে সব ভাষা ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে...পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু যদি রাষ্ট্রভাষা ও জনভাষা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এমন সময় আসবে যে পূর্ব বাংলার উপভাষাগুলো কারো মুখে কোথাও শুনতে পাওয়া যাবে না। এত ভালো, এত বড় বড় উপভাষা এরকম ভাবে যদি ফুরিয়ে যায় তাও যেতে পারে কারণ মানুষের বুদ্ধিবিচার প্রায়ই মূল্য সংরক্ষণ করতে চাইলেও ইতিহাস শাদা চোখে দেখে সব।

BanglaBook.org

তিন

বরিশালে ফিরতে না পারলেও এই বাংলা থেকে ওপারে কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠতেন জীবনানন্দ। কবি শামসুর রাহমান এবং কায়সুল হক এ সময়ই ঢাকা থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন জীবনানন্দের সঙ্গে দেখা করতে। শামসুর রাহমান লিখেছেন তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি কেমন আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিলেন। বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ বসতে দেওয়ার মতো কোনো চেয়ার ছিল না তাঁর ঘরে। ঝকঝকে বারান্দায় বসে পড়েছিলেন শামসুর রহমান আর কায়সুল হক। জীবনানন্দ তখন খুব বিধ্বস্ত, ক্লান্ত। তবু পরম আগ্রহে গল্প করেছেন পূর্ব বাংলা নিয়ে। বলেছেন বরিশালের কথা, বলেছেন বরিশালে বেশ কিছু লেখার পাণ্ডুলিপি ফেলে এসেছেন তিনি। আফসোস করেছেন সেগুলো হয়তো আর কোনো দিন উদ্ধার করতে পারবেন না এই ভেবে। শামসুর রাহমান ঠাট্টা করে বলেছেন, 'সেগুলো নিশ্চয়ই এখন সব ধূসর পাণ্ডুলিপি হয়ে গেছে?' এ কথা শুনে জীবনানন্দ অনেক দিন পর তাঁর সেই কাঁধ ঝাঁকানো হাসি হেসেছেন অনেকক্ষণ।

জীবন লালসার উল্টো পিঠ

এক

এই সময়টাতেই জীবনানন্দের সঙ্গে পরিচয় হলো ভূমেন্দ্র গুহর। সে সময় মেডিকেলের ছাত্র ভূমেন্দ্র গুহ তাঁর আর কিছু বন্ধুকে নিয়ে *ময়ূখ* নামে এক দ্বিমাসিক কবিতার পত্রিকা করতেন। তাঁদের পত্রিকার জন্য জীবনানন্দের একটা কবিতা পাবার আশায় ভূমেন্দ্র এবং তাঁর বন্ধু স্নেহাকর, সমর বেশ কদিন ঘোরাঘুরি করেন ল্যান্সডাউন রোডের জীবনানন্দের বাড়ির আশপাশে কিন্তু ভেতরে যাবার সাহস পান না। জীবনানন্দের বোন সুচরিতা রাস্তায় তাঁদের ঘোরাঘুরি করতে দেখে নিজে গিয়ে পরিচিত হন এবং পরিচয় করিয়ে দেন জীবনানন্দের সঙ্গে। ভূমেন্দ্রর পূর্বপুরুষ বরিশালেরই তা জানতে পেরে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন জীবনানন্দ। জেনে আনন্দিত হন যে ভূমেন্দ্রর জীবনের একটা অংশ কেটেছে বরিশালে। ভূমেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আপনি বরিশালের জাহাজঘাটা দেখেছেন? আলেকান্দা হয়ে হেঁটেছেন কখনো? কালীবাড়ি রোড়, বগুড়া রোড?'

ভূমেন্দ্র বলেছেন, 'কালীবাড়ি রোডে আমাদের একটা কাঠের দোতলা বাড়ি ছিল...'

জীবনানন্দ বলেছেন, 'সেখানে জীবনের একটা বিশাল উন্মুক্ততা ছিল, এখানে এসব কোথায় পাবেন?'

ভূমেন্দ্র ও তাঁর বন্ধুদের প্রকাশিত *ময়ূখ* পত্রিকাটা উল্টেপাল্টে দেখছিলেন জীবনানন্দ। পাশে দাঁড়িয়ে ভূমেন্দ্র বলেন, 'আপনার কবিতা আমাদের নিমগ্ন করে।'

জীবনানন্দ *ময়ূখ*-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলেন, 'কারণটা একদিন জেনে যাবেন। কিন্তু আপনারা *ধূসর পাণ্ডুলিপি*র পরের থেকে পড়ে দেখবেন। ওখানে একটু অগোছালো হয়ে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু আপনারা *ধূসর পাণ্ডুলিপি* দেখেছেন কি? এখন অবশ্য পাওয়া যায় না।'

ভূমেন বলেন, 'আসলে বুদ্ধদেব প্রমুখ আপনার শেষ দিকের কবিতাগুলো যেভাবে বোঝেন, আমরা সেভাবে বুঝি না। আমাদের মনে হয় মানুষের জীবনের এবং তার ইতিহাসের দুটি প্রান্ত আপনাকে ব্যস্ত রাখে।'

জীবনানন্দ চুপচাপ শুনলেন, হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে বলেন, 'আরেক দিন আসবেন। কথা হবে।'

তারপর আচমকা বলেন, 'আমি একটা বড় অসুবিধার মধ্যে আছি। আমাকে মোটামুটি একটা ভাড়ায় কোনো বাসাবাড়ি খুঁজে দিতে পারেন? সত্যিই জরুরি।'

BanglaBook.org

জীবনানন্দ তখন তাঁর সেই ভাড়াটে মহিলা সুরুচি মজুমদারকে বাড়ি থেকে উৎখাত করতে না পেরে নিজেই এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন বলে ঠিক করেছেন। সেই থেকে অসমবয়সী ভূমেন্দ্রর সঙ্গে জীবনানন্দের এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হলো। কিন্তু ভূমেন্দ্র সেই বন্ধুত্বের স্বাদ পেলেন না বেশি দিন। পরিচয়ের বছরখানেকের ভেতরই নিঃশেষিত হলো জীবনানন্দের আয়ু। তাঁর মৃত্যুর পর বরং ভূমেন্দ্রর বন্ধুত্ব শুরু হলো জীবনানন্দের গুপ্ত পাণ্ডুলিপির সঙ্গে। দীর্ঘমেয়াদি, প্রগাঢ় সেই বন্ধুত্ব।

কিন্তু যে কদিন ভূমেন্দ্র জীবনানন্দকে পেলেন, সে কদিন তাঁর সঙ্গে কাটালেন নিবিড়, আন্তরিক অনেকগুলো দিন, ক্ষণ, মুহূর্ত। বাড়িতে আড্ডা দিলেন, একসঙ্গে কলকাতায় ঘুরলেন, সিনেমা দেখলেন। জীবনানন্দ তাঁকে আপনি থেকে তুমি সম্বোধন করতে লাগলেন।

তখন কলকাতায় ছাদখোলা বাস ছিল। একদিন সেই খোলা ছাদের বাসে অনেকক্ষণ ঘুরছেন ভূমেন্দ্র আর জীবনানন্দ। ভূমেন্দ্র জীবনানন্দকে বললেন, তাঁরা বন্ধুরা মিলে চক্রবেড়ে রোডের মেয়েদের স্কুলের যে চিলেকোঠায় থাকেন, সেই ঘরটায় একটা মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ছাদের আংটায় শাড়ি পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মরেছে সে। ভূমেন্দ্র বললেন, বাড়ির ছাদের আংটায় সেই মেয়ের শাড়ির একটা ছোট টুকরো এখনো লেগে আছে। জীবনানন্দ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। শুনতে শুনতে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার জনস্রোত দেখলেন। তারপর বললেন, 'মেয়েটি কেন আত্মহত্যা করল তোমরা খোঁজ করেছ? খোঁজ করলে দেখতে লোকে যা বলবে, পুলিশে যা বলবে, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যা বলবে তার থেকে কারণটা হয়তো আরও বেশি আবছা...তুমি তো ডাক্তারি পড়ো, মানুষকে জন্মাতে মরতে দেখো, তোমার এ রকম মনে হয় না? এসব ক্ষেত্রে মৃত্যু ঠিক জীবন লালসার উল্টো পিঠ, মৃত্যু যথেষ্ট আগ্রাসীও হতে পারে হয়তো, তাই না...'

BanglaBook.org

দুই

দু-একটা টিউশনি, লাবন্যের স্কুলের চাকরি নিয়ে কোনো রকম সংসার চলছে তখন জীবনানন্দের। তাঁর মেয়ে মঞ্জু, আর ছেলে সমরানন্দ দুজনের শরীরেই তখন নানা রকম অসুখ। পড়াশোনায় দুজনের কেউই ভালো নয়। কোনো রকম কায়ক্লেশে পরীক্ষায় পাস করে তারা। অব্যাহত চাকরির চেষ্টায় জীবনানন্দ তখন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরের ভেতর দিন কাটিয়ে চলেছেন।

এ সময় জীবনানন্দের ডায়াবেটিস ধরা পড়ল। ডাক্তার বললেন নিয়মিত হাঁটতে হবে। হাঁটতে কোনো আপত্তি নেই জীবনানন্দের। বরিশালে থাকতে

ভাই অশোককে নিয়ে হেঁটে যেতেন দূরদূরান্তে। কল্পনাতেও তিনি হাজার বছর ধরে হেঁটেছেন। এ সময় তিনি কলকাতায় প্রতি বিকেলে হাঁটার ব্যাপারটাকে একটা রুটিনে পরিণত করলেন। তাঁর হাঁটার সঙ্গী হিসেবে যুক্ত হলেন সুবোধ রায় বলে একজন ভদ্রলোক। তিনি সাহিত্য অনুরাগী, জীবনানন্দের কবিতার পাঠক, নিরীহ মানুষ। জীবনানন্দ সুবোধ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করতেন। তাঁর ভাই অশোকানন্দ এক লেখায় লিখেছেন, 'দাদা, বহু লোকের কাছ থেকে বহু আঘাত পেয়েছিলেন, অনেক জ্ঞানপাপী তাঁকে যথার্থ মূল্য দিতে নারাজ, এমন একটা ধারণা তাঁর ছিল। সুতরাং অভিপ্রায় সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সকলেই তাঁর কাছে suspect হয়ে থাকত।'

সুবোধ বাবুর অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি যেন নিশ্চিত হয়েছিলেন। টের পেয়েছিলেন নিরাপদ এ লোক তাঁর সঙ্গ চায় মাত্র। প্রতি বিকেলে সুবোধ বাবুর সঙ্গে তাঁর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে কিছুটা পশ্চিমে তারপর রসা রোড ছুঁয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে সোজা চলে যেতেন গড়িয়াহাট গোলপার্ক। সেখানে একটা লম্বা চক্কর দিয়ে ফিরে আসতেন বাড়িতে। সুবোধ বাবুর সঙ্গে কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলাপ করতেন না তিনি। নানা হালকা বিষয়ে কথা হতো তাঁর সঙ্গে। যেসব কথা আর কারও সঙ্গে বলা হয়ে উঠত না, সেসব নিয়ে কথা বলতেন তাঁর সঙ্গে। সে সময় জীবনানন্দের মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছিল। হাঁটতে হাঁটতে সুবোধ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আমার টাকটা বোঝা যায় পেছন থেকে?'

সুবোধ বললেন, 'বোঝা যায় বৈকি, সূর্যবন্দনা করেন তো, এবার টেকো চাঁদি ফাটিয়ে ছাড়বে আপনার জ্বলন্ত সূর্য।'

জীবনানন্দ বললেন, 'সূর্যকে ভয় নেই। ভয় রাত্রিকে। কিছুদিন পর লাইটপোস্টের তলা দিয়ে হাঁটাই যাবে না। চাঁদনি রাতে দেখেছেন কোনো দিন পদ্মার ইলিশকে ডিগবাজি খেতে?'

টাকের এমন কাব্যময় উপমা নিয়ে দুজনে হাসাহাসি করলেন। কিছুদূর হেঁটে হঠাৎ থেমে জীবনানন্দ বললেন, 'শুনছেন, ভাউয়া ডাকে।' সুবোধ বাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাউয়া কী?'

জীবনানন্দ : 'ব্যাঙ, বরিশালের ভাষায় ব্যাঙকে বলে ভাউয়া।'

BanglaBook.org

বিনা দামে ওষুধ

এক

লিখে জীবন ধারণ করতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দ, তা হয়নি। শিক্ষকতাকে জীবিকা হিসেবে নিলেও সে পেশাকে পছন্দ করেননি। শিক্ষকতায় আর ফিরে যাবেন না ভেবে রেখেছিলেন। সংবাদপত্রের পেশা চেষ্টা করেছেন, নানা ব্যবসারও চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনোটাতেই সফল হতে পারেননি তিনি। চাকরির দুর্মর চেষ্টায় আবারও মর্মান্তিক পাঁচ বছর কাটিয়ে অবশেষে একটা চাকরি মিলল জীবনানন্দের ১৯৫৩-তে এসে। শিক্ষকতারই চাকরি, যে চাকরিতে তিনি আর ফিরবেন না ভেবেছিলেন। কিন্তু সেসব ভাবনা-বিলাসের সুযোগ নেই তাঁর তখন। তিনি হাওড়া গার্লস কলেজের ইংরাজি বিভাগে যোগ দিলেন। জীবনানন্দের এক অনুরাগী পাঠক *ভারতবর্ষ* পত্রিকার সহসম্পাদক গোপালচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় এই চাকরিটা হলো তাঁর।

এ বছরই আচমকা খবর পেলেন সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত তাঁর বর্ধিত সংস্করণের বই *বনলতা সেন*-এর জন্য নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গেলেন জীবনানন্দ, পুরস্কার হিসেবে তাঁকে ১০০ টাকা এবং একটা ছোট ক্রেস্ট দেওয়া হলো। তাঁর মেয়ে মঞ্জুশ্রী স্মৃতিচারণা করেছেন, 'বাবাকে দেখলাম অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে একটা ক্রেস্ট ঢুকিয়ে রাখছেন খাটের নিচে। জানতে চাইলাম : ওটা কী বাবা? বাবা বললেন, ওই আরকি।'

এ সময় জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত *জলার্ক* পত্রিকার তরুণ সম্পাদক সুরজিৎ দাশগুপ্ত তাঁকে জানালেন লেখক অন্নদাশঙ্কর বলেছেন তিনি মনে করেন জীবনানন্দ হলেন এ সময়ের 'শুদ্ধতম কবি'।

নানা সংগ্রামে তাঁর জীবনীশক্তি তখন প্রায় নিঃশেষিত। এই সময়ে এসে তাঁর এই নতুন চাকরি, এই পুরস্কার, এই প্রশংসা তাঁর মনে তেমন কোনো অনুরণন আনে না। এসবই তাঁর কাছে তখন 'ওই আরকি!'

জীবনানন্দ এক কবিতায় লিখেছিলেন :

> মানুষটা মরে গেলে যদি তাকে ওষুধের শিশি
> কেউ দেয়—বিনি দামে—তবে কার লাভ—

দুই

হাওড়া কলেজের চাকরিটা ভালো, তাঁকে ইংরাজি বিভাগের প্রধান করা হলো। কিন্তু এই চমৎকার সুযোগটা পাবার কিছুদিন পরই, শিক্ষকতার সেই পুরোনো

BanglaBook.org

চক্রে ফিরে কেমন শ্বাসরুদ্ধ বোধ করতে লাগলেন তিনি। চাকরিটা পেয়ে বরং নিজেকে কেমন পরাজিত লাগতে লাগল তাঁর। নিজেকে প্রশ্ন করলেন জীবন আর জীবিকাকে কি কিছুতেই মেলানো যাবে না আর? আহত হরিণ তো সবচেয়ে উঁচুতে লাফ দেয়। তিনি হঠাৎ খুব সাহসী হয়ে উঠলেন। একদিন সুচরিতাকে ডেকে বললেন, 'কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দেব ঠিক করেছি। শুধু লিখব আর কিছু করব না। আচ্ছা, কলকাতার আশপাশে কোনো একটা ছোট্ট জমি পাওয়া যাবে না, যেখানে একটা মাটির ঘর বানিয়ে থাকা যাবে, মাটির উপর খালি পায়ে হাঁটা যাবে?'

তাঁর *কারুবাসনা* উপন্যাসে একবার লিখেছিলেন, 'ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কোনো এক বিস্তৃত প্রান্তরে আমার বাংলো তৈরি করব। চারদিকে বাবলাগাছের ঘন নিবিড় বেড়া দিয়ে মাঠটাকে রাখব ঘিরে। কিংবা বুনো কাঠ দিয়ে; ছোটখাট নানা ঝুমকো লতা, কুঞ্জ লতা ও অপরাজিতার আলিঙ্গনে আলো-বাতাস কাক-শালিখ ও পাখ-পাখালির সাড়া-শব্দে নিতান্তই বাঙালির ঘরোয়া জিনিস, পাশে হয় ত মেঘনা, ধানসিড়ি, জলসিড়ি, কর্ণফুলী, অথবা ইছামতী; মাঠের ভিতর ইতস্তত অশত্থগাছ, বাঁশের জঙ্গল, আম-কাঁঠাল, বেতের বন, কাশ, কালসোনা ঘাস, ফড়িং, প্রজাপতি, চোত-বোশেখের দুপুর, শরতের রাত, হেমন্তের বিকাল, অপার্থিব বট।'

কিন্তু সেই অপার্থিব বটের বাংলাদেশ থেকে তত দিনে তিনি ছিটকে এসে পড়েছেন অনেক দূরের এক পৃথিবীতে। তবু কলকাতার কংক্রিট থেকে বেরিয়ে একটা কোনো বিকল্প জীবন খুঁজছিলেন তখন। সুচরিতা আর ভূমেন্দ্র মিলে জীবনানন্দের জন্য একটা জায়গা খুঁজতে নেমেও পড়লেন। শেষে টালিগঞ্জের কাছে পুটিয়ারী এলাকায় সস্তায় একটা জায়গা পাওয়া গেল। একদিন ভূমেন্দ্র আর সুচরিতার সঙ্গে সে জায়গাটা দেখতে গেলেন জীবনানন্দ। একটা খালের ওপর বাঁশের সাঁকোতে পার হলেন, নিচে টলটলে পানি। জীবনানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'জায়গাটা আর কত দূর?'

ভূমেন্দ্র : 'আরও বেশ খানিকটা হাঁটা পথ।'

জীবনানন্দ : 'এখানে, ঠিক এই খালের পাড়ে কোনো জায়গা পাওয়া গেল না?'

ভূমেন্দ্র : 'এসব জায়গা তো বিক্রির নয়, দাদা।'

কিছুক্ষণ ভাবলেন জীবনানন্দ। তারপর বললেন, 'থাক, আজ ফিরে চলো।'

আহত হরিণ লাফিয়ে উঠেই কি টের পেল যে এতটা দুঃসাহস করবার শক্তি আসলে তার নেই। অনেকটা রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

BanglaBook.org

উনিশশ চুয়ান্ন নেমে আসে

এক

নেমে আসে ১৯৫৪ সাল। জীবনানন্দ দাশের জীবনের অন্তিম বছর।

একটা গোছগাছের প্রবণতা যেন তখন জীবনানন্দের। এযাবৎ লেখা পত্রের একটা হিসাব-নিকাশ করবার আগ্রহ দেখা গেল তাঁর ভেতর। এ বছর প্রকাশ করলেন তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* সংকলন। সেই সংকলনে স্পষ্ট জানিয়ে রাখলেন যে অধিকাংশ পাঠক, সমালোচক তাঁর কবিতা আসলে ঠিক বোঝেননি। এ-ও মেনে নিলেন যে সমসাময়িকদের পক্ষে তাঁর কবিতার শেষ পরিচয় পাওয়া কঠিন। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*র ভূমিকায় তিনি লিখলেন, '...আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেয়া হয়েছে, কেউ বলেছেন এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার, কারো মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী, সম্পূর্ণ অবচেতনার, সুররিয়ালিস্ট। আরো নানা রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবাই আংশিকভাবে সত্য—কোন কোন অধ্যায়ে খাটে, সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।...যিনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেননি, তার কবিতার এ রকম সংগ্রহ থেকে পাঠক ও সমালোচক এ কাব্যের যথেষ্ট সংগত পরিচয় পেতে পারেন, যদিও শেষ পরিচয় আজ সমসাময়িকদের পক্ষে নানা কারণেই দুঃসাধ্য।'

এর কিছুদিন আগে *জলার্ক* পত্রিকার সম্পাদক সুরজিৎকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমার কবিতা সম্পর্কে নানা জায়গায় নানা রকম লেখা দেখেছি, মন্তব্য শুনেছি, প্রায় চৌদ্দ আনি আমার কাছে অসাড় মনে হয়েছে...'

তিনি টের পেয়ে গেছেন তাঁর লেখার যথার্থ পাঠক পাবার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েক প্রজন্ম। তিনি প্রস্তুত আছেন। একবার তিনি নোবেল বিজয়ী ফরাসি লেখক আঁদ্রে জিদের জার্নাল, যা একধরনের ডায়েরি, নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনা করতে গিয়ে জিদের ডায়েরির একটা লাইন উদ্ধৃত করেছিলেন, 'I do not write for the coming generation but for the following one.'

অর্থাৎ কিনা, 'আমি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য লিখি না বরং তারও পরের প্রজন্মের জন্য লিখি।' জিদ বলছেন তিনি যা লিখছেন সেটা তাঁর সমসাময়িক প্রজন্মের জন্য তো নয়ই, দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্যও নয়, তিনি লেখেন তৃতীয় প্রজন্মের জন্য। আঁদ্রে জিদের এই লাইনটার ভেতর একটা গোপন অহংকার আর ক্ষোভ আছে। জিদের জার্নালের পৃষ্ঠা থেকে নেহাত কাকতালীয়ভাবে এই লাইনটা জীবনানন্দ তুলে এনেছেন বলে মনে হয় না। ছদ্মবেশে এটা জীবনানন্দের নিজেরই প্রস্তাব।

BanglaBook.org

দুই

এই বছরেই, সেই ১৯৫৪-তে তিনি এমন কিছু করলেন, যা আগে কখনো করেননি। তিনি বরাবর সভা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু এ বছর দু-দুটো বড় অনুষ্ঠানে নিজে গিয়ে কবিতা আবৃত্তি করলেন জীবনানন্দ। এ বছর ২৮-২৯ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে আয়োজন করা হলো কবিতাপাঠের। সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত, ড. নীহাররঞ্জন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ ছিলেন আয়োজক। কবিরা নিজেরা নিজেদের কবিতা পড়বে দর্শকদের উপস্থিতিতে এই ছিল পরিকল্পনা। চিঠি দিয়ে জীবনানন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হলো অনুষ্ঠানে। বলা হলো, অনুষ্ঠানের আগে আয়োজকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, কারণ প্রখ্যাত নট শম্ভুমিত্র কবিদের আবৃত্তি প্রশিক্ষণ দেবেন। জীবনানন্দ কবিতাপাঠের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তবে আবৃত্তি প্রশিক্ষণে যাবেন না জানিয়ে দিলেন। অনুষ্ঠানের দিন জীবনানন্দ হাজির হলেন সিনেট হলে। সবার শেষে তাঁর নাম ডাকা হলে জীবনানন্দ মঞ্চে উঠে দর্শকদের দিকে না তাকিয়ে একেবারে মাইক্রোফোনের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে খানিকটা নার্ভাস ভঙ্গিতে পড়লেন তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতাটা। ভারী কণ্ঠে, আবেগ মিশিয়ে কবিতাটা পড়লেন জীবনানন্দ। পিনপতন নীরবতায় দর্শক সে আবৃত্তি শুনল। পড়া শেষ করবার পর জীবনানন্দ অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন মুহুর্মুহু হাততালির ভেতর দর্শক চিৎকার করছে 'ওয়ান মোর, ওয়ান মোর'। জীবনানন্দ বেশ বিহ্বল হয়ে পড়লেন। শ্রোতাদের অনুরোধে আরও দুটা কবিতা পড়লেন তিনি। কবিতা পাঠ শেষে কারও সঙ্গে কথা না বলে চলে গেলেন হল ছেড়ে।

এ বছরই কলকাতা রেডিও আয়োজন করল কবিদের কবিতাপাঠের একটা অনুষ্ঠানের। আমন্ত্রণ জানানো হলো জীবনানন্দকে। জীবনানন্দ এ অনুষ্ঠানে যেতেও রাজি হলেন। অনুষ্ঠানের তারিখ ১৩ অক্টোবর ১৯৫৪। জীবনানন্দের ভেতর একটা অস্থিরতা দেখা গেল এ সময়। বেশ কজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাঁদের বললেন ১৩ অক্টোবরের পরে আসতে।

তিন

তাঁর মধ্যে আরও নানা নতুন প্রবণতা দেখা গেল এ সময়। যেমন এ সময় এক বিচিত্র ঝোঁক চাপল জীবনানন্দের। কাজকর্ম ফেলে গিয়ে বসে থাকতে লাগলেন চিড়িয়াখানায়। কখনো টেনে নিয়ে যেতেন সুবোধ বাবুকে, কখনো একাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন কোনো জন্তুর খাঁচার সামনে। মানুষের সংসর্গের বদলে তিনি গিয়ে দাঁড়াতেন বাঘ, গন্ডার, হাতির কাছাকাছি। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে দেখতেন জিরাফ কেমন তার দীর্ঘ গলা নীলিমার দিকে ছড়িয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যায়।

BanglaBook.org

চার

এ সময় আরও অদ্ভুত কাণ্ড করলেন তিনি একদিন।

১৯৫৪ সালের ১১ অক্টোবর বিকেলের দিকে হঠাৎ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ত্রিকোণ পার্কের কাছে ভাই অশোকানন্দের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলেন জীবনানন্দ। বাড়িতে অশোক, নলিনী নেই। সুচরিতা বিয়ে করেননি, মাঝে মাঝে তমলুক থেকে সুচরিতা এসে থাকেন, তিনিও নেই। কেউ কাজ থেকে ফেরেননি। বাড়ির কাজের লোক জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার?'

জীবনানন্দ বললেন, 'না মানে এই ফ্ল্যাটের কেউ কি দেশপ্রিয় পার্কের কাছে কোনো জায়গায় ট্রামের নিচে পড়ে আহত হয়েছে?' কাজের মেয়ে লতিকা বললেন, 'না তো, এমন কিছু তো শুনিনি।'

জীবনানন্দ : 'ও আচ্ছা ঠিক আছে। এরা বাড়িতে ফিরলে বোলো যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

সন্ধ্যায় সুচরিতা তমলুক থেকে ফিরে অশোকানন্দের বাড়িতে গিয়ে এই খবর শুনেই ছুটে গেলেন জীবনানন্দের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে।

সুচরিতা জীবনানন্দকে বললেন, 'তুমি লতিকাকে কী বলে এসেছ, বলো তো। সবাই তো ভয়ে অস্থির। কী ব্যাপার বলো তো? তোমার কি শরীর খারাপ?'

জীবনানন্দ বললেন, 'না না, আমার শরীর খারাপ হতে যাবে কেন? আমি ঠিকই আছি। রাস্তা পার হবার সময় শুনলাম লোকে বলাবলি করছে ত্রিকোণ পার্কের কাছের কে একজন ট্রামের নিচে পড়েছে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। একটু ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম ওদের বাড়ির কেউ না তো? তাই জানতে গিয়েছিলাম...

এরপর জীবনানন্দ হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসতে লাগলেন। তাঁর সেই বিশেষ হাসি, যে হাসির সঙ্গে যোগ দেওয়া যায় না।

সুচরিতা : 'তোমার যা কাণ্ড দাদা, কোথায় কী শুনলে আর তাই নিয়ে কী কাণ্ড করে বসলে। মেজদা নিনি তো ভয়ে অস্থির। চলো একবার সেখানে। সবার সঙ্গে দেখা করবে।'

জীবনানন্দ সুচরিতার সঙ্গে যেতে যেতে বললেন, 'তোরা একটু সাবধানে চলাফেরা করবি বুঝলি, যা রটে তার কিছু কিছু তো ঘটেও। সাবধানের মার নাই।'

তার পরদিন ১২ অক্টোবর ঠিক একই ব্যাপার ঘটালেন জীবনানন্দ। আবার বিকেলে অশোকানন্দের বাড়িতে গেলেন। আবার দেখলেন ঘরে কেউ নেই। আছে শুধু কাজের মেয়ে লতিকা। তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা এই ফ্ল্যাটে সবাই ঠিকঠাক আছে তো? কারও কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো?'

BanglaBook.org

লতিকা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল, কিছু বলতে পারল না।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার সুচরিতা ছুটে এলেন জীবনানন্দের বাড়িতে। সুচরিতা এসেই রেগে বললেন, 'তোমার হয়েছেটা কী বলো তো? তোমাকে কে রোজ রোজ এই একই খবর দেয়? তোমার নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেছে, দাদা।'

এই বলে সুচরিতা ঝরঝর করে কাঁদতে থাকেন। জীবনানন্দ খুব লজ্জিত হয়ে পড়েন। কিছু বলেন না। গম্ভীর হয়ে ঝিম মেরে বসে থাকেন অনেকক্ষণ।

একসময় জীবনানন্দ বলেন, 'কী করি বল তো, দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি পৌঁছাতে দেখলাম লোকজনের একটা জটলা বেঁধে গেছে। সবার ভেতর কেমন একটা উদ্বেগ, চঞ্চল ভাব, সবাই বলাবলি করছে, আবার একটা অ্যাকসিডেন্ট হলো। লোকে বলছিল লোকটা ট্রাঙ্গুলার পার্কের ওই একই বাড়ির। আমি অবশ্য নিজের চোখে দেখিনি। ওই ভিড়ের ভেতর গিয়ে আমি আর কী করতে পারতাম? আমি ভাবলাম তোদের বাড়িরই কেউ হবে তেমন তো কোনো কথা নেই, তবু আরেকবার একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। তাই তো চলে গেলাম তোদের ওখানে। আমি বুঝতে পারছি শুধু শুধু তোদের বিব্রত করছি। তোরা সবাই ভালো আছিস, সুস্থ আছিস, এটা না জেনে নিলেও কি চলে বল?'

সুচরিতা আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'এখন থেকে আমি তোমার সঙ্গেই থাকব, দাদা। তাহলেই তোমার এসব ভূতের ভয় কাটবে।'

জীবনানন্দ: তাই কর না কেন খুকি? তোকে তো কত বলেছি—তুই একা মানুষ তোর আর ঝামেলা কী, চলে আয় না আমার এখানে।

BanglaBook.org

এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে

এক

পরদিন ১৩ অক্টোবর রেডিও অনুষ্ঠান। সুচরিতা সকালেই গিয়ে হাজির হলেন ল্যান্সডাউন রোডে। জীবনানন্দের কাছে গিয়ে বললেন, 'সব ঠিক আছে তো দাদা, তুমি ভালো তো? কবিতা রেডি করেছ?'

জীবনানন্দ: 'সব ঠিক আছে, খুকু।'

বিকেলে অনুষ্ঠান। ধুতি, পাঞ্জাবি, পাম্প শু পরে রেডি হলেন। হঠাৎ সুচরিতা দেখলেন তাঁর জুতার সামনের জায়গাটা ছেঁড়া, ফাঁক দিয়ে খানিকটা কড়ে আঙুলের আভাস দেখা যাচ্ছে। জীবনানন্দ খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, 'এ জুতা পরে কী করে যাই?'

সুচরিতা বললেন, 'দাঁড়াও দাদা, আমি দেখছি। তোমার পায়ের মাপ যেন কত? সাত না?'

জীবনানন্দ : 'হ্যাঁ, সাতই তো।'

তখনো হাতে বেশ সময় ছিল। সুচরিতা দ্রুত গড়িয়াহাটা গিয়ে একটা নতুন পাম্প শু কিনলেন। সেটা পরে জীবনানন্দ গেলেন রেডিওতে। সেখানে এসেছেন সে সময়ের আরও স্বনামধন্য কবিরা। একটু কাঁপা গলায় জীবনানন্দ গভীর একাগ্রতায় পড়লেন তাঁর 'মহাজিজ্ঞাসা' নামের কবিতা :

...নিরন্তর বহমান সমুদ্রের থেকে খসে গিয়ে
সময়ের জালে আমি জড়িয়ে পড়েছি
যতদূর যেতে চাই, এই পটভূমি ছেড়ে দিয়ে—
চিহ্নিত সাগর ছেড়ে অন্য এক সমুদ্রের পানে
ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসহীনতার দিকে—
মনে হয় এই আধ কণা জল দিয়ে দ্রুত রক্ত নদীটিকে
সচ্ছল অমল জলে পরিণত করতে চেয়েছি...

তাঁর যাপিত জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত ঘোষণাপত্র কি এই কবিতা? তিনি জানেন, তাঁর কবিতার মূল্য নিরূপণ হয়ে ওঠেনি, হয়তো হবেও না সহসা। কিন্তু লোকে তাঁকে ভুল না বুঝুক এ তো তাঁর অনেক দিনের চাওয়া। সেই কবেকার ডায়েরির পাতায় লিখেছেন, লোকে যাতে তাঁকে ভুল না বোঝে, সে জন্য তাঁকে লিখে যেতে হবে। লিখলেন তো প্রচুর, তবু লোকে কি তাঁকে ঠিক বুঝল? ঘোর সন্দেহ ছিলে তাঁর। তাই কি এক আকুল চেষ্টায় রেডিওর ইথারে ইথারে এ কথাই প্রচার করে যেতে চাইলেন যে আর কিছু না পারলেও লিখে পৃথিবীর রক্তনদীটাকে খানিকটা সচ্ছল, অমল করে তুলতেই চেয়েছিলেন তিনি? তিনি তো আগেই জানিয়েছেন যে ইতিহাসের দুঃখের খনির ভেতর তিনি গেছেন এই বিশ্বাস নিয়েই যে একদিন সেখানে শোনা যাবে শুশ্রূষার জলঝরনার ধ্বনি, লিখেছিলেন :

আমি তবু বলি,
এখনও যে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহানীলাকাশ,
ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি...

BanglaBook.org

তাঁর তো বিশ্বাস ছিল যে :

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;
এ বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল;—
প্রায় তত দূর ভালো মানবসমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

তিনি কি লেখেননি?

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি
না এলেই ভালো হত অনুভব করে;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে...

দুই

রেডিও অনুষ্ঠানের পরদিন ১৪ অক্টোবর সকালবেলা সুবোধ বাবু এলেন জীবনানন্দের বাড়িতে। রেডিওতে বিভিন্ন কবির পড়া কবিতা নিয়ে কথা বললেন দুজন। জীবনানন্দ বললেন, 'বিকেলে আসছেন তো হাঁটতে?'

সুবোধ বাবু বললেন, 'শরীরটা ভালো নেই, বুঝতে পারছি না। ভালো বোধ করলে আসব।'

বিকেলে সুবোধ বাবু এলেন না। জীবনানন্দ একাই বেরিয়ে গেলেন হাঁটতে। হাঁটতে লাগলেন ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে গড়িয়াহাটা গোলপার্কের দিকে। তখন হেমন্তকাল। পাতা ঝরছে চারদিকে। তিনি হাঁটছেন একা একা। ঝরা পাতা এসে পড়ছে তাঁর গায়ে। কী ভাবছেন তখন তিনি? মুক্তি চেয়েছিলেন তিনি, নিজের, মানুষের। দূর কোনো অন্তিম প্রভাতে মানুষের ক্রমমুক্তি হবে, এ বিশ্বাস তাঁর আছে। কিন্তু সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ। তিনি যাকে কাজ বলে জেনেছেন সে কাজ নিষ্ঠার সাথে করেছেন। এখন তাহলে কী কর্তব্য তাঁর? হাঁটতে হাঁটতে তিনি কি তখন তাঁর *জীবন প্রণালী* উপন্যাসের চরিত্রের মতো ভাবছেন, 'এ-রকম চিরকাল চলতে পারা যায় নাকি? মাঠ-প্রান্তর ভেঙে, জানা-অজানার ওপারে, জ্যোৎস্নার আকাশে-বাতাসে বুনো হাঁসের মতন, যে-পর্যন্ত, যে-পর্যন্ত শেষ গুলি এসে বুকের ভিতর না লাগে!'

BanglaBook.org

পুরো পথ ঘুরে আবার রাসবিহারী মোড়ে এসেছেন তিনি। বালিগঞ্জ ডাউন ট্রাম একটা প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো দ্রুত ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে তখন। ট্রাম এগিয়ে আসছে, তিনিও এগিয়ে যাচ্ছেন।

একটি জাহাজ ছেড়ে গেল

এক

ট্রামের ক্যাচারে আটকে যাওয়া আহত জীবনানন্দকে আনা হলো শম্ভুনাথ হাসপাতালে। তিনি হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে শুয়ে রইলেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। তাঁর ভেঙে যাওয়া বুকের পাঁজর, পায়ের হাড়কে জড়িয়ে থাকা ব্যান্ডেজ ছাপিয়ে দেখা যেতে লাগল রক্তের ছোপ। স্যালাইন, ইনজেকশন চলল তাঁর। নেওয়া হলো এক্স-রে। তিনি জং ধরা এক লোহার খাটে শুয়ে রইলেন। তাঁর চারপাশে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের রোগীর ভিড়, তাদের গোঙানোর শব্দ, মেঝের একদিকে বোতল থেকে গড়িয়ে পড়া রোগীর প্রস্রাব, এক কোণে এক মৃতদেহ।

ভূমেন্দ্র আর তাঁর *ময়ূখ*-এর বন্ধু স্নেহাকর, জগদিন্দ্র, দিলীপ মিলে পালা করে রাত জেগে বসে রইলেন জীবনানন্দের বিছানার পাশে। তাঁদের সঙ্গে হাসপাতালের করিডরে চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে বিনিদ্র রাত্রিচারিতা।

ক্ষতবিক্ষত জীবনানন্দকে দেখতে চাইলেন না তাঁর সুহৃদ সঞ্জয়। তাঁর বাড়িতে একটা মাদুর পেতে ধ্যানে বসলেন। সেখানে বসে রইলেন সারাটা দিন, রাত। মাদুরে বসে জীবনানন্দকে নিয়ে লিখলেন কবিতা, 'তুমি ঘুমে কেঁদে ওঠো বলে আমি অপরাধে জাগি'।

গুরুত্বপূর্ণ কেউ নন বলে নোংরা ইমার্জেন্সি থেকে জীবনানন্দকে নেওয়া গেল না হাসপাতালের সংরক্ষিত কেবিনে।

রোগী একজন কবি জানতে পেরে নার্স শান্তি মুখার্জির উদ্বিগ্নতা বেড়ে গেল, একটা ভেজা তোয়ালে দিয়ে জীবনানন্দের গা, মুখ মুছিয়ে দিলেন, চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দিলেন চুল। তাঁর মাথার কাছের টেবিলে একটা ফুলদানিতে রেখে দিলেন ফুল। অপরিচ্ছন্ন ইমার্জেন্সির একটা কোণকে শান্তি করে তুললেন মরূদ্যান।

মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে এল জীবনানন্দের। তিনি অস্ফুট জানতে চাইলেন, 'আমি কোথায়?...এখন ভোর না সন্ধ্যা?' তিনি বললেন, 'আমি কী দেখতে পাচ্ছি জানো? বনলতা সেনের পাণ্ডুলিপির রং।' তিনি আবার চোখ বুজলেন। দ্রুত ছোট ছোট শ্বাস নিতে লাগলেন। তাঁর শরীর পুড়ে যেতে লাগল জ্বরে।

BanglaBook.org

ভূমেন্দ্র আর তাঁর বন্ধুরা নিজেদের চাঙা রাখবার জন্য কিনে আনলেন কবিতার বই *বনলতা সেন*। হাসপাতালে জীবনানন্দকে সেবারত সবাইকে উপহার দিলেন এক কপি, দিলেন শান্তি মুখার্জিকেও।

নিরুপায় হয়ে একপর্যায়ে সঞ্জয় দ্বারস্থ হলেন জীবনানন্দের আজীবনের শত্রু সজনীকান্তের, ক্ষমতাবান মানুষ তিনি, যদি জীবনানন্দের এই নাজুক সময়ে সব বিরূপতা ভুলে উন্নত চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন। সবাইকে বিস্মিত করে সজনীকান্ত মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্রকে নিয়ে হাজির হলেন হাসপাতালে। বিধানচন্দ্র আদেশ দিয়ে গেলেন উন্নত চিকিৎসার, কেবিনে স্থানান্তরের। সঞ্জয় কৃতজ্ঞতা জানাতে গেলে সজনীকান্ত এবার সবাইকে বিমূঢ় করে বললেন, 'আমি কি জানতাম না যে জীবনানন্দ বাবু কত বড় কবি, কত বড় মানুষ। নইলে শুধু তার কবিতা নিয়েই এত কথা বলার তো দরকার হতো না আমার।'

অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও জীবনানন্দকে কেবিনে স্থানান্তর সম্ভব হলো না। দেরি হয়ে গেছে তত দিনে, আক্রান্ত হয়ে গেছে তাঁর দুটো ফুসফুসই। তাঁকে নড়ানো সম্ভব হলো না। ইমার্জেন্সি রুমেই একটা পর্দা দিয়ে আড়াল তৈরি করা হলো শুধু।

জীবনানন্দের শরীরের অবনতি ঘটছে শুনে সঞ্জয় অবশেষে দেখতে এলেন হাসপাতালে। জীবনানন্দ চোখ মেলে দেখলেন সঞ্জয়কে। সঞ্জয়ের হাতটা টেনে নিজের গালের ওপর রাখলেন তিনি। জড়ানো গলায় বললেন, 'একটা কমলালেবু খেতে পারব?' জীবনানন্দ একবার 'কমলালেবু' নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন :

একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব,
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষের বিছানার কিনারে।

মৃত্যুপথযাত্রীর চোখে উজ্জ্বল টইটম্বুর কমলা জীবনের বহমানতারই আহ্বান। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে জীবনানন্দ যখন একটা কমলালেবু খেতে চাচ্ছেন, তখন তিনি নিজেও মুমূর্ষু। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর পরের তাঁর কাঙ্ক্ষিত কমলারূপী নিজেকেই খুঁজছিলেন যেন তিনি।

সারা রাত ডিউটি শেষে নার্সের পোশাক পাল্টে, একটা ছাপা শাড়ি, কপালে টিপ দিয়ে খুব ভোরে শান্তি মুখার্জি এসে হাজির হলেন ভূমেন্দ্রদের *ময়ূখ*-এর আস্তানায়। অপ্রস্তুত সেই যুবকদের সামনে গিয়ে ভীষণ সংকোচে বলতে লাগলেন, 'এত বড় একজন লোকের জীবন-মরণ সংকটে নার্সিং করার সুযোগ পেয়েছি, একজন নার্স এর চেয়ে বেশি আর কী কামনা করতে পারে? আপনারা আমাকে

BanglaBook.org

বইটা দিলেন বলেই না জানতে পেলাম। কবিতাগুলো পড়েছি, ভালো করে তো সব বুঝতে পারি না কিন্তু তবু টানে তো, এত টানে যে...অন্তত কয়েকটা কবিতা আমাকে বুঝিয়ে দেবেন?...' হতভম্ব হয়ে থাকেন *ময়ূখ*-এর সকলে।

হাসপাতালে ভর্তি হবার পর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। সেদিন ২২ অক্টোবর ১৯৫৪। মাঝরাতের দিকে জীবনানন্দের শ্বাস খুব দ্রুত হতে লাগল। শান্তি অক্সিজেনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল কৃত্রিম অক্সিজেনেও আর কুলাচ্ছে না। জীবনানন্দ নিশ্বাস নিতে পারছেন না। তাঁর নিশ্বাস ছোট হতে হতে, ছোট হতে হতে একসময় থেমে গেল। নিস্তেজ হয়ে গেলেন জীবনানন্দ। শান্তি দৌড়ে ডিউটি ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। ডাক্তার নাড়ি পরীক্ষা করলেন, চোখ পরীক্ষা করলেন। দেখলেন জীবনানন্দের আঙুলের ডগা, জিব নীল হয়ে গেছে, যেন বিষ খেয়েছেন তিনি। ডাক্তার জীবনানন্দকে মৃত ঘোষণা করলেন। তখন রাত ১১টা ৩৫ মিনিট। খোঁজ পেয়ে তাঁর মাদুরে বসেই সঞ্জয় লিখলেন, 'একটি জাহাজ ছেড়ে গেল...'

দুই

পরদিন জীবনানন্দের মরদেহ ল্যান্সডাউন রোডের ক্ষুদ্র গলি পেরিয়ে কলকাতার কোলাহল, ব্যস্ত জীবনস্রোত কেটে রওনা হলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য। এই শতাব্দীপ্রাচীন শহরে কোথাও কোনো আঁচড় লাগল না। রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের সেই বালিগঞ্জ ডাউন ট্রামে উঠতে উঠতে ঘাড় ঘুরিয়ে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করলেন, কে গেলেন?

তাঁকে হয়তো বলা যেত, গেলেন একজন লেখক, যিনি বিরল এবং বিশুদ্ধভাবে ছিলেন ব্যর্থ।

তিন

শূন্যে অবশ্য ভেসে রইল অমীমাংসিত সেই জিজ্ঞসা, জীবনানন্দের এই মৃত্যু তাহলে কী—

দুর্ঘটনা?

আত্মহত্যা?

হত্যাকাণ্ড?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

গ্রন্থপঞ্জি

যে বইগুলো থেকে তথ্য এবং ভাবনার সূত্র নিয়েছি তার তালিকা রইল নিচে :

১. *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র*—ভারবি

২. *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র*—জীবনানন্দ দাশ—সংকলন ও সম্পাদনা আবদুল মান্নান সৈয়দ

৩. *জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র—গতিধারা*

৪. *জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস সমগ্র—গতিধারা*

৫. *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসমগ্র*—সম্পাদনা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বইপত্র

৬. *জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত প্রবন্ধাবলী*—সম্পাদনা ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, মাওলা ব্রাদার্স

৭. *জীবনানন্দ দাশের দিনলিপি* (৪ খণ্ড)—ভূমেন্দ্র গুহ, প্রতিক্ষণ

৮. *আলেখ্য জীবনানন্দ*—ভূমেন্দ্র গুহ, আনন্দ পাবলিশার্স

৯. *নির্বাচিত জীবনানন্দ দাশ* (মূলানুগ পাঠ)—সম্পাদনা ভূমেন্দ্র গুহ, বেঙ্গল পাবলিকেশনস

১০. *জীবনানন্দ দাশের চারটি উপন্যাস* (মূলানুগ পাঠ)—সম্পাদনা ভূমেন্দ্র গুহ, বেঙ্গল পাবলিকেশনস

১১. *সফলতা নিষ্ফলতা*—জীবনানন্দ দাশ—সম্পাদনা ভূমেন্দ্র গুহ, প্রতিক্ষণ

১২. *জীবনানন্দ দাশ*—প্রভাতকুমার দাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি

১৩. *জীবনানন্দ দাশ : বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত*—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ

১৪. *অনন্য জীবনানন্দ দাশ*—ক্লিনটন বি সিলি, প্রথমা

১৫. জীবনানন্দ দাশ : জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা—বিভাব

১৬. *জীবনানন্দ : জীবন আর সৃষ্টি*—সম্পাদনা সুব্রত রুদ্র, নাথ ব্রাদার্স

১৭. *জন্মশতবর্ষে জীবনানন্দ*—সম্পাদনা ভূমেন্দ্র গুহ, সাহিত্য একাডেমী

১৮. *জীবনানন্দ স্মৃতি ময়ূখ*—সম্পাদনা ভূমেন্দ্র গুহ, নয়া উদ্যোগ

১৯. *জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী*—সম্পাদনা আবদুল মান্নান সৈয়দ, শুদ্ধস্বর

২০. *জীবনানন্দ*—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং

২১. *আমার জীবনানন্দ আবিষ্কার ও অন্যান্য*—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স

২২. *কবি জীবনানন্দ*—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ভারবী

২৩. *প্রসঙ্গ জীবনানন্দ*—সম্পাদনা ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, দিব্যপ্রকাশ

২৪. *জীবনানন্দ ও আমরা*—সম্পাদনা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ

২৫. *চাবিকাঠির খোঁজে : নতুন আলোকে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'*—আকবর আলি খান, প্রথমা

২৬. *জীবনের কবি জীবনানন্দ*—তপন গোস্বামী, পুস্তক বিপণি

২৭. জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা—*অনুষ্টুপ*
২৮. *জীবনানন্দ*—অরুণেশ ঘোষ, কবিতীর্থ
২৯. *মানুষ জীবনানন্দ*—লাবণ্য দাশ, ভাষাচিত্র
৩০. *জীবনানন্দ দাশের আট বছর আগের একদিন*—সম্পাদনা ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, দিব্য প্রকাশ
৩১. *জীবনানন্দ*—গোপালচন্দ্র রায়, সুবর্ণরেখা
৩২. *মেধাবী বন্ধুত্ব : জীবনানন্দ—বুদ্ধদেব*—মুহাম্মদ মতিউল্লাহ, কবিতা পাক্ষিক
৩৩. *একটি নক্ষত্র আসে*—অম্বুজ বসু, পুস্তক বিপণি
৩৪. *অন্তর্গত রক্ত : জীবনানন্দ দাশ*—বার্নিক রায়, পুস্তক বিপণি
৩৫. *জীবনানন্দ*—বীতশোক ভট্টাচার্য, বাণীশিল্প
৩৬. *বিকালের নক্ষত্রের কাছে*—কল্যাণকুমার বসু, নাথ পাবলিশিং
৩৭. *জীবনানন্দ বিবেচনা*—সম্পাদনা ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, অন্যপ্রকাশ
৩৮. *জীবনানন্দ ও অন্ধকারের চিত্রনাট্য*—জহর সেনমজুমদার, মডেল পাবলিশিং
৩৯. *দৈনন্দিন দিনলিপি : কুসুমকুমারী দাশ*—সম্পাদনা ভূমেন্দ্র গুহ, অবসর
৪০. *শুদ্ধতম কবি*—আবদুল মান্নান সৈয়দ, পাঠক সমাবেশ
৪১. *কৃষ্ণাদশমী—জীবনানন্দ দাশ* (সম্পাদনা ফয়জুল লতিফ চৌধুরী), পাঠক সমাবেশ
৪২. *জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ—উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমি
৪৩. *জীবনানন্দ স্মরণে—কিছু ধ্বনি*
৪৪. জীবনানন্দ ১-*দেশ পত্রিকা* ২৮.১১.১৯৯৮
৪৫. কবি জীবনানন্দ দাশ স্মরণ সংখ্যা—পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
৪৬. জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা—*সংবাদ* সাময়িকী
৪৭. 'কবিপত্নীর বিড়ম্বনা'—সনৎকুমার সাহা, *সংবাদ* সাময়িকী ২৬.০৭.২০০১
৪৮. *জীবনানন্দ ও তার কাল*—হরিশংকর জলদাস, শৈলী প্রকাশন
৪৯. *হৃদয়ের শব্দহীন জোস্নার ভিতর*—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পত্র ভারতী
৫০. *জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য*—ভূমেন্দ্র গুহ, গাঙচিল
৫১. 'একদিন শতাব্দীর শেষে'—পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি
৫২. *এই সময় ও জীবনানন্দ*—সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ, সাহিত্য একাডেমী
৫৩. *বাঙ্গালনামা*—তপন রায় চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স
৫৪. *তিসিডোর*—কেতকী কুশারী ডাইসন, আনন্দ পাবলিশার্স
৫৫. *কালবেলার কবিতা : জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ*—সুমিতা চক্রবর্তী, প্রমা
৫৬. *কবিতা পরিচয়*—সম্পাদনা অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, দে'জ পাবলিশিং
৫৭. *বিক্ষিপ্ত অর্ধশতক*—অশোক মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স।